বাংলা কথাসাহিত্যে অপ্রমিত শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগকৌশল : নির্বাচিত চারটি উপন্যাস

(এম.ফিল : স্তরের গবেষণা প্রস্তাব)

গবেষক : সুচিত্রা দাস

রেজিস্ট্রেশন নং : ১৪২৩৪৮ অফ ২০১৭ - ২০১৮

রোল নং : ০০১৭০০১০৩০০৫

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা সুতপা সেনগুপ্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৩২

প্রাককথন

প্রত্যেক কাজেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য থাকে, এক্ষেত্রেও রয়েছে।বলা যায় গবেষণা মানেই যে তথ্য জোগাড় করা শুধু তাইনা, জ্ঞান সঞ্চয় করা এর প্রথম উদ্দেশ্য, আর তার মধ্যে দিয়ে সমাজের মানুষকে গবেষণার মাধ্যমে উঠে আসা জ্ঞানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা। বলা যেতে পারে যে চারটি আঞ্চলিক উপন্যাসকে গ্রহন করা হয়েছে, সেই উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাতে অপ্রমিতের অবস্থান। এবং সই আলাদা আলাদা মানুষদের অপ্রমিতের ব্যবহার বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াপদ, অর্থাৎ রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার, অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ, সেখানকার বা সেই অঞ্চলের সমাজ ভাষা-বিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতিতে কতটা প্রভাব ফেলেছে তা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হল।

এই গবেষণা কাজটিতে স্বযত্ন তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশ করেছেন মূল তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা সুতপা সেনগুপ্ত এবং তত্ত্বাবধায়ক কমিটির অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ ও অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক বরেন্দু মন্ডল প্রয়োজনীয় বই ও পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক আইভি আদকের প্রতি ঋণ স্বীকার করি। বিশেষভাবে ঋণস্বীকার করি সহপাঠী অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি, ক্ষেত্রে বিশেষত সমাজভাষা বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিষয়ে সাহায্য করার জন্য।

সময় ও পরিসরের নির্দিষ্টতার কারণে গবেষণাটি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হল। ভবিষ্যতে এটি বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা রইল।

১৪ই মে ২০১৯
বড়বাজার, শান্তিপুর
নদীয়া

সুচিত্রা দাস
এম.ফিল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

				পৃষ্ঠা
ভূমিকা	:		:	ক - দ
প্রথম অধ্যায়	:	অপ্রমিত শব্দের বিচার, সংজ্ঞা, পরিসর নির্নয় এবং আঞ্চলিক ধারনা	:	১ - ৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	নির্বাচিত উপন্যাসগুলির কাহিনী সংক্ষেপে	:	৫৯ - ৬৬
তৃতীয় অধ্যায়	:	নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	:	৬৭ - ৮৮
চতুর্থ অধ্যায়	:	নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	:	৮৯ - ১১৫
পঞ্চম অধ্যায়	:	সংলাপে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ : তার তালিকা প্রাসঙ্গিকতার বিশ্লেষণ	:	১১৬ - ১৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে সংলাপে সমাজভাষাবিজ্ঞান	:	১৪৫ - ১৬৯
সপ্তম অধ্যায়	:	নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে সংলাপে লোকসংস্কৃতির উপাদান	:	১৭০ - ১৮২
অষ্টম অধ্যায়	:	সামগ্রিক মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনা	:	১৮৩ - ২২০
গ্রন্থপঞ্জি	:		:	২২১ - ২২৪

ভূমিকা

চারটি উপন্যাসের নাম, লেখকের নাম ও সময়

অপ্রমিত ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে চারটি উপন্যাসকে নির্বাচন করা হয়েছে তা প্রধানত

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৪-১৯৩৫),
- অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬),
- দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮) ও
- হরিশঙ্কর জলদাসের ‘জলপুত্র’ (২০১২)।

প্রতিটি অধ্যায়ে কী আছে, তার সংক্ষিপ্তসার

প্রাককথন :

ভূমিকা :

চারটি উপন্যাসের নাম, লেখকের নাম, সময়।

প্রতিটি অধ্যায়ে কি আছে, তার সংক্ষিপ্তসার।

পদ্ধতি : অপ্রমিত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

প্রথম অধ্যায় : অপ্রমিত শব্দের বিচার, সংজ্ঞা, পরিসর নির্নয় এবং আঞ্চলিক ধারনা।

বাংলা উপন্যাসে ভাষার মাধ্যম : প্রথমপর্ব - সাধুভাষা।

দ্বিতীয়পর্ব- শিষ্ট চলিত বাংলা বা মান্য চলিত বাংলা।

তৃতীয়পর্ব- শিষ্ট চলিত ভাষার লিখিত উপন্যাসের মধ্যে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত উপন্যাসগুলির কাহিনী সংক্ষেপে।

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

ক. রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : অব্যয়।

খ. রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : সর্বনাম।

চতুর্থ অধ্যায় : নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : বিশেষ্য, বিশেষণ।

খ. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : ক্রিয়াপদ।

পঞ্চম অধ্যায় : সংলাপে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ : তার তালিকা প্রাসঙ্গিকতার বিশ্লেষণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে সংলাপে সমাজভাষাবিজ্ঞান।

সপ্তম অধ্যায় : নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে সংলাপে লোকসংস্কৃতির উপাদান।

অষ্টম অধ্যায় : সামগ্রিক মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনা।

গ্রন্থপঞ্জি :

পদ্ধতি : অপ্রমিত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক মানুষের মুখের ভাষাতে অপ্রমিতে অবস্থান দেখানোর জন্য প্রধানত যে চারটি আঞ্চলিক উপন্যাসকে নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছে, তাতে এক একটি উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট খন্ডে বসবাসকারী মানুষের মুখের ভাষাতে আলাদা আলাদা ভাবে অপ্রমিতের অবস্থান। ভূমিকা অংশে কিছুটা দেখানো যেতে পারে নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে অপ্রমিতের অবস্থানকে আলোচনার মাধ্যমে-

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৪-১৯৩৫) উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

‘পদ্মানদীর মাঝি’ সংলাপে কতটা অপ্রমিত শব্দের ব্যবহার উঠে আসছে, তা প্রধান সংলাপগুলি তুলে আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক-

> ‘নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল-
>
> আমি আলাম গো কুবিরদা।
>
> কন থে আলি রাসু?
>
> কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখ্যা মুখে রাও সরে না, কতকাল পরে ফিরা আলাম’। (পৃ- ২৬)

- এলাম- আলাম
- কোথা থেকে- কন থে
- এলি- আলি,
- তোমার- তোমাগো,
- কথা সরে না- রাও সরে না,
- ফিরে- ফিরা
- দেখে- দেইখ্যা।

> ‘বৈশাখ মাসে? এতকাল কই ছিলি তুই? নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যুদবার আইলাম সুলপী। কমুনে আজান খুড়া সগগল কমু। অখনে ক্ষুধায় মরি- অকুবিরদা, কিছু দিবার পার?’ (পৃ- ২৭)

- কোথায়- কই,

- বৃহঃস্পতিবার- বিষ্যুদবার,
- এলাম- আইলাম,
- বলব- কমুনে,
- সকল- সগগল,
- এখন- অখনে,
- দিতে পার- দিবার (পার)

'শ্যাষ বেলায় সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষম্যাশ চোদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাইধবার কইলাম, তা কয়, ত্যাল মরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ছে।' (পৃ- ৩০)

- শেষ- শ্যাষ,
- চেয়ে- চাইয়া,
- শেষমেশ- শ্যাষম্যাশ,
- পয়সায়- পয়হায়,
- মেয়েটাকে- মাইয়াটাকে,
- ব্যঞ্জন- ব্যানুন,
- রাঁধবার- রাঁইধবার,
- বললাম- কইলাম,
- বলে- কয়,
- তেল- ত্যাল।

'কুবের বলিল, কেডা জানে? মুটাইছে দেখলাম' (পৃ- ৩৪)

- কে জানে- কেডা জানে,
- মোটা হয়েছে- মুটাইছে।

'তা শুইনা তার কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস- রাও করস কে রে?' (পৃ- ৪০)

- মেয়েলোক- মাইয়ালোক,

- কর্ম- কাম (অর্থ কাজ),
- মেরে- মাইরা,
- ছেলে- পোলা,
- জন্য- লাইগা,
- পৃথিবীতে- পিরথিমিতে,
- এসেছে- আইছস,
- কথা- রাও,
- বল- করস,
- কাকে- কে রে।

'তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপ সই দেও কুবের একুশ টাহা দশ আনার খত লিখছি- বাদ দিছি দুই টাহা। টিপ সহ দিয়া রাখ যখন পারবা দিবা- না দিলে মামলা করুম না বাই! ..... তোমাগো দরদ করি, খত কিসের? লিখা থুইল্যাম। হিসাব থাকব- না ত কিসের কাম খত দিয়া?

কুবের বলিল, পুরান বাঁশ, পুরান বেড়া দিলি খরচা কম হইত মিয়া বাই। ক্যান? পুরান বাঁশ দিবা ক্যান? খরচা লাইগা ভাইবো না, খরচা দিছি আমি! না দিই নাই।' (পৃ- ৫৮)

- বের- বাহির,
- দাও- দেও,
- টাকা- টাহা,
- দেয়েছি- দিছি,
- টাকা- টাহা,
- রাখা- রাখ,
- করব- করুম,
- ভাই- বাই,
- তোমাদের- তোমাগো,
- থুলাম- থুইল্যাম,
- কেন- ক্যান,
- লেগে- লাইগা,
- ভেবো- ভাইবো,
- দিয়েছি- দিছি।

‘কপিলা বলে, মাঝি আইছ নাকি? খাড়াও মাঝি, আমি যামু, মারে পেন্নাম কইরা লই।
কুবের বলে, লখ্যা, আইলি রে হারামজাদা পোলা?’ (পৃ- ৫৯)

- এসেছ- আইছ,
- দাঁড়াও- খাড়াও,
- যাব- যামু,
- প্রণাম- পেন্নাম,
- করে- কইরা,
- নিয়- লই।
- লখা- লখ্যা,
- এলি- আইলি।

‘যে সোয়ামি দূর কইরা খেদাইয়া দিছে তার লাইগা মনডা পোড়ায়, তর গেলেই পারস সোয়ামির ঘর? যামু।’ (পৃ- ৬০)

- স্বামী- সোয়ামি,
- করে- কইরা,
- তাড়িয়ে- খেদাইয়া,
- দিয়েছে- দিছে,
- জন্য- লাইগা,
- মনটা- মনডা,
- পোড়ে- পোড়ায়,
- তোর- তর,
- পার- পারস,
- যাব- যামু।

‘মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাস করিল, কাম মিলে নাই কুবের বাই?
হোসেন বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি,
ক্যামনে ভালা করুম তোমাগো হুশ থুই কুবির বাই, কাম করবা, আমার লায়।’ (পৃ- ৭৩)

- কাজ- কাম,

- মেলে- মিলে,
- ভাই- বাই,
- প্রাণ দিয়ে- জান দিয়া,
- তোমার তোমাগো,
- কেমন- ক্যামনে,
- ভালো- ভালা,
- করব- করুম,
- তোমার- তোমাগো,
- নৌকা- লায়।

'টের পাইবামাত্র সে বিবর্ণ হইয়া বলিল, আসা করছ নাকি কুবিরদা? (পৃ- ৭৮)
কুবের বলিল যা যা বাড়িত্ যা, বাজে বকস ক্যান?'

- বাড়ি- বাড়িত্
- বকছ- বকস,
- কেন- ক্যান।

'কুবের বলিল, দূর দূর লক্ষীছাড়া! কুচরিত্তির হইছস, আঁই? ক্যান গেছিলি? গনেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কুচরিত্তির? গীত শোননে দোষ নাই।' (পৃ- ৭৯)

- কুচরিত্রের- কুচরিত্তির,
- হয়েছ- হইছস,
- এখন- আঁই,
- কেন- ক্যান,
- গিয়েছিলি- গেছিলি,
- শোনানো- শোননে।

'কুবের বলিল, ক্যান যুগইলা বিনা মানুষ নাই দ্যাশে? উলুপী মুকে একটা অদ্ভুদ শব্দ করিয়া বলিল, কেডা নিব খোঁড়া মাইয়ারে? (পৃ- ৮০)

- কেন- ক্যান,

- যুগল- যুগইলা,
- নেই- নাই,
- দেশে- দ্যাশে,
- কে- কেডা,
- নেব- নিব,
- মেয়েকে- মাইয়ারে।

'আমিনুদ্দিনের চোখ ছলছল করে। সে বলে, আল্লা জানে মিয়া আর ফির‍্যা আমু না ভাবিলে মনডা পোড়ায়। হোসেন বলে, ফিরনের মন থাকলি কও মিয়া অখন, জাহাজে তুইলা দিই তোমারে কাইল খুশি না হলি ক্যান যাবা? হোসেন বলে, তবে কাইল তোমাগো নিকা সারি?' (পৃ- ৮৪)

- ফিরে- ফির‍্যা,
- আসব- আমু,
- ভাবলে- ভাবিলে,
- মনটা- মনডা,
- পোড়ে- পোড়ায়,
- থাকলে- থাকলি,
- বল- কও,
- এখন- অখন,
- তুলে- তুইলা,
- তোমাকে- তোমারে,
- কাল- কাইল,
- হলে- হলি,
- কেন- ক্যান,
- কাল- কাইল,
- নিকা- বিয়ে।

'কী জানো মিয়া কলের জাহাজ হলি, জানান যায় কত জোর চলতেছি ঘন্টায় কয় মাইল আলাম- সমুন্দরের কোনখান রইছি হিসাব করলি মেলে, নাও চালাইয়া জানুম কিবা?- দড়িতে হাত বুলায় হোসেন সকলকে অভয় দিয়া

বলে ডরাইও না, দশ বাজলি কুয়াশা থাকবো না। আইজ কাইল রোজ বিহানবেলা কুয়াশা হয়। এ্যারে কী কুয়াশা কয় মাঝি।' (পৃ- ৮৭)

- হল- হলি,
- জানা- জানান,
- কত- কয়,
- এলাম- আলাম,
- সমুদ্রের- সমুন্দুরের,
- আছি- রইছি,
- জানব- জানুম,
- বাজলে- বাজলি,
- থাকবে- থাকবো,
- আজ- আইজ,
- কাল- কাইল,
- বিকেলবেলা- বিহানবেলা,
- একে- এ্যারে,
- বলে- কয়।

'মালা শেষে রাগিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যে থাইকা আইলাম এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করব ক্যান?

যা বেড়া গিয়া কর্ত্তার লগে- হারামজাদি, বদ।

কী কইলা মাঝি, কী কইলা? (পৃ- ১০৬)

- কেন- কেন,
- রাগ- গোসা,
- কোথায়- কই,
- নিয়েছিলি- নিছিলা,
- আমাকে- আমারে,
- চিরটা- চিরডা,
- সাথে- লগে,
- বললে- কইলা।

অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

‘আর সেই সূচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে। তার আইতে আইতে রাত গহীন হয়- আগ আন্ধাইরা রাত। দেখি আন্ধাইরা গিয়া চাঁদ উঠছে।’ (পৃ- ২২)

- এসে- আইয়া,
- বেঁধে- বিন্ধে,
- গভীর- গহীন।

‘বুড়ি বলে অ মাইয়ারা মা জোকার দেওনা।’ (পৃ- ২৯)

- মেয়েরা - মাইয়ারা।

‘কিশোর বলিল এই জাগাত ই বাইত থাইক্যা যায় রে সুবলা।’ (পৃ- ২৯)

- জায়গা- জাগাত ই
- বহন করা- বাইত,
- থেকে- থাইক্যা।

‘তিলক ক্ষিপিয়া উঠিয়া বলিল শিক্ষিত হইলে শাদি সম্বন্ধ করব কিনা। আরে সুবলা তুই বুঝবি কি। তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়্যা লোকের উপর।’ (পৃ- ৩০)

- বিয়ে- শাদি,
- মেয়ে- মাইয়া।

‘তা হইলে কি জাইন্যা শুইন্যা নগরবাসী এই গাঁও সম্বন্ধ ঠিক করত?’ (পৃ- ৩১)

- জানা- জাইন্যা,
- শোনা- শুইন্যা,
- গ্রাম- গাঁও।

সুবলাকেও সাহস দিল ‘না সুবলা, ডরাইসনা। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে না গাঙের বিপদ পারের কাছে। বার গাঙে মা গঙ্গা থাকে বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে।’ (পৃ- ৩২)

- ভয়- ডর,

- মাঝ- মাইঝ,
- নৌকা- নাইয়ারে।

'ইখানই নাও রাখ সুবলা। দুপুরের ভাত ইখানেই খাইয়া যাই।' (পৃ- ৩৪)

- এখানে- ইখানই,
- নৌকা- নাও,
- খেয়ে- খাইয়া।

'কইরে সুবলা কি করবে কর। নাও ভাসাইয়া দিমু।' (পৃ- ৩৫)

- কোথায়- কইরে,
- দেব- দিমু।

'দাড়া ফুলেরে আগে দেইখ্যা লই, বড় রাঙ্গিলা ফুল কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। এই মাইয়ারে জিগা, ইটা কি ফুল কইয়্যা যাক।' (পৃ- ৪৫)

- দেখা - দেইখ্যা,
- নেওয়া - লই,
- রাঙা - রাঙ্গিল,
- জিজ্ঞাস করা- জিগা,
- এটা - ইটা,
- বলা - কইয়্যা।

'আমি একখানা পরস্তাব জানি। এ মাইয়ারে দেইখ্যা এক পুরুষ কেমুন কইরা পাগল হইল কয় এরে বিয়া করুম।'

- দেখা - দেইখ্যা,
- কেমন - কেমুন,
- করে - কইরা (করিয়া- কইরা- করে- অপিনিহিতি)

'উদয়তারা একদলা কাই হাতের তালুতে দলিতে দলিতে বলিল ..... একথার মান্তি কি' (পৃ- ১৭৬)

- অনেকটা অর্থে - একদলা,
- পুর - কাই,

- মানে - মান্তি।

'উদয়তারা শিলোকের রাজা, শিলোক দেউক, আর আমরা মানতি করি- ঘুম তা হইলে পলাইব' (পৃ- ১৭৬)

- দেওয়া - দেউক,
- মিনতি - মানতি,
- পালানো - পলাইব।

'এইবার হাঁইট্যা দেখ' (পৃ- ১৯৪)

- হাঁটা - হাঁইট্যা।

'ঠুনকা জিনিস লইয়া তারা গাঙে চলা ফিরা করে, নাওয়ে নাও মাইট্যা জিনিস ভাইঙ্গা চুরমুদুর হইয়া যায়।'

- ভঙ্গুর - ঠুনকা- ঠুনকো,
- নৌকা - নাও,
- মাটি - মাইট্যা,
- ভেঙে - ভাইঙ্গা।

'তোমারে বড় বইল্যা মানুষ ঠাট্টা করব।'

- বলা - বইল্যা,
- মজা - ঠাট্টা।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

'তু বল না কঠো
তু বল মাইকে মদেশিয়া মেয়ের বিনবিনে গলা
লে লে শুন, তু আঁখ বুজা কর। উসকো বাদ ই টিকিটপর হাত লাগা দে, যা উঠবেক, উ আমি কিন লিব। লে আঁখ বুজা কর। (পৃ- ২৫)

- তুই- তু
- নে নে- লে লে,
- শোন- শুন,

- চোখ- আঁখ,
- বন্ধ- বুজা,
- করা- কর,
- লাগানো- লাগা,
- দাও- দে,
- উঠবে- উঠবেক,
- ওটা- উ,
- কিনে- কিন,
- নেব- লিব,
- নে- লে,
- বুজা কর- বন্ধ কর।

'হজুর মুই ফরেস্টরচন্দ্র আসি গেইছি।' (পৃ- ৩৮)

- আমি- মুই,
- এসে- আসি,
- গেছি- গেইছি।

'না হে কাঠ ভাসি যাছে, কাঠখান ভাসি গেলাক আর তঁয় কইথে ভাসি আইলক? মাদেশিয়া গলায় নিরুত্তেজ রসিকতা। নদীর পান মাইত গেলে হে?' (পৃ- ৬৫)

- ভেসে- ভাসি,
- গেল- গেলাক,
- যাচ্ছে- যাছে,
- কোথা থেকে- কইথে,
- এল- আইলক,
- মধ্যে- মাইত।

'কোটত মাথা আর কোটত ল্যাজ'

- কোথায়- কোটত ।

'সে জোতদার টোতদার নিয়্যা যা কওয়ার কও। চর নিয়্যাৎ কিছু কওয়া চলবে না। চরে জোতদার নাই। অধিয়ারও নাই, সেটোলমেন্ট নাই, পাট্টাও নাই।' (পৃ- ৭২)

- নিয়ে- নিয়্যা,
- বলার- কওয়ার,
- বলা- কও,
- নিয়া- নিয়্যাৎ।

'হৃষীকেশ হঠাৎ মুখ তুলে সবাইকে জিজ্ঞেস করে, কহেন আপনারা এইঠে কি চাটিবার ধইচছি আমি? এইঠে এক চাট, আবার ঐঠে।' (পৃ- ৭৪)

- বলেন- কহেন,
- এখানে- এইঠে,
- ধরেছি- ধইচছি,
- ওখানে- ঐঠে।

'কমরেড তোঁহাক জমিত যাবার কইসে কেন? কুনো গোলমাল বাধি গেইল।' (পৃ- ৮০)

- তোমার- তোঁহাক,
- বলেছে- কইসে,
- কোনো- কুনো,
- গেল- গেইল।

'এককেবারে বইঠকে- বইঠকে বাতচিত? খাড়কে খাড়কে না?'

- একেবারে- এক্কেবারে,
- বসে- বইঠকে,
- দাঁড়িয়ে- খাড়কে।

'হৃষিকেশ বলে হালায় আর সিগারেট ফুঁইকতে হবে না, তাড়াতাড়ি দৌড় লাগা। আনন্দপুর জমিতে কাইজা লাইগ্যা গিছে চল-চল্।' (পৃ- ৮৫)

- ফোঁকা অর্থে- ফুঁইকতে,
- যাওয়া অর্থে- লাগা,

- কাজ- কাইজ্যা,
- লাগা- লাইগ্যা।

'সামনে ঢিবির ওপরে যারা চিয়াডি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা চিৎকার করে ওঠে।' (পৃ- ৮৭)

- চেয়ার- চিয়াডি।

'হে এ এমেলিয়ার বাবু। তোমবালার ক্যানং কথা? আরে বাঘারুখান ত মোর না আছিল, মানষিলা দিসে।'

- কোনো- ক্যানং, (পৃ- ৯৫)
- ছিল না- না আছিল,
- মানুষ- মানষিলা,
- দেয়- দিসে।

'মুইত এ্যানং কান্দিবার ধরিছু যে জঙ্গলের গাছঠে পাখি উড়ে গেইসে।' (পৃ- ৯৫)

- আমি- মুই,
- এখন- এনং,
- ধরেছে- ধরিছু,
- গাছে- গাছঠে,
- গেছে- গেইসে।

'বাঘারু ঘুড়ে এমএল এর মুখোমুখি দাঁড়ায়। মাওয়েরে মোর প্রসব বেদনা উঠিবার ধরিছে। মুই জন্মিবার ধইচছি। মাওয়ের প্যাটখ্যান ফালা ফালা করি বাহির হওয়া ধইচছি।' (পৃ- ৯৫)

- ধরেছে- ধইচছি,
- পেট- প্যাট।

'মুই কান্দি আর পাখি চিল্লায়। পাখি চিল্লায় আর মুই কান্দি
কিন্তু নারী কাটিবে কায়? ক্যানং করি?'

- চেঁচানো- চিল্লায়,
- কেমন- ক্যানং,
- কাটবে- কাটিবে,

- কে- কায়,
- করে- করি।

হরিশঙ্কর জলদাসের 'জলপুত্র' (২০১২) উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

'চন্দ্রমণি আইজো নো আইয়ে বউ শ্বশুরের প্রশ্ন বাস্তবজগতে ফিরে আসে ভুবনেশ্বরী। বলে নো আইয়ে।'

- আজও- আইজো, (পৃ- ৮)
- এসেছে- আইয়ে,
- না এসেছে- নো আইয়ে।

'অন্নচরণ বললো, গত পাঁচ বছরত্ প্রেমদাইশ্যার মত নাউট্যাপোয়া এই গোরমত্ নো আইয়্যে।'

- নাট্যদলের ছেলে- নাউট্যাপোয়া, (পৃ- ১১)
- গ্রাম- গোরমত,
- এসে- আইয়্যে,
- বছর- বছরত্।

'পানবুড়ি বলে উঠল কী সোন্দর নাচ্রে বাপ পোয়া ইবার নাচ্ দেই এই বয়সতও বুকগান খালি লাআর।'

- সুন্দর- সোন্দর, (পৃ- ১১)
- এবার- ইবার,
- বুকখান- বুকগান,
- ছেলে- পোয়া,
- লাগে- লা আর,
- বয়সেও- বয়সতও।

'সুবল বলেছে, আজিয়া আঁর লগে নাউট্যাপোয়া রাইত কাডাইব।' (পৃ- ১২)

- আজি- আজিয়া,
- সাথে- লগে,
- রাত- রাইত,
- কাটাব- কাডাইব,

- তার- আঁর।

'বহদ্দরকে জিজ্ঞাস করলাম, এই মাছ দাম কত দাওন পড়িবো বহদ্দর।' (পৃ- ১৭)

- দাও- দাওন,
- পড়ব- পড়িবো,

'ভুবন বলল, তোঁয়ার আশির্ব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যা। ইক্কিনি আর পোয়ার পরানখুলি আশিব্বাদ গইজ্যে। যেএন লেয়াপড়া গরিত পারে।'

- ক্লাস- কেলাস,
- ফোর- ফোরত,
- উঠে- উইঠ্যা,
- এখন- ইক্কিনি,
- ছেলের- পোয়ার,
- করা অর্থে- গইজ্যে,
- লেখাপড়া- লেয়াপড়া।

'বা আজি তোঁয়ার এক্কান কথা কইতাম।'

- আজ- আজি,
- তোরে- তোঁয়ারে,
- এক্কান- একখানা।

'মাছ তো তোঁয়ার কাছে বাজার দামে বেচনের কথা, তুঁই তো তোঁয়ার ইচ্ছা মতন চাইতা লাইগ্যা।'

- তাঁর- তোঁয়ার,
- মতন- মতন,
- বেচার- বেচনের,
- চাইতে- চাইতা,
- লেগে- লাইগ্যা।

'তুঁই এন কী কইত্যা লাইগ্যা। পরের মাইয়া ঘরত। হুইনল্যে তোয়ারে কী ভাবিবো। তুঁই নো হউর।'

- বলা- কইত্যা,
- লাগা/লাগল- লাইগ্যা,

- মেয়ে- মাইয়া,
- ঘরে- ঘরত,
- শুনিলে- হুইনল্যে,
- তোমাকে- তোঁয়ারে,
- হওয়া- হউর।

'আজিয়া দুইজ্যার অবস্থা দেইখ্যানি? তুয়ানর মতিগতি বঅর বেদিশা লা আর।'

- আজ- আজিয়া,
- দুজনার- দুইজ্যার,
- দেহখানি- দেইখ্যানি,
- তাহার- তুয়ানর,
- বড়- বঅর।
- নেই আর- লা আর।

'মামী কস্টে সিস্টে রাতগান কাডাই দাও, বিয়ানে আঁই আবার আইস্যাম।'

- রাতগান- রাতখান,
- কাটিয়ে- কাডাই,
- এস- আঁই,
- আসা- আইস্যম।

'আঁবার পোয়াঅল লেখাপড়া শিখবো নিজের নাম লেইত পারিবো হিয়ান নো ভাবি কনঅ দিন।'

- ছেলেবুলে- পোয়াঅল,
- শিখব- শিখিবো,
- লিখতে পারা- লেইত পারিবো,
- এখন- হিয়ান,
- কোন- কনঅ।

'না মা, বইতাম নো। বউত কাম। এই জাইলা অলোর জাগান পড়িবো।'

- বহনকরা- বওয়া- বইতাম,
- অনেক- বউত,
- জাগানো- জাগান,
- পাড়া- পাড়িবো।

'তোয়ার মঙ্গল হোক জননী, ঠাকুর তোঁয়ার মনের কষ্ট দূর গরুক।'

- তোমার- তোঁয়ার

প্রথম অধ্যায়

অপ্রমিত শব্দের বিচার, সংজ্ঞা, পরিসর নির্নয় এবং আঞ্চলিক ধারনা :

উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনার আগে অপ্রমিত ভাষারূপ কী তা আলোচনা করার আগে জানতে হবে প্রমিত ভাষা কাকে বলে। তাহলে সহজেই বোঝা যাবে অপ্রমিত ভাষা কী? প্রমিত ভাষা হল যে কোনো ভাষার মধ্যে গড়ে ওঠা একটা সর্বজনীন ও সর্বজন ব্যবহৃত রূপ। প্রমিতের বদলে আদর্শ ভাষারূপ কথাটিও কোথাও কোথাও প্রচলিত। ভাষার এই প্রমিতায়ন বা আদর্শায়ন ঘটে কখন? সাধারণ ভাবে যে ভাষায় একাধিক আঞ্চলিক উপভাষা আর সামাজিক শ্রেণিভাষা থাকে তারই একটি প্রমিত রূপের দরকার হয়। দরকার হয় একটি অভিন্ন ভাষারূপের মধ্যে দিয়ে ভাষীদের সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের কাছে সরকারী বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সংবাদ প্রচারের জন্য এইরকম নানা উদ্দেশ্যে। তার একটা লিখিত রূপ তৈরী হয় লেখার মধ্যে দিয়ে, আর একটা মৌখিক রূপ তৈরী হয় নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌলিক যোগাযোগের কারনে ও মাধ্যমে। পরে কলকাতা রাজধানী হওয়ার এর একটি নতূন তথ্য উদ্ভূত। এলিট শ্রেণির মুখের ভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রমিত মৌখিক ভাষারূপের নাম এ বাংলায় একসময়ে শিষ্ট চলিত বাংলা পরে আমরা শিষ্ট কথাটিকে বর্জন করে মান্য চলিত বাংলা নাম দিই। বাংলাদেশে সেটাই প্রমিত বাংলা নামে পরিচিত। গল্প উপন্যাস, পাঠ্যবই, দলিলপত্র সেই প্রমিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। প্রমিত গদ্য ব্যবহৃত হয় বা তার শৈলীবদ্ধরূপ লেখকের বর্ণনা অংশে এই ব্যবহৃত হয়। এই প্রমিত ভাষারূপের মূল চরিত্র হল যে তার ব্যবহার স্থান সীমায়/ শ্রেণী বিশেষের মৌখিক ভাষার সাথে তার মিল থাকতে পারে। হতেই পারে ওই অঞ্চলের মুখের ভাষা। সকলের মুখের ভাষা নয়। ওই অঞ্চলের এলিট শ্রেণির মুখের ভাষা।

আর এই ভাষারূপ উপলক্ষ্য বিশেষ ভাষার সমস্ত বক্তার দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাদের নিজেদের উপভাষা/শ্রেণিভাষা যায় হোক না কেন। তা ব্যবহারের উপলক্ষ ও অন্য সমস্ত উপভাষা বা শ্রেণিভাষা চেয়ে অনেক বেশি। এ বক্তাদের অনেকের জন্মভাষা আর গৃহভাষা প্রমিত ভাষা নয়, তাও মিথ্যে নয়। সব ভাষাতেই অপ্রমিত ভাষার মানুষদের অনেককেই প্রমিত ভাষা শিখতে হয়, বাংলাতেও তাই হয়, সব বড় ভাষাতেই প্রমিত শব্দের একটা খোলা আর বাধ্যতামূলক রাস্তা হল শিক্ষাব্যবস্থা-পাঠ্যবইয়ে তা লিখিত আকারে। আর ক্লাস ঘরে শিক্ষার আদান প্রদান প্রায় মৌখিক আকারে তা অন্যভাষার ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়।

মানুষ যখন শয্যাকক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, একভাবে বলে, বাবা-মা, ভাই-বোন অথবা ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলে আরেক ভাবে, যখন সমাজের ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলে আরো ভিন্নরূপে, আরো মার্জিত রূপে বলে। প্রমিত-অপ্রমিতের বিষয়টাও ঠিক এরকম। প্রমিত ভাষা সামাজিক ও সবার বোধগম্য ভাষা প্রমিতের সার্বজনীন রূপ আছে, নির্দিষ্ট

মাপকাঠি আছে, অপ্রমিতের তা নেই, একেক অঞ্চলে একেক ভাষা প্রচলিত। সব অঞ্চলের ভাষা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি ব্যালা সিলেটি আঞ্চলিক উপভাষার কথা, এ ভাষা উভয় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্য বোঝা সহজসাধ্য নয়। চট্টোগ্রামের বিভিন্ন স্থানের ভাষা হয়ে উঠেছে জটীল থেকে জটীলতর। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কথ্য ভাষারও। বলা হয়ে থাকে 'কারো বুলি কারো গালি'। কথাটি একেবারে মিথ্যে নয়।

আঞ্চলিক ভাষা ও ভাষীদের প্রতি ও আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল আঞ্চলিক ভাষা মানেই অশুদ্ধভাষা নয়। এই ভাষা ও স্বস্থানে শুদ্ধ ও ব্যবহার যোগ্য। কেউ যদি এ ভাষাতে চর্চা করতে চান অবশ্যই করতে পারেন। নাটক, সিনেমাতে এই অপ্রমিতের ব্যবহার হচ্ছে। নাটক বা সিনেমা সমাজের প্রতিবিম্ব এর চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনে যথার্থ স্থানে অপ্রমিতের ভাষা চলতে পারে। কেননা সমাজের অধিকাংশ মানুষ অপ্রমিতে কথা বলতে অভ্যস্ত। এই কথা গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে কাহিনী চরিত্রের প্রয়োজনে উপযুক্ত স্থানে অপ্রমিতের ব্যবহার গ্রাহ্য। প্রমিত সার্বজনীন ভাষা। অপ্রমিত ভাষাও ক্ষেত্রভেদে গ্রাহ্য ও চর্চা যোগ্য। যে কেউ অপ্রমিতের চর্চা করতে পারেন, প্রমিতকে অস্বীকার করে না।

বাংলা উপন্যাসে ভাষার মাধ্যম

প্রথম পর্ব : সাধুভাষা

বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দবহুল, সুষ্ঠু সর্বজনবোধ্য অথচ নিয়মবদ্ধ ও কৃত্রিম ভাষারূপ হল সাধুভাষা। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে সংস্কৃতানুসারী যে লেখ্য বাংলা ভাষা উনিশ শতকের শুরুর দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচনার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল, সেই ভাষাকে বলে সাধুভাষা। বলাবাহুল্য বাংলা ভাষার কেবল সাহিত্যিক রূপটিকেই সাধুভাষা বলা হয়। সাধু ভাষা মূলত সংস্কৃতানুসারী। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছিল যেটি সাধুভাষা নামেই পরিচিত ছিল। সাধুভাষা এককালে মূলত উপভাষা নামেই পরিচিত ছিল। সাধুভাষা এককালে মূলত উপভাষা থেকে জন্মেছিল। বিশেষত অনেকগুলি যেমন- গৌড়, নবদ্বীপ ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের উপভাষার মিশ্রণের ফলে বাংলা সাধু ভাষার আদি রূপটি গড়ে উঠেছে। আর সংস্কৃত ও ফরাসি ভাষার পন্ডিতরা তাঁদের লেখায় ফরাসি ও আরবি শব্দের ব্যবহার করে সাধু ভাষাকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলেছিল।

সাধুভাষায় গদ্য সাহিত্য রচনার নিদর্শন প্রথম পাওয়া জায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের রচনায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যলঙ্কার ও রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গ্রন্থে সাধুভাষার প্রয়োগ আছে। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের রচনাতে। সাধু ভাষার একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ গড়ে তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দুই শতাব্দী ধরে সাধু ভাষা সাহিত্যের লিখিত ভাষা ছিল। এরপর উনিশ শতকে চলিত রীতির ব্যবহার শুরু হওয়ায় সাধু ভাষার ব্যবহার একেবারে কমে গেছে।

বাংলা উপন্যাসের ভাষার মাধ্যম ছিল সাধুভাষা। উপন্যাসে প্রথম পর্বে ছিল সাধুভাষার ব্যবহার। ১৮১৭ সালের মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা সাধুভাষা প্রচারের কাজে সেটিও বিশেষ সহায়তা করেছিল। বাংলা সাধু গদ্যের আবার নবযুগের আবির্ভাব ঘটল বঙ্কিমচন্দ্রের মানসলোকে। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে দেখা যায় -

'আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক আয়েষা দেখতে পরম সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য দুইচারি শব্দে প্রকটিত করা দুঃসাধ্য ... কোনো কোনো তরুণ সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়।'

আবার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখা যায় -

'নগেন্দ্রনাথ দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল ঢল ঢল চলিতেছে- ছুটিতেছে- বাতাস নাচিতেছে- রৌদ্রে হাসিতেছে- আবর্তে ভাসিতেছে।'

সাধুভাষার ব্যপক ব্যবহার দেখা যায় তার উপন্যাসে।

বঙ্কিমযুগের বিশেষ কয়েকজন গদ্যরচয়িতার কথা বাদ দিলে অপর যে যুগ আমাদের স্মরণে আসে তা হল রবীন্দ্রযুগ বঙ্কিম সাধাগদ্যের উন্নতিতে তরান্বিত করেছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা সাধু গদ্যের সর্বোত্তম বিকাশ যদিও হিতবাদী ও সাধনা প্রকাশের মুহুর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অভিনব সৌন্দর্য নানাবর্ণে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তার একান্ত নিজস্ব গদ্যরীতিটি পরিস্ফুট হয়েছিল য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রতে। তবে একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন সবুজপত্রের যুগ আরম্ভ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপযাত্রীর ডায়রী ছাড়া আর অন্য কোনো মূখ্য গদ্যরচনায় চলিত ভাষার ব্যবহার করেননি। কেননা তখনকার সাধু গদ্যের প্রবল প্রতাপকে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮১-১৮৮২), 'চোখের বালি' (১৯০১-১৯০২) সাধুগদ্যে লিখিত

'দেখো, সমুদ্রের ওপরে আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতাম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক মেলে না।'

উল্লেখিত উদাহরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় অতিদীর্ঘ সমাসের বর্জন শব্দপ্রয়োগের লালিত্য অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বাক্য প্রবাহের স্বাভাবিক ছন্দমূলক গতি রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এই দুই রীতির গদ্যেরই বৈশিষ্ট্য। আবার-

'লাবন্য লেখা পশ্চিম প্রদেশের নকশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে প্রান্তর পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জ্জন নদীকূললালিতা অম্লান প্রফুল্ল কাশবনশ্রীর মত হাস্য ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।'

রবীন্দ্রনাথ সাধুগদ্যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের একছত্র অধিপত্র, যেমন- 'মাঝে মাঝে এক একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে।' বা 'একটু ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল'।

রবীন্দ্রনাথের সাধুগদ্যের নিদর্শনে-

'সন্ধ্যা হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে রাস্তায় একবুক দাঁড়াইয়াছে, আমাদের পুকুর ভর্তি হইয়া গিয়েছে, বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের ওপর আছে' (জীবনস্মৃতি)

অপ্রমিতের অবস্থানকে নির্দেশ করতে উপন্যাসের লেখার মাধ্যম প্রথমপর্বে সাধুভাষার ব্যবহার কীরূপ হত তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিন্তু উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যে দেখানো গেল বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'(১৮৮২) 'দেবীচৌধুরণী'(১৮৮৪) 'সীতারাম'(১৮৮৭) উপন্যাস গুলিতেও সাধুগদ্যের ব্যবহার রয়েছে। আবার 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে রয়েছে-

'আ, সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছি? কি সুন্দর! তুমি বইস, আমি হস্তপ্রক্ষালন করি।'

দ্বিতীয়পর্ব

শিষ্টচলিত বাংলা বা মান্য চলিত

প্রমিত মৌখিক ভাষারূপের নাম বাংলায় একসময় শিষ্ট সাহিত্য ছিল। 'শিষ্ট' কথাটির অর্থ শান্ত, পরে শিষ্ট কথাটি বর্জন করে মান্য চলিত বাংলা নাম দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সেটাই চলিত ভাষা নামে প্রচলিত বলা যায়। যে কোনো শিষ্ট সাহিত্যের বা প্রমিতে ভাষারূপের একটি মৌখিক ও লিখতরূপ আছে। শিষ্ট সাহিত্য সাধারণ শিক্ষাদান, বিধানসভা, সংসদ, শিক্ষালয় এবং অন্যত্র নানা আচারিক বক্তৃতায়, সংবাদ মাধ্যমে, সংবাদপ্রচারে, ঘোষণা ও নানারূপ কথপোকথন। বাংলার এক প্রান্তের মানুষের সাথে অন্যপ্রান্তের মানুষের কথাবার্তায় নানা উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। আর লিখিত শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা, দলিলপত্রে, পাঠ্যবইয়া সাহিত্যের নানা অংশে বিশেষ করে আলোচনাত্মক রচনাতে ব্যবহৃত হয়।

১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সবুজ পত্রকে অবলম্বন করে চলিত ভাষাকেই সাহিত্য ও মাননের ভাষা হিসাবে মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। উনিশ শতকে সাধুভাষাকেই প্রমিত বাংলা হিসাবে ধরে নেওয়ার ফলে একটা শব্দরুচি ও বাক্যগঠণ বাঙালি লেখক ও পাঠকদের ক্ষতিকারক অভ্যাসে এসে গিয়েছিল। পরে যখন চলিত ভাষায় রচনার প্রধান ভাষা হিসাবে আভাস এল এখনো কিন্তু এই জন্মদোষ কাটল না। ক্রিয়াপদের স্বল্পতা বাক্যকে সবসময় ক্রিয়া নির্ভর করে তোলে।

বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার জন্য ভাগিরথী, হুগলী নদীর তীরবর্তী নবদ্বীপ শান্তিপুর এবং কলকাতায় প্রচলিত ভাষাকে নেওয়া হয়েছিল। এরই নাম শিষ্ট চলিত ভাষা এখন শিষ্ট চলিত ভাষায় বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনা করা হয়।

তবে একটু বলাবাহুল্য যে এখন শিষ্ট ভাষাতে কথা বলাকে তাদের কাছে মনে হয় হাস্যকর, লজ্জাকর, অপ্রয়োজনীয়, আঞ্চলিক উচ্চারণকে যতটা সম্ভব বিকৃত করে চমকসৃষ্টিকরী অর্থহীন শব্দকে নানারকম খিচুরী মার্কা কথায় বলা এ প্রজন্মের লক্ষণ। তাছাড়া অশুদ্ধ ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ, ইংরাজী উচ্চারণ বাংলিশ ধরনের অদ্ভুদ ভাষারীতি।

তৃতীয়পর্ব

শিষ্ট চলিত ভাষার লিখিত উপন্যাসের মধ্যে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ

এই রকম শিষ্ট চলিত ভাষার লিখিত উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। এই আঞ্চলিক উপন্যাস বা তথা অপ্রমিত শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় তার মধ্যে থেকে চারটি উপন্যাসকে নির্বাচিত করে এই গবেষণা সৌন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হচ্ছে। উপন্যাসগুলি হল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’(১৯৩৪-১৯৩৫) অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’(১৯৫৬) দেবেশ রায়ের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’(১৯৮৮) এবং হরিশঙ্কর জলদাসের ‘জলপুত্র’(২০১২) । এক্ষেত্রে দেখানো যাক চারটি উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ কিভাবে হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে-

মানিক বন্দ্যোপাধায়ের : ‘পদ্মানদীর মাঝি’(১৯৩৪-১৯৩৫)

নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমাখন্ডে রচিত ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে জেলে জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে তাদের মুখ দিয়ে বলা আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ। বর্ষার মাঝামাঝি পদ্মায় ইলিশ ধরার মরশুনে দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে কুবের মাঝি মাছ ধরছিল। তার সাথে থাকে ধনঞ্জয় ও গনেশ। কুবের একটু জিরাতে গেলে আজান খুঁড়া বলে

‘জিরানের লাইগ্যা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়াল।’ (পৃ- ৯)

- লেগে- লাইগা
- মর- মরস
- কেন- ক্যান
- বল দেখি- ক দেহি
- সারাটা- সারাডা (এখানে ‘ট’-র পরিবর্তে ‘ড’এসেছে আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগে)
- বাড়ি- বাড়িত্ (ত্-এর আগম ঘটেছে)
- দিয়ে নে- দিয়াল

'কুবের হাঁকিয়া বলে যদু হে এএএ- মাছ কিবা।' (পৃ- ৮)

- হে এএএ- প্লুতস্বরের ব্যবহার রয়েছে।
- কত - কিবা (আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ)

'গনেশ হঠাৎ মিনতি করে বলিল, একখান গীত ক দেখি কুবির হ, গীত না তর মাথা' (পৃ- ৯)

- কুবের- কুবির (আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ)
- তোর- তর।

'সে রাগ করিয়া বলিল, কী কন! কী কই জানস না? মাছ লইয়া আয় তিনডা আনিস।' (পৃ- ১১)

- বলা- কন,
- বলা- কই,
- নিয়ে- লইয়া,
- তিনটে- তিনডা (এখানে 'ট' এর পরিবর্তে অঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে 'ড' হয়েছে)

কুবেরকে মাছ আনতে বললে কুবের মাথা নেড়ে বলে-

'কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখনা? বাজারে কেনো গা আইজ।' (পৃ- ১১)

- নারল- নাড়িল (স্বরধ্বনির আগমন হয়েছে)
- আজ- আইজ,
- পারব না- পারুম না,
- সোজা- সিদা,
- চেয়ে- চাইয়া,
- রয়েছে- রইছে,
- গে- গা,
- আজ- আইজ,

শেতলবাবু মিনতি করে বলে-

'তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই।' (পৃ- ১১)

- আজ- আইজ,
- কর কেন- করস ক্যান,

- কটা- কয়ডা,
- নিস- লইস।

'শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইয়েন না। দামটা দ্যান দেখি।' (পৃ- ১২)

- করে- কইরা,
- যাবেন না- যাইয়েন না,
- দিন- দ্যান।

'আই, অখন দ্যান। খামুনা? পোলাগো খাওয়ামু না? পয়সা নাই তো দিমু কী? কাম দিমু নিয্যই দিমুত।' (পৃ- ১২)

- এখন- অখন,
- দিন- দ্যান,
- খাবনা- খামুনা,
- দেব- দিমু,
- নিশ্চয়- নিয্যই।

'ইটা কী কও খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুইশ সাতাইশটা মাছ হইছিল।' (পৃ- ১২)

- এটা- ইটা,
- কাল- কাইল।

গনেশ সহসা মমতা বোধ করে বলে-

'আইলে পারতি কুবির আইজ। কুবের কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।' (পৃ- ১৩)

- এলে- আইলে,
- পারত- পারতি,
- আজ- আইজ।

'শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির, কুবের আবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা ইটা হইল কিবা? ক্যান? নয় মাস খালাস হয় না?' (পৃ- ১৫)

- শেষ- শ্যাষ,
- রাতে- রাইতে,
- গিয়ে- পুইরা,

- ইটা- এটা,
- কী করে- কিবা,
- কেন- ক্যান,

কুবেরের স্তিমিত চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠল। নকুল শয়তানি হাসি পরিহাস করে বলে-

'তুই দেখি কালাকুষ্টি কুবের, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইক্যা? ঘরে তো থাকস না রাইতে কিছু কত্তন যায় না বাপু।' (পৃ- ১৫)

- এল- আইল,
- কোথা থেকে- কোয়ান থেইক্যা।

শেষে বিরক্ত হয়ে কুবের বলল-

'চুপ যা গনেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা।' (পৃ- ১৫)

- করব- করুম,
- খাওয়া- খাওন,
- নিজের- নিজেগোর।

গনেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-

'তুই নি গোসা করস কুবির করুম না? মইরবার কস নাকি আমাকে তুই?' (পৃ- ১৫)

- মরবার- মইরবার,
- বলা- কস।

আবার গনেশ বলে-

'চল কুবির না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।' (পৃ- ১৯)

- থুয়ে- থুইয়া,
- আসি- আহি,
- ডেকে- ডাইকা,
- বসে- বইয়া।

'কুবের বলিল হ,ল যাই। আইচ্ছা তুই ক দেখি গনেশ, হীরুজাঠার ঠাঁই দুগা সন চামু নাকি?দিব না?' (পৃ- ২০)

- আচ্ছা- আইচ্ছা,

- দুগাছা- দুগা,
- চাইব- চামু।

গনেশ বলল -

'হীরুজ্যোঠা ছন দিব?জ্যাঠারে তুই চিনম না কুবির। কাইলের কান্ত জানস? বিহনে ঘরে ফির‍্যা শুমু, ...' (পৃ- ২০)

- চিনিস- চিনসম না,
- কালকের- কাইলের,
- জান- জানস,
- বিকালে- বিহানে,
- ফিরে- ফির‍্যা,
- শওয়া- শুমু।

'করুম না! গাও জ্বালাইনা কথা কস যে! আজান খুড়া আছে ল যাই।' (পৃ- ২১)

- করব না- করুম না,
- গা জ্বালানোর- গাও জ্বালাইনা,
- বলিস- কস,
- নিয়ে যা- ল যাই।

'আঁতুড়ে হইতে ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, আ গো যাইও না। শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।' (পৃ- ২১)

- যেও না- যাইও না,
- শুনে যাও- শুইনা যাও,
- কি- নি (আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ)
- দেওয়া- দেওন।

'...কিয়ের সমান! ছন না পাইতা ভিজা শোওন যায়? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা থাক। চালার লাইগা ছল লাগে আইনা দিমু।' (পৃ- ২১)

- কিসের- কিয়ের,
- পেতে- পাইতা,
- শোওয়া- শোওন,

- করে- কইরা,
- জন্য- লাইগা,
- দেব- দিমু।

'মালা আপশোশ করে বলিল, কবে গেল? আগে নি একবার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম- কইলকাতার পয়হায় দশখান পাওয়া যায়।' (পৃ- ২২)

- পয়সার- পয়হার,
- সূঁচ-সুই,
- আনবার- আইনবার,
- বলতাম- কইতাম।

'গণেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু। পোলাপানে মেলায় যাওনের লেইগা খেইপা আছে, না গেলে চলব ক্যান।' (পৃ- ২৪)

- যাব- যামু,
- ভাই- বাই,
- যাওয়ার- যাওনের,
- জন্য- লেইগা,
- খেপে- খেইপা,
- চলবে কেন- চলব ক্যান।

ধনঞ্জয় মন দিয়ে শোনেনি, সি জিজ্ঞাসা করে-

'কেডা? কী কয়? কুবের কহিল, আমাগোর রাসু।' (পৃ- ২৫)

- কে- কেডা,
- বলে- কয়,
- বলল- কহিল,
- আমাদের- আমাগোর।

'রাসুর গলা চিনি না খুড়া, অখনি আইবো দেইখো।' (পৃ- ২৫)

- এখনি- অখনি,

- আসবে- আইবো,
- দেখো- দেইখো।

'পদ্মানদীর চিরন্তন রীতি অনুসারে কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কোন গাঁও থেইকা আইলা মাঝি যাইবা কোয়ানে?'

- গাঁ- গাঁও, (পৃ- ২৬)
- থেকে- থেইকা,
- এলে- আইলা,
- যাবা- যাইবা,
- কোথায়- কোয়ানে,

পীতমের কথা শুনে রাসু বলে ওঠে-

'আমি একা ফির‍্যা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি ফির‍্যা আইলাম।' (পৃ- ২৮)

- ফিরে- ফির‍্যা,
- ভাসিয়ে- ভাসাইয়া।

'ত্যাল, মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইবে- অমর্ত। আমিনুদ্দির ঠাঁই প্যাজ রসুন মাইগা আইগা।' (পৃ- ৩০)

- ব্যঞ্জন- ব্যানুন।

'সিধু আহত হইয়া বলে, দিমু না? কস কী কুবির! তারে না দিয়া যামু কই? (পৃ- ৩০)

- দেব না- দিমু না,
- বলিস কী- কস কী,
- তোকে- তারে,
- যাব- যামু,
- কোথায়- কই।

'.....মাথার ভাগ দিব না। আইঠা কলা দিব, দেইখো।' (পৃ- ৩০)

- দেব না- দিব না।

'কুবের বাই ছাড়ান দাও। আরে হোই আমিনুদ্দি, সামাল দে। পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই।'

- ভাই- বাই, (পৃ- ৩২)
- ছাড়া- ছাড়ান,
- কাজ- কাইজ্যা,
- কর- করস,
- তোদের- তগর,
- লজ্জা- শরম।

'কেডা জানে? ফিরতি বেলায় মেলার মদ্যি মাইজ্য কর্তা ডাইকা কয়, গাঁয়ে ফেসর নাকি গনেশ? - মাছগুলা বাড়িত্ দিয়া আসিস, লইয়া যা। কইয়া একডালা ইছামাছ দিলেন। মাছ দিবার লাইগা গনশা কর্তাগো বাড়িত গেছে সন্দ করি।' (পৃ- ৩৩)

- কে জানে- কেডা জানে,
- ফেরার বেলায়- ফিরতি বেলায়,
- মধ্যে- মদ্যি,
- মেজো- মাইজ্য,
- ডেকে- ডাইকা,
- বলে- কয়,
- বাড়ি- বাড়িত্,
- সন্দেহ- সন্দ।

'কুবের বলিল কেডা জানে? মুটাইছে দেখলাম।' (পৃ- ৩৪)

- কেজানে- কেডা জানে,
- মোটা হয়েছে- মুটাইছে।

'আলো উলিপী, পাক করছিলি কী?

আখায় দুগা বাইগন দিছিলাম আঁর ইলশার ঝোল কুকী! গায় কাপড় দিছিলাম। আর ইলশার ঝোল কুকী! গায় কাপড় তুইলা বয় হারামজাদি। মাইয়া য্যান সং।' (পৃ- ৩৫)

- উনুন- আখায়,

- দিলাম- দিছিলাম,
- বসে- বয়,
- যেন- য্যান।

'মালা সলজ্জভেবে বলে মনে ঐউককা সাধ ছিল মাঝি কমু।' (পৃ- ১০৩)

- একটা- এউককা,
- বলব- কমু।

অদ্বৈত মল্লবর্মন : 'তিতাস একটি নদীর নাম'

'না না আমরা নওই রান্ধুম, তুমি খাও গিয়া। রাইতের জালে যাও বুঝি ইখানে রাইতের জল বাত্তন লাগেনা। বেহানে কটা বিকালে কটা খেই দিলেই হয়। অদৈন্য মাছ। কত মাছ ধরবায় তুমি।' (পৃ- ৩৪)

- রাঁধব- রান্ধুম,
- বওয়া- বাত্তন।

'কইরে সুবলা কি করবে কর। নাও ভাসাইয়া দিমু।'(পৃ- ৩৫)

- কোথায় রে- কইরে,
- দেব- দিমু।

'তিনি লীলা বৃন্দাবনে আইসা সুবলাদি সখা আর ললিতা দি সখীসহ আদ্যশক্তি শ্রীমতী রধিকারে লইয়া লীলা কইরা গেছেন।' (পৃ- ৩৫)

- এসে- আইসা,
- করে- কইরা।

'কিশোর হাসিল : নারে সুবলা, না ঠিসারার কথা না! বাসন্তীরে আমার, তোর লগেই সাতপাক ঘুরাইয়া দেমু।' (পৃ- ৪৫)

- ঘুরে- ঘুরাইয়া,
- সাথে- লগে।
- দেব- দেমু।

'নারে সুবলা আমার মন যেমন কয় কথা খানা ঠিক না। যাবে লেংটা থাইক্যা দেখতেছি- ছোটোকালে যাবে কোলে পিঠ লইছি হাসাইছি কাঁদাইছি ডর দেখাহছি ভেউরা বানাইয়া দিছি- তারে কিবিয়া করন যায়; বিয়া করন যায় তারে যার লগে কোনো কালে দেখা সাক্ষাৎ নাই।' (পৃ- ৪৬)

- থেকে- থাইক্যা,
- দেখেছি- দেখতেছি,
- নিয়েছি- লইছি,
- হাসিয়েছি- হাসাইছি,
- কাঁদিয়েছি- কাঁদাইছি,
- ভেরা- ভাউরা,
- বানিয়েছি- বানাইয়া,
- দিয়েছি- দিছি,
- জন্য- লগে।

'কিশোর ডরার দিকে চাহিয়া বলিল 'কি জাললা মাছ না নাই, চাইর পয়সার মাছ দাও।' (পৃ- ৪৭)

- চার- চাইর।

'রাগের ধারধারি না। মনের মানুষ থুইয়া যাই, শেষ বুক ধাপড়ইয়া কান্দি। অতঠকাঠকির বেসতি আমি করিনা।'

- থুয়ে- থুইয়া,
- থাপড়ে- ধাপড়ইয়া,
- কাঁদি- কান্দি,

'কি তোমার আছে গো ব্যাদানি, বান্ধবা কি দিয়া।' (পৃ- ৪৮)

- বাঁধবা- বান্ধবা (নাসিক্যিভবনের প্রয়োগ ঘটেছে)
- দিয়ে- দিয়া।

‘কিশোরকে বলিয়া দিল, ‘দেখ জাল্লা উতলা হইয়া পাখির মত পাখ বাড়াইও না, রইয়া সইয়া আমগন কইর।’ (পৃ- ৫৭)

- পাখা- পাখ,
- বাড়িও- বাড়াইও,
- রয়ে- রইয়া,
- সয়ে- সইয়া,
- করা- কইর।

‘যখল লক্ষা হইল সে হা করিয়া উঠিল, ‘অ কিশোর দাদা, তুমি করতাছ কি? গুণমার, গুণমার। নাইল্যা ক্ষেত্রে অখন পানক সাপ থাকে। তুমি গুন মাইরা নাও এ উঠ।’ (পৃ- ৬০)

- করছ- করতাছ,
- না হলে- নাইল্যা,
- এখন- অখন,
- মেরে- মাইরা (অপিনিহিতির প্রয়োগ ঘটেছে)

‘আর তামুক খাইত আমার শ্বশুর। মাথায় এক ঝাঁকরা বাবরি চুল যমদূতের মত চোউখ। আমরা ডরাইতাম, সারিন্দা বাজাইত আর তামুক খাইত।’ (পৃ- ৭৬)

- খেত- খাইত,
- চোখ- চোউখ,
- বাজাত- বাজাইত,
- তামাক- তামুক।

‘সেই গাওয়ে আর মালো নাই, খালি কৈবর্তরা থাকে।’ (পৃ- ৮৩)

- গ্রামে- গাওয়ে।

‘কৃষ্ণচন্দ্র বলিল ‘কোন গুষ্টির মানুষ আগে জিগাইয়া দেখ, কোন কোন জাগায় জ্ঞেয়াতি আছে জান।’ (পৃ- ৮৮)

- জিজ্ঞেস করা- জিগাইয়া,

‘জয়নালের, কান্দনে, মনে রে, বিরিক্ষেত্র পত্র ঝরে।’ (পৃ- ৯২)

- কান্নাতে- কান্দনে

‘এই কামও কইর না বাহারুল্লা ভাই। জান থাকতে ছাইড় না।’ (পৃ- ৯৩)

- কোরো না- কইর না,
- ছেড় না- ছাইড় না।

‘বিপদ সাইরা গেছে সোনা সকল। মন খুশি কইরা জোকার দেও’ (পৃ- ১০০)

- সেরে- সাইরা,
- করে- কইরা।

‘দেখেন, ত কর্তা, মুখে পস্সাদের ভালো দিন নি আছে।’ (পৃ- ১০১)

- প্রসাদের- পস্সাদের।

‘হ কইছ কথা মিছা না। শেষ-কাটালে, ইস্তিরি কাছে না থাকলে মরণ কালে মুখে একটু জল ডিবে কেডায়? পুত ত কুত্তার কত।’ (পৃ- ১০২)

- দেবা- ডিবে,
- কে- কেডায়,
- পুত্র- পুত,
- কুকুর- কুত্তার।

‘অনন্তকে লইয়া পড়িল, ‘কিরে গোলাম! বিয়া করবি?’ ...

সে উত্তর দিল ‘করমু’

তুই কার লগে আইছস।’(পৃ- ১০৯)

- করবি- করমু,
- এসেছিস- আইছস।

‘দিদি অ অনন্তর মা, দেইখ্যা যাও তোমার অনন্তর কান্ড বুড়ার দলে মিশ্যা তোমার পুলা বুড়া হইয়া গেছে।’ (পৃ- ১১০)

- দেখে- দেইখ্যা,
- মিশে- মিশ্যা,
- ছেলে- পুলা।

‘দিদি তুমি মনে কইরা দেখ, আমিও আছলাম চিনা হইলাম।’ (পৃ- ১১৪)

- আসলাম- আছলাম,
- হলাম- হইলাম।

‘কড়ার টগবগে তেলে হাতা দিয়া গোলা ছাড়িতে ছাড়িতে অনন্তের মা বলিল, ‘আমি একখানা পরস্তাব জানি, এ মাইয়ারে দেইখ্যা এক পুরুষ কেমুন কইরা পাগল হইল, কয় এরে বিয়া করুম।’ (পৃ- ১১৫)

- প্রস্তাব- পরস্তাব,
- মেয়েকে- মাইয়ারে,
- দেখে- দেইখ্যা,
- করব- করুম।

‘তুমি ভাইন আসল কথা শুনাইলা না চাইপা গেলা।’ (পৃ- ১১৫)

- বোন- ভাইন,
- শোনালে না- শুনাইলা না,
- চেপে- চাইপা।

‘জান যদি, তবে কইবা না বলবা কেনে?
চোখে জল আইয়া পড়ে দিদি। কইতে বলতে পারি না।
একজনের কথা যে কইলা, সে মাইয়া কে? (পৃ- ১১৬)

- বলবা- কইবা,
- এসে- আইয়া,

- বলতে- কইতে,
- মেয়ে- মাইয়া।

'তবে এখন এড়াইয়া বেড়াইয়া চল কেনে ভাই এড়াইয়া চলি, তোমার কষ্ট দেইখ্যা বুক কান্দে তাই।' (পৃ- ১১৮)

- এড়িয়ে- এড়াইয়া,
- বেড়িয়ে- বেড়াইয়া,
- দেখে- দেইখ্যা,
- কাঁদে- কান্দে।

'অনন্তর মা হাসিয়া বলিল, আইজকার দিনে সকালে সকলেরে রাঙাইছে। পাগলের ত কেউ রাঙাইল না ভইন। আমি একটু রাঙাইয়া দিলাম।' (পৃ- ১২২)

- আজকের- আইজকার,
- রাঙিয়েছে- রাঙাইছে,
- বোন- ভইন।

'আমরাই দুঃখের দুঃখী অনন্তর মার মত সাথী পাওয়া, অনন্তর মত ছেলে ছাইলা কোলে পাইয়া সব জ্বালাযন্ত্রনা জুড়াম। তোমরা আমারে তার কাছে যাইতে দিবা না। দিবা না যখন। আমি মানুষ ধরুম দেখি তোমরা কদিন আমারে ঘরে বইন্দা রাখতে পার।' (পৃ- ১২৬)

- ছেলে- ছাইলা,
- জুড়াবো- জুড়াম,
- ধরব- ধরুম,
- বেঁধে- বইন্দা।

'আ-লো পোড়াকপালি, অখনই যা। অনন্তর মার কছে তুই অখনই যা। তবু পুরুষ মানুষ থাইক্যা মনটাকে ফিরাইয়া রাখ।' (পৃ- ১২৬)

- এখনই- অখনই,

- থেকে- থাইক্যা,
- ফিরে- ফিরাইয়া।

'সুবলার বউকে পাইয়া অনন্তের মা মনের আবেগ ঢালিয়া দেয়, তুমি না কইছিলা ভইন আমার একজন পুরুষ চাই। হ; চাইইত পুরুষ ছাড়া নারীর জীবনের কানাকড়ি দাম নাই।' (পৃ- ১২৭)

- বলেছিলি- কইছিলা,
- বোন- ভইন,
- চাইতো- চাইইত,
- বিশেষণ- কানাকড়ি।

'পাগলে মানুষ চিন্যাই ধরছিল। চাইর দিন আগে মরলে এক, চিতাতেই দুজনারে তুইল্যা দিতাম। পরলোক গিয়া মিল্যা যাইত।' (পৃ- ১৩৪)

- চিনে- চিন্যাই,
- চার- চাইর,
- তুলে- তুইল্যা (অপিনিহিতি)
- মিল্যা- মিলে,
- যেত- যাইত।

'মাছ বেপারীরাও এই রকম। জাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জায়গায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।' (পৃ- ১৩৮)

- দরাদরি- মুলামুলি,
- টাকার- টেকার,

'কি ঢল্ নামছে রে বাবা, গাঁও গেরাম মালুম হয় না।' (পৃ- ১৩৮)

- গ্রাম- গাঁও (নাসিক্যিভবনের প্রয়োগ ঘটেছে),

- গ্রাম- গেরাম (স্বরভক্তি)

'থাইয়া দাও, খাইতে পারবা না। খালের জলে গাঙের জলের খাইছে। মালো-পাড়ায় আমার কুটুম আছে। আলু তোলার পর নিয়া যামু তোমারে।' (পৃ- ১৪০)

- থুয়ে যাও- থাইয়া দাও,
- খেয়েছে- খাইছে,
- যাবো- যামু,
- তোমাকে- তোমারে।

'বাজারে জমছে। চল্ তোরে লইয়া বাজারটা একবার ঘুইরা দেখি।'(পৃ- ১৪৬)

- তোকে- তোরে,
- ঘুরিয়ে- ঘুইরা।

'গাঁওয়ের নাপিতে চুল ছাঁটেনা, যেমন কচু কাটে। আর হাটের নাপিতে চুল কাটে না, যেমন রান্দা দিয়া পালিশ করে। নাওয়ে গিয়া থাইক্য, চুল কাটাইতে গেলাম।' (পৃ- ১৪৮)

- নৌকায়- নাওয়ে,
- থেকো- থাইক্য।

'হেই পুলা তুই আমার নাওয়ে যাইবি? আমি খালে-বিলে জাল লইয়া ঘুরি, মাছ ধরি বেচি, নাওয়ে রান্ধি নাওয়ে খাই। সাত দিনে একদিন বাড়িত্ যাই। যাইবি তুই আমার নাওয়ে?' (পৃ- ১৪৮)

- ছেলে- পুলা (পোলা)
- রাঁধি- রান্ধি,
- বাড়ি- বাড়িত্

'আরে না না। অখনই তোরে নেমু না। তোর বাড়ির মানুষের না জিগাইয়া নিলে, তারা মারামারি করতে পারে।' (পৃ- ১৪৯)

- এখনই- অখনই,

- নেব- নেমু,
- জিজ্ঞেস করে- জিগাইয়া।

'শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সবচনীর পুজা করুম।' (পৃ- ১৫০)

- এটা- ইটা,
- করব- করুম।

'অখন আর কিছু করলাম না। দিমু খেদাইয়া একদিন চেলাকাঠ পিঠে মাইরা। (পৃ- ১৫০)

- এখন- অখন,
- দেব- দিমু,
- তাড়িয়ে- খেদাইয়া।

'তাহইলে তোর মা কাউয়া হইয়া আইয়ে?' (পৃ- ১৫১)

- কাক- কাউয়া,
- এসেছে- আইয়ে।

'ভাত বাড়নের কত দেরি! কড়া ডিগা মানুষ। ভুখে মরতাছে!' (পৃ- ১৫২)

- ক্ষিদে- ভুখে,
- মরছে- মরতাছে

'মাসীর মা খেঁকাইয়া উঠিল, নিষ্কর্মা গোঁসাই, একটা গোঁসায়, একটা কলার খোল কাইট্যা আনতে পারলে না।' (পৃ- ১৫২)

- কেটে- কাইট্যা (অপিনিহিতি

'সেই নারী প্রতিবাদ করিল; 'চিরদিন গালি দিওনা, আইজের দিনখানা সইয়া থাক। দাও দেও। আমি খোল কাইট্যা আনি।' (পৃ- ১৫৩)

- আজকের- আইজের,

- সহ্য করা- সইয়া।

'লম্বা একটা খোলে ভাতব্যঞ্জন সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল, রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আরত কোনদিন খাইতে আইব না।' (পৃ- ১৫৩)

- খাওয়া- খাওন,
- আসব- আইব।

'তোমার সাথে ত কতভাব আছিল দিদি তুমি যাইও না। আমি যাই তারে লইয়া।' (পৃ- ১৫৩)

- ছিল- আছিল (আ- স্বরবর্ণের আগমণ ঘটেছে),
- যেও না- যাইও না,
- নিয়ে- লইয়া।

'না-জল-না শুকনো, এমুন জায়গাত্ রাইখ্যা পাছ্ ফিরা আইয়া পড় আর পিছনের দিকে চাইস্ না।' (পৃ- ১৫৩)

- এমন- এমুন,
- জায়গা- জায়গাত্,
- রেখে- রাইখ্যা,
- পেছন- পাছ্,
- তাকাস না- চাইস্ না।

'ছেরাদ্দ শান্তি হইয়া গেছে। অখন কানে ধইরা তুইল্যা দিমু ছাইড়া- আপদ যাইব।' (পৃ- ১৫৩)

- শ্রাদ্ধ- ছেরাদ্দ (সমীভবন),
- দেব- দিমু।

'এই তার চান্দা, বৈচা, তিত্পুঁটি। জব্বর মাছ উজাইছে, আইজকার ঢালে। অনন্ত ও তাদের সঙ্গে মাছ ধরার খেলায় মাতিয়া গেল।' (পৃ- ১৫৭)

- ধরেছে- উজাইছে,

- আজকের- আইজকার।

'আপদ গেছে ভাল হইছে। কার দায় কে সামলাইবে গো দিদি? আমার পেটের না পিটের না, আমার কেনে অত ঝকমারি। মা খালি ঘরে পইড়া মরছে। কেউ নেয় না দেইখ্যা আনি গিয়া আনছিলাম। অখন শ্রাদধ চুইক্যা গেছে, অখন যেখানে খুশি গিয়া মরুক। আমার দায় ফইরাদ নাই।' (পৃ- ১৬১)

- মিটে যাওয়া- চুইক্যা (চুকিয়া- চুইক্যা- চুকে) (অপিনিহিতি)
- ফরিয়াদ- ফইরাদ।

'এদ্দিন পাল্‌লি লাললি খাওয়াইলি ধোয়াইলি, আইজ পরে লইয়া জায়, কোনদিন দেখবি কি দেখবি না শেষ দেখা একবার দেইখ্যা দে।' (পৃ- ১৬২)

- এতদিন- এদ্দিন,
- পালন করা- পাল্‌লি,
- লালন করা- লাললি,
- খাওয়ানো- খাওয়াইলি,
- ধোয়ালি- ধোয়াইলি।

'সু-ফুল ছিট্যা রইছে একথার মানতি আসমানের তারা। আসমানের ছিট্যা রইছে। তুলবার লোক নাই।' (পৃ- ১৬৯)

- সুন্দর ফুল- সু-ফুল,
- আকাশ- আসমান,
- ছিটিয়ে রয়েছে- ছিট্যা রইছে

'দিশা কইরা পা বাড়াইবি অনন্ত, না হইলে পইড়া যাইবি! যে পিছ্‌লা।' (পৃ- ১৭২)

- বাড়াবি- বাড়াইবি,
- পড়ে- পইড়া,
- পিছলে- পিছ্‌লা।

‘আমার আর কি আছিল। নিশা আছিল আমার বড় ভইন নয়নতারার। ছোট ভইন আসমান তারা ও কম আছিল না। এই খেলার লগি মায়ে বাবায় কত গাল দিছে। পারার লোক কত সাত কথা পাঁচ কথা শুনাইয়াছে। তিন ভাইন একসাথে খেলাইছি, বেড়াইছি, কাউরে গেরাহ্য করছি না। তারপর তিন দেশে তিন ভইনের বিয়া হইয়া গেল।’ সেই অবধি আর দেখা নাই বুঝি?’

- বোন- ভইন,
- ছিল- আছিল,
- জন্য- লগি,
- গ্রাহ্য- গেরাহ্য।

‘তিতাসের আজ-কাইল মাছ কেমুন পাওয়া যায়।’ (পৃ- ১৭৪)

- কেমন- কেমুন,
- কাল- কাইল।

‘ঘরের বৌয়ানি ঘরে থাকি, আমি কি জানি মাছের খবর!
আমারে কেনে, পুরুষের যদি পাও জিগাইও।’ (পৃ- ১৭৪)

- বৌ এনে- বৌয়ানি,
- আমাকে- আমারে।

‘শিতলীয়া কথা কইও না সাধু, হাতের কাঁকন হাতে থাকে, গলার হার গলায় তাকে। আস সেই মানষ তিতাসে মাছ ধরতে চইল্যা যায়, বাড়ি আইলে যদি কই অনেক দিন দাদারে দেখি না, চলনগো, একদিন গিয়া দেইখ্যা আই, কয়, দাদারে নিয়াই সংসার কর গিয়া। তোমারে আমি চাই না কইতে পারছ।’ (পৃ- ১৭৪)

- এলে- আইলে,
- আসি- আই,
- বলা- কই,
- বলতে পারছ- কইতে পারছ।

‘এ আমার পথের পাওয়া! মা বাপ নাই সুবলার বউ বাঁড়ি মানুষ করত। পারে নি গো বুঝি পরের মর্ম, একদিন খেদাইয়া দিল বড় মায়া লাগল আমার লইয়া আইলাম, যদি কোনোদিন কামে লাগে।’

(পৃ- ১৭৫)

- খেদিয়ে- খেদাইয়া,
- এলাম- আইলাম।

‘নিশুতি রাতে আপনা থেকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিন বোন তখনও অক্লান্তভাবে হেঁয়ালী বলিতেছে আর হাত চালাইতেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মুদিয়া অনন্ত তখনও কানে শুনিতেছে ‘আদা চাক্‌চাক দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথাজন্ম।’ (পৃ- ১৭৬)

- ভেঙে- ভাঙ্গিয়া,
- শুনছে- শুনিতেছে,
- ভাঙলে- ভাঙ্গাইলে।

‘আমি দানন জানি না, ধ্যান জানি না, সাধন জানি না, ভজন জানি না- কেবল তোমারে জানি। ধরা যখন দিচ্ছ আর ছাড়ুম না তোমায়।’ (পৃ- ১৭৮)

- দিয়েছ- দিচ্ছ,
- ছাড়বো না- ছাড়ুম না।

‘জীবনের একটারও গু-মুত কাচাইলি না। তোর মন কাঁচা শরীর কাঁচা, তাই মনে হয় বড় হইলি না; যদি পুলাপান হইত, বয়সও মালুম হইত।’ (পৃ- ১৮৫)

- কাচলি- কাচাইলি,
- হলি- হইলি,
- পোলাপান- পুলাপান

‘তখন আমারেও লইয়া যাইও। কেমুন? ’

আমার ত নাও নাই। আচ্চা বনমালীরে কইয় রাখুম। তার নাওয়ে যাইতে পারবা।’ (পৃ- ১৮৮)

- আমাকেও- আমারেও,

- নিয়ে- লইয়া,
- যেও- যাইও,
- কেমন- কেমুন,
- আচ্ছা- আচ্চা,
- বোলো- কইয়,
- রাখব- রাখুম।

'সে এক পরস্তাবের কথা। কইতে গেলে তিনদিন লাগবে!
তোমার গাঁওয়ে আমারে লইয়া যাইবা? সেও নাওখানা দেখাইবা!
আচ্ছা নিয়া যামু।' (পৃ- ১৮৯)

- প্রস্তাব- পরস্তাব,
- নিয়ে যাবা- লইয়া যাইবা,
- দেখাবা- দেখাইবা,
- যাবো- যামু।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত': দেবেশ রায়

'দে-খ্ দেখ্, ভাইমন অউর বহিমন, দেখো হাম খাড়া উঠলেক হো-খা-আ-আ-ড়া।' (পৃ- ৩০)
ভাইগন- ভাইমন,

- আর- অউর,
- বোনগন- বহিমন,

'কুন কহ্থে মায় মাত্গোলক? কাভি মাতোয়ালা হনে নাহি শেকথে। এই দেখ। পাক্কা দেখ। হামারাই মাথাঠে খাড়া হায়। তব্ভি হাম মাতোয়াল? কাভি নেহি? এই দেখ্ হাম্ পারিড্ করেগা।' (পৃ- ৩১)

- মেতেগেল- মাত্গোলক,
- মাতাল- মাতোয়ালা,

- আমরাই- হামারাই,
- মাথায়- মাথাঠে,
- হয়- হায়,
- করব- করেগা।

'দেখ হাম পারেড ভি করলেক, আভি হামকো অউর এক গ্লাশ দে। হামতো মাতোয়াল নাহি হোলক্ ...' (পৃ- ৩১)

- করব- করলেক,
- হল- হোলক্।

'নারায়ণ প্রসাদ বছর তিন আগে এইখানে একখান চা-বাগান কিনি নিসে। থ বাগান মাস ছয় পর হয়্যা গেইল বন্ধ। নারায়ণপ্রসাদ তর বাগান মাস ছয় পর হয়্যা গেইল বন্ধ। নারায়ণপ্রসাদ তর বাগানের গোডাউনটাক বানাইল শুকনো লঙ্কার গোড়াউন। ব্যাস সেই থেকে আসাম আর তমান-তামন জায়গায় সব পাইকারি কোকেনা হবার ধরিছে এই ক্রান্তি হাটত। স্যালায় ত ক্রান্তি হাটার ক্রানং নামডাক।'

(পৃ- ৩০)

- নিয়েছে- নিসে,
- হয়ে গেল- হয়্যা গেইল,
- গোডাউন টাকে- গোডাউনটাক,
- বান্যাল- বানাইল,
- ধরেছে- ধরিছে,
- সেখানে- স্যাল্যায়,
- এমন- ক্রানং।

'সে ত বছর খানেক আগে খুলি গেইছে। ত ফ্যাকটরি ত আর চলে না। গ্রিনটি বেচা হয়্যা যায়। গোডাউনটা শুকনো লকারই আছে।' (পৃ- ৩৩)

- খুলে- খুলি,
- গেয়েছে- গেইছে,

- হয়ে- হয়্যা।

'সে ত এই বছরই একখানা ঠান্ডা ঘর চালু হবা ধরিছে ওদলাকড়িত্ সে ও ঠিক বলিবার পারিম না। এইঠেও বুঝি একটা গুদাম থাকিবার পারে।' (পৃ- ৩৩)

- হওয়ার- হবা,
- ধরেছে- ধরিছে,
- পারব না- পারিম না,
- এখানেও- এইঠেও,
- থাকবার- থাকিবার।

'হুজুর মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ।' (পৃ- ৩৮)

- আমি- মুই,
- এসে গেছি- আসি গেছু।

'হুজুর মুই ফরেস্টারচন্দ্র আসি গেইছু।' (পৃ- ৩৮)

- গেছি- গেইছু।

'হুজুর। দেখি নিছেন ত মোক? ভাল করি দেখি নিছেন ত? মোর নামখান ফোমে রাখিবেন হজুর ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন বাপাখানের নাম হইল...। কিন্তু বাপখানের কথা ছাড়ি দাও। বাপার বাদে অনেক কথা। মোর নিজের কথাটা আগত শুনাবু তোমাক।' (পৃ- ৩৯)

- নিয়েছেন- নিছেন,
- আমার- মোক,
- ফর্মে- ফোমে,
- আগে- আগত,
- শোনাব- শুনাবু,
- তোমাকে- তোমাক।

‘অবশেষে সেই নীরবতা ভেতর থেকে ফরেস্টার শুরু করে শুন হে হুর কথা মোর একখান। না হে, একখানা না হয়, দুইখান। কাথা মোর দুইখান। কী দুইখান কথা? একখান কথা হইল যে তোমারা ত জমির হাকিম । ত মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর জমিঠে মোর নামখানা তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল। আপলচাঁদ ফরেস্টের গা-লেগো, মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বদল বিছন সগায় ওর মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর।’ (পৃ- ৩৯)

- দুখানা-দুইখান,
- কেটে- কাটি,
- ছিল- আছিল,
- গা-লেগে- গা-লেগো,
- ছিল- আছিল।

‘গয়ানাথ সব শিখিবার চাছে। কহে, হে ফরেস্টর, মোক হালুয়াগিরি খান শিখি দে। বাপপিতামহর কামটা মুই ভলি গেছু। মোক শিখি দে। ত মুই নিচয় শিখিদিম। হুজুর, কালি আমি গয়ানাথক সব শিখাই দিম, ক্যানং করি হাল দিবার নাগে, মই দিবার নাগে, পাতা গুছিবার নাগে, ছাই ছড়ি দিবার নাগে কোদা করিবার নাগে, বোয়া গড়িবার নগে- সব শিখাই দিম- কালি সকালে, ব্যাস, কালি সকালঠে গয়ানাথই জোতদার, গয়ানাথই হালুয়া। মুই এ্যালায় যাচ। গয়ানাথের বাড়িত। উমাবক হালুয়াগিরি শিখাবার তানে।’ (পৃ- ৩৯)

- চেয়েছে- চাছে,
- বলে- কহে,
- আমার- মোক,
- ভুলে গেছি- ভলি গেছু,
- নিশ্চয়- নিচয়,
- শিখিয়ে দিতাম- শিখিদিম,
- শিখিয়ে দেব- শিখাই দিম,
- কেমন করি- ক্যানং করি,
- লাগে- নাগে,
- গুছাবার লাগে- গুছিবার নাগে,
- খোদা- কোদা,
- শিখিয়ে- শিখাই,
- দেব- দিম,

- সকালে- সকালঠে,
- এখন যাচ্ছে- এ্যালায় যাছ,
- বাড়ি- বাড়িত,
- তারা থেকে- উমারক।

'মোরত দুইখান কথা আছে। একখান কথা মুই ফরেস্টরচন্দ্র এ্যালায় গয়ানাথ জোতদারক খালাশ দিছু। মনত রাখিবেন হুজুর ফরেস্টরচন্দ্র বাঘারুবর্মন। এইঠেত অনেক ফরেস্টার অনেক বর্মন। কার্য সাচা আর কায় মিছা? হুজুর। দেখিনেন যেইলা ফরেস্টারচন্দ্রের বাঁ পাছাত আর ডাহিন পিঠত বাঘের দুইখানা থাবার দাগ আছে ঐলা ফরেস্টচন্দ্র আসল। ত দেখাও। সগায় পাছার কাপড় তুলি দেখাও ...' (পৃ- ৩৯)

- দিয়েছি- দিছু,
- মনে- মনত,
- এখানেত- এইঠেত,
- কী- কায়,
- সত্যি- সাচা,
- মিথ্যে- মিছা,
- যখন- যেইলা,
- ডান- ডাহিন,
- পিঠ- পিঠত,
- ওই- ঐলা।

'ত মুই যাছ হুজুর, বাঘারু কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, হুজুর একখান সিগারেট খায়্যা যাছু।'

- যাচ্ছি- যাছ, (পৃ- ৪০)
- খেয়ে- খায়্যা,
- যাচ্ছি- যাছু।

'সাহেব ভাবিছেন মুই মাতাল খাছি। দেখো কেনে; কেনং ফস করি ডবালাম কাঠিখান।' (পৃ- ৪০)

- খেয়েছি- খাছি,

- কেমন- কেনং।

'আসিন্দির বলে, হে বাঘারু, তোর বুড়োর কি মাথাটা খারাপ হয়া গেইল রে? এ্যালায় হাল ড্রাইড করিবার চাহে।'

- হয়ে- হয়া, (পৃ- ৪৩)
- গেল- গেইল,
- এখন- এ্যালায়,
- টাইট- ড্রাইড,
- চায়- চাহে।

'আসিন্দির বলে- তোমরালার কাম কি ঐ মাঠে যাওয়ার? ছাড়ি দেন। উকিলবাবুকে পাঠি দেন। ঐঠে আমিল আছে, যা করিবার উমরায় করিবেন তোমরালা এ্যালায় হাল ঠেলিবার ধরিছেন।' (পৃ- ৪৩)

- তোমরা- তোমরালা,
- ওখানে- ঐঠে,
- আমরায়- উমরায়,
- তোমরা- তোমরালা,
- এখন- এ্যালায়।

'ত তুমি চলি আইস কেনে মুই পেরাকটিস দিছু। হাকিম কহিলে, মুই বুড়া হছি এ্যালায় মোর জোয়াইখান হাল দিছে, আসিন্দির দাঁড়ায়।' (পৃ- ৪৩)

- এস- আইস,
- প্যাকটিস- পেরাকটিস,
- হয়েছে- হছি,
- এখন- এ্যালায়,
- জোয়ানখানা- জোয়াইখান,
- দিচ্ছে- দিছে।

'আসিন্দির চিৎকার করে ওঠে, হে বাপ মোক ছাড়ি দাও, মুই চাষ দিছু।' (পৃ- ৪৪)

- আমার- মোক,

- ছেড়ে- ছাড়ি,
- দিচ্ছি- দিছু।

'আসিন্দির চিৎকার করে ওঠে, হেই বাপ, তোমাক তয় মুই ফেলি দিম। ছাড়ি দাও। মুই যাছু মোক দেও।'

- তোমার- তোমাক, (পৃ- ৪৪)
- দেব- দিম,
- যাচ্ছি- যাছু,
- আমাকে- মোক,
- দাও- দেও।

'চা ঠান্ডি হবা ধরিছে, খায়্যা নেন। শুনে গয়ানাথের মেয়েও ঘর থেকে বাইরে আসে, বাবা, তোমাক কায় কহিসে হাল চালাবার।' (পৃ- ৪৫)

- হওয়া ধরেছে- হবা ধরিছে,
- খেয়ে নেন- খায়্যা,
- তোমার- তোমাক,
- বলছে- কহিসে।

'আসিন্দির জোড়হাতে চিৎকার করে 'হে বাপা, মোক ক্ষেমা দাও কেনে; মোক ক্ষেমা দাও কেনে বাপা।'

- ক্ষমা- ক্ষেমা। (পৃ- ৪৫)

'গয়ানাথ পেছন থেকে বনমোরগের চিৎকার করে ওঠে 'শালো, মুই হাল দিছু, আর তুই বেটার-ঘর ভটভাইছিস, শালো।' (পৃ- ৪৫)

- আমি- মুই,
- দিয়েছি- দিছু।

'শালো ছাগির বেটা, যা কেনে তুই হাল ধর মুই না যাও জরিপের পাখে, তোকই হাল দিবার নাগিবে।' (পৃ- ৪৫)

- তোর- তোকই,
- দেওয়ার- দিবার।

‘গয়ানা থেকে বলে হে বাপা, তোমার সার্ভে পার্টিত যাছে হে সার্ভের জায়গাত্। (পৃ- ৪৬)

- জায়গা- জায়গাত্ (আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ)

‘গয়ানাথ চেঁচায় ‘হে জোয়াই, ভটভটিখান বাহির কর, লেট হয়্যা যাছে, মোক ছাড়ি দিয়া আয়।’ (পৃ- ৪৭)

- হয়ে- হয়্যা,
- যাচ্ছে- যাছে,
- ছেড়ে- ছাড়ি,
- দিয়ে- দিয়া।

‘আপনার সুবিধার জন্য স্যার এইটুকু সুযোগ আমাদের দিবা নাগিবেই।’ (পৃ- ৫২)

- দেওয়া- দিবা,
- লাগিবেই- নাগিবেই।

‘হে-এ বাঘারু মুখত ধরি নামা কেনে, মুখত ধরি নামা।’ (পৃ- ৫৩)

- মুখ- মুখত,
- ধরে- ধরি।

‘না সে ত বদল হয়ই, নদীত আর মানষির দালানবাড়িনা-হয়, যে, একেবারে পাকা থাকিবে, নড়চড় না হবে। বদল ত হয়ই-হওয়া নাগে।’ (পৃ- ৫৪)

- মানুষের- মানষির,
- লাগে- নাগে।

‘গয়ানাথ বলে ‘কিন্তুক আবার নদীর ত একটা পাকাপাকি আছে। অ যতই ভাঙুক আর সরুক স্যার শ্যাষম্যাস একটা ঠিকই হয়।’ (পৃ- ৫৫)

- কিন্তু- কিন্তুক,
- শেষমেস- শ্যাষম্যাস।

‘গয়ানাথ বলে ‘ধীরেন এই আটষট্টির বানাটাই ধরেন। তিস্তাত, ধরেন এইখান থিকা সোজা বায়ে ঢুকে, ধরেন তিস্তা আর ধবলার মাঝখানে যে বিশাল তেকেনিয়া জায়গাখান, ঐটাকে ভাঙ্গি ভাসি চলি গলে। আমরা ভাবিলাম, এই হইল, এখন থিকা ধরলাম খাতখান তিস্তার খাত হয়্যা যাবে। কিন্তুক তিস্তাত আবার তার পুরানো খাতেই ফিরি গেল। এখনো যাছে।’ (পৃ- ৫৫)

- থেকে- থিকা,
- বাঁ দিকে- বাঁয়ে,
- ভেঙে- ভাঙ্গি,
- ভেসে- ভাসি,
- থেকে- থিকা,
- যাচ্ছে- যাছে।

‘না, না, তা লিখিবার কাম কী আছে স্যার, কিছুই লিখিবেন না, য্যানং আছে, থাকুক কেনে।’

- যেমন- য্যানং।

‘আগে ফরেস্ট ছিল, এ্যালায় চাষ হওয়া ধরিছে সেটা ত আপনারা চাষজমি ধরিবেন।’ (পৃ- ৫৭)

- এখন- এ্যালায়,
- ধরেছে- ধরিছে,
- সেটা- সেটা ত।

‘আমাকে একটু টাইম দেন স্যার। মোক ঐঠে যাবানাগিবে। তারপর প্রমাণ দিম। নিশ্চিত দিম।

হ্যাঁ আপনি যান তাড়াতাড়ি আসেবেন্।

হ্যাঁ স্যার, যাম আর আসিম। যাম আর আসিম।’ (পৃ- ৫৯)

- আমার- মোক,
- দেব- দিম,
- যাব- যাম,
- আসব- আসিম।

‘এই জংলিগিলান এই জঙ্গলের ভিতরত্ চলি আসছে।’ (পৃ- ৬৩)

- জংলিগুলো- জংলিগিলান,
- ভেতরে- ভিতরত্,
- এসেছে- আসছে।

‘গয়ানাথ বলে, যা কেনে, ঝট করিয়া, মৌজার লাইনকানা ধরে যাবি, বুঝিলু।’ (পৃ- ৬৩)

- বুঝলি- বুঝিলু।

‘হ্যাঁ স্যার, যেইঠে এ্যালায় ভাসি যাছে ঐঠে ত মোর এই মৌজাখান শুরু।’ (পৃ- ৬৭)

- যেখানে- যেইঠে,
- এখন- এ্যালায়,
- ভেসে যাচ্ছে- ভাসি যাছে,
- ওখানে- ঐঠে।

‘ও ত এ্যালায় উঠি আসিবে। কিন্তু তার টাইম ত দিবা নাগিবে। ওরা কী আর স্রোত কাটাইয়া আসিবার পারিবে? স্রোত ধরি-ধরি আসিবার নাগিবে।’ (পৃ- ৬৪)

- উঠে- উঠি,
- লাগবে- নাগিবে।

‘না হে কাঠ ভাসি যাছে, কাঠখান ভাসি গেলাক আর তঁয় কইয়ে ভাসি আইলক? মদেশিয়া গলায় নিরুত্তেজ রসিকতা, নদীর পানি মাইত্ গেলে হে?’ (পৃ- ৬৫)

- যাচ্ছে- যাছে,
- গেল- গেলাক,
- তুই- তঁয়,
- কোথা থেকে- কইয়ে,
- এল- আইলক,
- মেতে- মাইত্

'দেখিলেন ত স্যার, এ্যানং বিশালিয়া নদী, আর এইঠে ক্যানং হাঁটুজল না বুকজল। এইঠে বৃষ্টির জল আসি বসিবার ধইচছে- এইটা নদী না।' (পৃ- ৬৭)

- এখানে- এইঠে,
- কেন- ক্যানং,
- ধরেছে- ধইচছে।

'কোটত মাথা আর কোটত ল্যাজ।' (পৃ- ৬৭)

- কোথায়- কোটত,

'সাগায় কুখ্যাত আর এক রাধাবল্লভ সাহা সাচা-স্যার, এই ডাকাতিয়া মানষিটার কথা না শুনিবেন, গয়ানাথ বলে।'

- মানুষটার- মানষিটার, (পৃ- ৬৮)
- ডাকাত- ডাকাতিয়া।

'হৃষীকেশ ঠাট্টা করে বলল, ভগতের কোটটা মুই পড়ি যাছ, উকিলের নাথান লাগিবে।' (পৃ- ৭০)

- যাচ্ছি- যাছ
  নাথান

'সে জোতদার-টোতদার নিয়্যা যা কওয়ার কও। চর নিয্যা কিছু কওয়া চইলবে না। চরে জোতদার ও নাই, আধিয়ারও নাই, সেটেলমেন্ট ও নাই, পাট্টাও নাই।' (পৃ- ৭২)

- নিয়ে- নিয়্যা,
- বলার বলো- কওয়ার কও,

'শালা কার কথা কী কথা কিছু শুনবেক নাহ, চিল্লাখে ত চিল্লাখে।' (পৃ- ৭৩)

- চেঁচানো- চিল্লাখে।

'হৃষীকেশ হঠাৎ মুখতুলে সবাইকে জিজ্ঞাস করে, কহেন আপনারা এইঠে কি চাটিবার ধইচছি আমি? এইঠে এক চাট, আবার ঐঠে এক চাট, কহেন আপনারা।' (পৃ- ৭৪)

- বলেন- কহেন,

- চাটবার- চাটিবার,
- ধরছি- ধইচছি।

'জরুর। হামনিমন বলেগা সব পাট্টা দোও, উসকো বাদ কোম্পানিকো দোও।' (পৃ- ৭৯)

- দাও- দোও।

'বুদ্ধিমান না তাকিয়ে বলে, আর ভগত বসি যাও কেনে, দেখেন না শালা রিশিকেশ ক্যানং পালা বন্ধিছে, চরুয়ার।' (পৃ- ৮০)

- কেমন- কেনং,
- বেঁধেছে- বান্ধিছে।

'কমরেড তোঁহাক জমিত যাবার কইসে।

কেন? কুনোগোলমাল বাধি গেইল

না জানি। বাহির চল।' (পৃ- ৮০)

- তোমার- তোঁহাক,
- জমি- জমিত,
- বলছে- কইসে,
- বেধে গেল- বাধি গেইল।

'শালো চেইন ফেলাচ্ছে- জমি মাপিবার ধইচছে?' (পৃ- ৮১)

- ফেলেছে- ফেলাচ্ছে,
- ধরেছে- ধইচছে।

'আরে, এই কী হইছে? ভিড়টার ভেতর থেকে একজন চেঁচাইয়া জবাব দেয়, জানি না কী হবার ধরিছে- সগায় ত ঐঠে হাকিম আমিন সগায়, শুনিবার পাছ তোমরালার সমিতির তানে বাগানের মদেশিয়াগিলার মারামারি হবার ধরিছে। (পৃ- ৮৫)

- হওয়ার- হবার,
- ধরেছে- ধরিছে,

- পিছন- পাছ,
- তোমাদের- তোমরালার।

'বুদ্ধিমান ও হৃষীকেশ লাটিদুটোকে মাথার ওপর তুলে শা-লা, মাথা ফাটি দিম, শা-লা ...' (পৃ- ৮৬)

- ফাটিয়ে দেব- ফাটি দিম।

'শালা বলদ, চেয়ারের ওপর মানষি বসিবে, না মানষির উপর চেয়ার ফেলছিস?' (পৃ- ৯১)

- মানুষ- মানষি,
- ফেলেছিস- ফেলছিস।

'জরুর। লেকিন ঐ বিশিকো মাথা গরমাগরম। উ কাঁহাসে লাঠি লেকে জিন্দাবাদ দেকে, আরে বাবা; বলে ফাগু হেসে নিতে কথা থামায়।' (পৃ- ৯১)

- কোথা থেকে- কাঁহাসে (হিন্দি ভাষা)

'বীরেনবাবুকে বলে হাঁ। কমরেডকো পৌঁছ দোও, ফুলবাড়ি বস্তি।' (পৃ- ৯২)

- দাও- দোও।

'যত টাইম যাছে, মোর নামখান সলসল বড় হইয়্যা যাছে। এ্যালায় এ্যতখান বাড়ি গেইছে যে ঐ নামখানে মুই আর আঁটো না। ঢল ঢলাছে।' (পৃ- ৯৪)

- হয়ে- হইয়্যা,
- এখানে- এ্যালায়,
- এত খানা- এ্যতখান।

'কাছি এমেলিয়া বাবু। কিন্তু তোমাক মোর নামটা ছোট করি দিবার নাগিবে। য্যানং সগার নাম ছোট হবার ধরে। মোর নামখানও ছোট হওয়া নাগিবে।' (পৃ- ৯৪)

- তোমার- তোমাক,
- যেন- য্যানং,
- লাগবে- নাগিবে।

'সগারই ত ছোট হয় বাবু, মোরখানই এক বাড়ি যাছে। ধরো কেনে, মোর দেউনিয়া গয়ানাথ রায়বর্মণখান হয্যা গিছে গয়া জোতদার।' (পৃ- ৯৪)

- আমার একটা- মোরখানই,
- যাচ্ছে- যাছে,
- গিয়েছে- গিছে।

'মোর মাও-এরঠে একখান ছোট কুড়ালিয়া আছিল। এই ধরো কেনে, ডাল কাটিবার তানে সারাদিন কাটাকুটি চলিত। ধারও আছিল চকচকা। ঐ ছোট কুড়ালিয়াখান দিয়া মাও নিজের নাড়ীখান কাটি দিল। ব্যাস কাটি দিল।' (পৃ- ৯৫)

- এখানে- এরঠে,
- একখানা- একখান,
- কুড়ুল- কুড়ালিয়াখান,
- ছিল- আছিল।

'ত এ্যানং একেদিন, আপলচাঁদের ফরেস্টের ভিতরঠে দুপহরের টাইমত মুই আসিবার ধরিছু। মনত না আসে কোটত আসিছু, কোটত যাছু। কিন্তুক কোটত-না-কোটত তা যাছুই।' (পৃ- ৯৬)

- টাইম- টাইমত,
- আমি- মুই,
- আসবার- আসিবার,
- ধরেছে- ধরিছু,
- কোথায়- কোটত,
- এসেছি- আসিছু,
- গেছে- যাছু,
- কিন্তু- কিন্তুক।

'স্যালায় মুই বুঝি গেইলু, আরে আরে বাঘাখান মোক ছাড়ি দিছে, ব্যাস, সেই বুঝিনু- সড়াত করি লাফ দিয়া সামনের গাছটাত চড়ি গেইল।' (পৃ- ৯৭)

- গেল- গেইলু,

- দিচ্ছে- দিছে,
- গাছটা- গাছটাত।

'মুইনাপার এ্যানং করিপার হবার।

মোক করি পার হম? সাঁতরিবার পারি। সাঁতরিম? জামা কাপড় খুলি-

না- হয়, না-হয়। ভিজা গাওত আবার জামা কাপড় পরিবেন

কেমন? গা শুখাবার টাইম নাগিবে মোর পিঠত ঝুলো।

নাও ঝুলো কেনে।' (পৃ- ৯৮)

- এমন- এ্যানং,
- হওয়ার- হবার,
- আমার- মোক,
- লাগবে- নাগিবে,
- পিঠ- পিঠত।

'হে-ই নকুইল্যা তুই ক কেনে।' (পৃ- ১১৩)

- নকুল- নকুইল্যা,
- বল- ক।

'মণিবাবু, আমি তাড়াতাড়ি কয়্যা দিচ্ছি। আচ্ছা ছাড়ান দ্যান সেই গল্প।' (পৃ- ১১৪)

- বলে- কয়্যা,
- দিয়েছি- দিচ্ছি,
- ছেড়ে- ছাড়ান,
- দাও- দ্যান।

'ছাড়ি দ্যান, মুই কহিছু, জব্বর দাঁড়ায়।' (পৃ- ১১৫)

- ছেড়ে- ছাড়ি,
- দিন- দ্যান,
- বলেছি- কহিছু।

‘হয়। কনট্রাকটার বুজালেও ত আমাগো দিয়্যাই কইরত। এইডা আমরাই কইরব। বিনা পয়সায়।’ (পৃ- ১১৮)

- আমাদের- আমাগো,
- করবো- কইরব।

‘হেই দেখিস কেনে, ফেলিস না গাওত।’ (পৃ- ১২১)

- গায়ে- গাওত।

‘বাঘারু জবাব দেয়- কহ নাই? যেইলা উমারক ফুলবাড়িতে নিয়া গিছিস, কী কহিছিস?
মোর নামখান কহিছু।
খুব নাম চিনবার ধইচছিস্, না?
মোর জন্মকথন কহিছু।’ (পৃ- ১২৩)

- নিয়ে- নিয়া,
- গিয়েছিস- গিছিস,
- বলেছি- কহিছু,
- চিনিবার- চিনবার,
- ধরেছিস- ধইচছিস্।

‘এম-এল-এ হামাক কহিল, উমরাক একখান অধিয়ার দ্যান কেনে। শালো, জমিন মোর,
না তোর এম এল অর? মুই কহ নাই।
কহিছিস কি কাইল, তুই কহিছিল এ্যালায়। তুই কালি সূর্য উঠিবার আগত এই তিস্তাপার
ছাড়ি চলি যাবি।
নহ-ই নাগরাকাটাত ডায়না নদীর চরত মহিষের কথান আছে ঐঠে থাকিবু। বুঝল? আর কান্দুরা ঐঠে আছে। পাঠাই দিবি বুঝলু?’ (পৃ- ১২৫)

- আমার- হামাক,
- দিন- দ্যান,

- বলেছিস- কহিছিস,
- এখন- এ্যালায়,
- থাকব- থাকিবু,
- পাঠিয়ে- পাঠাই,
- বুঝলি- বুঝলু।

'উচা উচা গাছের মাথত আগুন লাগি গেইসে।' (পৃ- ১২৭)

- উঁচু উঁচু- উচা উচা,
- মাথা- মাথত,
- লেগে- লাগি,
- গিয়েছে- গেইসে।

'পাতাগিলা ঝলঝল করিবার ধইচছে য্যান বিষ্টি হবা ধরিছে।' (পৃ- ১২৭)

- পাতাগুলো- পাতাগিলা,
- যেন- য্যান,
- বৃষ্টি- বিষ্টি,
- ধরেছে- ধরিছে,
- হওয়া- হবা।

'সারা শরীলখান কায়অং মাখাছে।' (পৃ- ১২৭)

- শরীর- শরীল,
- রং- অং,
- মেখেছে- মাখাছে।

'মোর কাঁধত গাছ নাই- গয়ানাথের গাছ।' (পৃ- ১২৮)

- কাঁধে- কাঁধত,
- নেই- নাই।

‘ছড়ানিগিলা ঢলি আসিবার ধরে এ্যানং নাম্বা হাঁটেন, কামছাড়া গাওছাড়া এ্যানং নাম্বা হাঁটেন ছড়াগিলা পিপিড়ার মত চলি আসিবার ধরে এক্কারে বান্ধি, একোটার পর একোটা কোটত আসে কোটত যায় কায়জানে।’ (পৃ- ১২৯)

- লম্বা- নাম্বা,
- আসার- আসিবার,
- একটা- একোটা,
- কোথায়- কোটত।

‘মাটিরা নিন্দুরে (মেটে ইঁদুর) নাখান।’ (পৃ- ১৩৮)

- মেটে ইঁদুর- নিন্দুরে

‘হেই এটুস ময়লা ময়লা শাদা ঠান্ডা নাখাল একটা দিক গোল, আরেকখান চুখা। বাঘারু চোখা দিকটা এক হাতে ধরে সোজা করে। মানষির মাথার না খান।’ (পৃ- ১৪০)

- একটু- এটুস,
- চৌক- চুখা,
- মানুষ- মানষি।

‘না হয় তা বাঘারুক দেখি এ্যানাং ভোকিবার ধরিবে কেনে? বাঘারু সাহেব না-হয়, বাঘারু ভটভটিয়া নাই। বাঘারু ত নিজের এই দুইখান পায়ের উপর খাড়া একখান মানষি। কুত্তালা ত চিনিবার পারে। ত স্যানং ভোকিবার ধরলি কেনে।’ (পৃ- ১৪৬)

- ডাকবার- ভোকিবার,
- কুকুর- কুত্তা,
- ধরল- ধরলি।

‘যেন তার জবাবেই কুকুরটা কুঁই কুঁই করে ওঠে- অ্যালায় কুঁই কুঁই করিবার ধইচছিস।’ (পৃ- ১৪৮)

- ধরেছিস- ধইচছিস,
- এখানে- অ্যালায়।

‘পাখোয়াল বুঝিবার ধইচছে। আর দোসর এইঠে আছি, ডাকিবার ধইচছে, কিন্তু আসছে না কেনে?’ (পৃ- ১৬১)

- পাখি- পাখোয়াল,
- ধরেছে- ধইচছে,
- এখানে- এইঠে।

‘ ডাকি উঠিবে? বাঘারু ভাবে পাখি কি তাকেই সঙ্গী ভেবেছে, পাখি বাবে নাকি তার সঙ্গীটা ডাকে অথচ আসে না কেনে?’ (পৃ- ১৬১)

- ডেকে উঠবে- ডাকি উঠিবে।

‘ভোখার পিঠের ওপরে বাঁ পাটা বাঘারু নাড়ায়- শালো, আলসিয়া ভুখিবারও চাহে না- নিদ যাবার চাহে। এ ঘুমা কেনে। শালো নিদুয়া কুত্তো ঘুমা।’ (পৃ- ১৬২)

- ডাকবার- ভুখিবার,
- ঘুম- নিদ,
- যাওয়ার- যাবার,
- চাই- চাহে।

‘ক্যানং নদীখান ডাইনাং? ডুবিবার চাহিলে ডুবিবার পারো না। কিন্তু জল চলিবার ধইচছে দিন আতি, অতি দিন।’ (পৃ- ১৬২)

- কোন- ক্যানং,
- ধরেছে- ধইচছে।

‘আন্ধিয়ার দাওয়াত চরক খেলিবার নখান ছুটি আসিছে ডাইনং ঝোরাখান শাদা, ফটফটা অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মত উদ্ভাসিত শাদা ফেনার একটা চলৎরেখায় ডায়না ছুটে নামছে।’

(পৃ- ১৬২)

- খেলবার- খেলিবার,
- এসেছে- আসিছে।

‘পাখিখান এই স্রোতের ওপর দিয়া ঘরত যায় আর ডাকো দেয়। ডাকিবু? এ্যালায়।’ (পৃ - ১৬৪)

- ঘর- ঘরত,
- ডাকব- ডাকিবু।

‘বাঘারু চেঁচায় খাড়া গে খাড়া যাছি খাড়া।’ (পৃ- ১৬৫)

- দাঁড়া- খাড়া,
- যাচ্ছি- যাছি।

‘খাড়া কেনে খাড়া। এ্যালায় ত সকলখান হইল।’ (পৃ- ১৬৬)

- এখানে- এ্যালায়,
- সবটা- সকলখান,
- হল- হইল।

‘বাঘারু না নড়েই হেসে জবাব দেয়, মোর প্যাটরল্খান দ্যান আগত।’ (পৃ- ১৬৮)

- দিন- দ্যান,
- আগের- আগত।

‘শালো, কোটত খুঁজিবে মোর দেউনিয়া, মোক? আর এই বাথনেক?’ (পৃ- ১৭৬)

- কোথায়- কোটত,
- খুঁজবে- খুঁজিবে,
- আমার- মোর, মোক।

‘ও। এইঠে টানি ঐঠে ফেলিবার নাগিবে? ট্রাকত তুলিবার নাগিবে না? মুই আসছু এইঠে খাড়ান, বাঘারু যাবার উদ্যোগ করতেই ফরেস্ট গার্ডটি বলে, তুই থাকি যা না আজিকার রাতটা এইঠে, বাথান নিয়ে কাঠ পাহাড়া দিবু। পাইসা পাবু।’ (পৃ- ১৮০)

- এখানে- এইঠে,

- ট্রাক- ট্রাকত,
- লাগিবে- নাগিবে,
- এসছি-আসছু,
- দাঁড়ান- খাড়ান,
- দেব- দিবু,
- পয়সা- পাইসা।

'না-বাবু। মুই থাকিবার না পারি। সকলত দুধের গাড়ি আসিবে। দুধ দুহি দিবার নাগিবে। মুই মোর মহিষ আনিছু টানি দিম আপনার গাছ। খাড়ন। আনুছু।' (পৃ- ১৮০)

- থাকবার- থাকিবার,
- লাগবে- লাগিবে,
- এনেছি- আনুছু।

'এ্যালায় ত বাথানখান বাথান হওয়া ধরিছে। একটা পোয়াতি মইষগি বাছুর দিবা ধইচছে। এইখান ত একোটা কেনা বাথান। গয়ানাথ কিনিছে। (পৃ- ১৮৪)

- ধরেছে- ধইচছে,
- কিনেছে- কিনিছে।

'আঁ আঁ করে কাঁদি ওঠে। র কেনে। কান্দিবার ধরিস বাদে।' (পৃ- ১৮৬)

- কেঁদে- কাঁদি,
- কাঁদিবার- কান্দিবার।

'জগদীশ খেপে উঠেছে। 'চুখ ভাল কইর‍্যা মেইল্যা দ্যাখ, ব্রিজের উপর গাড়িটারি আছে নাই?'

(পৃ- ১৯৪)

- ভালো- ভাল,

- করে- কইর‍্যা,
- দেখা- দ্যাখ।

'চুপ যা হারামজাদা, জগদীশ চিৎকার করে ওঠে, শুইনব্যার হয়ত গিয়া শুইন্যা আয়।' (পৃ- ১৯৪)

- শোনার- শুইনব্যার,
- গিয়ে- গিয়া।

'নিতাই বলে পার্টি আবার কবেজ কী, অ্যাঁ, পার্টি কবেডা কী? বৃষ্টি হবার ধরছে পন্দর দিন ধইর‍্যা আর সঙ্গে বাতাস পাহাড়ঠে বানা নামিছে।' (পৃ- ১৯৬)

- বলেটা- কবেডা,
- ধরেছে- ধরছে,
- পনেরো- পন্দর,
- ধরে- ধইরা,
- পাহাড়ে- পাহাড়ঠে,
- বান- বানা।

'কয়্যা দিছি, আমাগো চারখান যদি ভাইস্যা যাব্যার দ্যাখেন আমাগো জন্যে মিলিটারি পাঠাইবেন, ক্যাম্প বসাইবেন না, রিলিফ দিবারও নাগবেনা- কয়্যা দিছে।' (পৃ- ১৯৬)

- বলে- কয়্যা,
- দিয়েছি- দিছে,
- আমাদের- আমাগো,
- ভেসে- ভাইস্যা।

'আনিবার দ্যাও, আনিবার দ্যাও বাতাস খারাপ সগায় একসঙ্গে থাকাই মনত লাগে।' (পৃ- ১৯৭)

- দাও- দ্যাও।

'তা হউক গ্যা, তর এগারডাই হইল, তার গঙ্গে ছয় ঘন্টা যোগ দে- কয়ডা হয়? পে এগারডা আর ছয় ঘন্টা।' (পৃ- ২০৫)

- হোক গে- হউক গ্যা,

- এগারোটা- এগারডাই,
- কটা- কয়ডা।

'শুনেন যে হিশাবই করেন, এইখানে ফ্লাড কাইল সকাল চাইড়ডার আগে আইসব না।' (পৃ- ২০৬)

- শোনেন- শুনেন,
- কাল- কাইল,
- চারটে- চাইড়ডা,
- আসবো- আইসব।

'এ্যাহন ত কথা ঝাড়ত্যাছ পুরুতের নাগান, তখন রেডিও শুনইতে গেলেই পারত্যা।' (পৃ- ২০৮)

- ঝাড়ছ- ঝাড়ত্যাছ,
- পারতে- পারত্যা।

'কী হইছে ক না, শালা পালা গাবার ধরছে, নিতাই ধমকে ওঠে।' (পর- ২০৯)

- বল না- ক না।

'শালা হিন্দি সিনেমা দেইখ্যা দেইখ্যা জোকার করা শিখছ, তর কথাডা কওয়ার নাম নাই। এইডা না হয়, এই ডা না হয় হয়।' (পৃ- ২১০)

- কথাটা- কথাডা।

'সাগায় তা জানে হামরালা এইঠে আছি, নৌকা আসতি পারে, গজেন বলে। (পৃ-২১২)

- আমরা- হামরালা,
- ওখানে- এইঠে।

'ক্যানং করি মিলিটারি মানষি বুঝিবার পারে এ্যানং বালুবাড়ি আর ধান্ধিনা পাথারের পাছত একখান চর আছে।' (পৃ- ২১২)

- পিছন- পাছত।

'মিলিটারির নৌকা ত ভটভটি নৌকা, শুইন্যা ঘর থিক্যা আসে যায়।' (পৃ- ১১২)

- থেকে- থিক্যা।

‘তুই চল না, শালো, পাহাড়ের নাগাল কুয়াশা নাড়ি-নাড়ি চইলব্যার লাগছে।’ (পৃ- ২১৩)

- চলবার- চইলব্যার।

‘ত আপনার আর থাকনের কাম কী, ভুলার সাইকেলের পিছনে বইস্যা চইল্যা যান। ভুলারা ঘুইর‍্যা আইসলে আমরাও যাব নে নিতাই বলে।’ (পৃ- ২১৬)

- থেকে- থাকনের,
- বসে- বইস্যা।

‘হে রাবণ কাকা, তুমি এড্ডু বাড়িতে যাওনা, কত আর ঘুইরব্যা?’ (পৃ- ২১৬)

- একটু- এড্ডু,
- ঘুরবা- ঘুইরব্যা।

‘জলপুত্র’ : হরিশংকর জলদাস

‘মা, ঘরত্ যাইতা নো?’ (পৃ- ৭)

- ঘর- ঘরত্,
- যেও না- যাইতা নো।

‘চন্দ্রমণি আইজো নো আইয়ে বউ? শ্বশুরের প্রশ্নে বাস্তবজগতে ফিরে আসে ভুবনেশ্বরী। বলে ‘নো আইয়ে’। (পৃ- ৮)

- আজও- আইজো,
- না- নো,
- এসেছে- আইয়ে।

‘অন্নচরণ বললো, গত পাঁচ বছরত প্রেমদাইশ্যার মত নাউট্যাপোয়া এই গোরামত্ নো আইয়্যে।’ (পৃ- ১১)

- প্রেমের- প্রেমদাইশ্যার,
- নাট্যদলের ছেলে- নাউট্যাপোয়া,
- গ্রাম- গেরামত্,
- এলো- আইয়্যে।

‘পানতাবুড়ি বলে উঠল ‘কী সোন্দর নাচ্‌রে বাপ পোয়া ইবার। নাচ্‌ দেই এই বয়সতও বুকগান কালি খালি লা আর।’ (পৃ- ১১)

- সুন্দর- সোন্দর,
- হয়েছে- ইবার,
- বুকখানা- বুকগান,
- লাগে- লা আর।

‘অপুত, উঠ, নাচ শেষ অই যারগই। তুই নো কঅলি নাচ চাবি? ভুবনেশ্বরী, গঙ্গাপদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে।’ (পৃ- ১১)

- পুত্র- অপুত,
- ওঠ- উঠ,
- হয়ে গেছে- যারগই,
- বললি- কঅলি।

‘সুবলা বলেছে, আজিয়া আঁর লগে নাউট্যাপোয়া রাইত কাডাইব।’ (পৃ- ১২)

- আজ- আজিয়া,
- সাথে- লগে,
- রাত- রাইত,
- কাটাব- কাডাইব।

‘বিজন বহদ্দার আজিয়া লাল অই গেইয়ে গই।’ (পৃ- ১৬)

- আজকে- আজিয়া,
- গেছে- গেইয়ে।

‘বকুলি বলে ‘তুঁই এরইম্যা গরি টিয়া দি দি আঁরে ত ঋণী গরি ফেলিলা বহদ্দার। আঁই এট্টা টিয়া হইয়্যম কেএন গরি?’ (পৃ- ১৮)

- এরকম- এরইম্যা,

- এটা- এট্রা,
- কেন- কেএন।

'খা, অপুত খা। তোর জেডি বংশীর মা আজিয়া মাছ ইউন দিয়ে দে, ভুবনেশ্বরীর মুখে কৃজ্ঞতার আভাস ফুটে ওঠে।' (পৃ- ২১)

- জেঠি- জেডি,
- আজকে- আজিয়া।

'বলে, বা আজিরে ইক্কিনি অপেক্ষা গর। আঁই ভাত পাআত দি। মুড়ি উ-নি খাইতে খাইতে ভাত অই যাইবো গই।' (পৃ- ২২)

- বাবাজি- বা আজি,
- এখানে- এক্কিনি,
- কর- গর,
- পেতে- পাআত।

'দরদাম করে ভুবনকে কামিনী বহদ্দারের কাছ থেকে বিশ টাকা দিয়ে এক খাড়াং লইট্যামাছ কিনে দিল বংশীর মা। নিজেও কিনল এক খাড়াং। ভুবন জানে না এই মাছ নিয়ে কি করতে হবে।' (পৃ- ২৪)

- চুপড়ি- খাড়াং

'বাঁচি থাওন পড়িবো, বাঁচাই রাত্তন পড়িবো।' (পৃ- ২৫)

- বেঁচে- বাঁচি,
- থেকে- থাওন, রাওন।

'হে কৃষ্ণ, আঁরে মাপ গরিদিও, এই জাইল্যার পোয়ামাইয়া অলে আর জীবনগানেরে বিষায় তুইল্যে।' (পৃ- ২৫)

- করে দিও- গরিদিও,

- তুলে- তুইল্যে।

'জবাবে সাধু দুহাত তুলে বলে বললেন 'প্রণাম মা জননী। তুঁই কেএন আছ? তোঁয়ার পোয়া লেখাপড়া গরের নি।' (পৃ- ২৭)

- কেন- কেএন,
- তোমার- তোঁয়ার,
- ছেলে- পোয়া,
- করে নি- গরের নি।

'অ মামী আঁই কালিয়া জাইতর সমত হালিশাউয়া লই যাইয়্যাম গই' (পৃ- ২৮)

- যাওয়ার- জাইতর,
- যেতাম- যাইয়্যাম।

'ভুবন তার স্বভাবে বিরোধী প্রচন্ড চিৎকার করে বলে উঠল 'খবদ্দার এই হালিশ তুই নো ছুবি। লই যাওনতো দূরের কথা।' (পৃ- ২৯)

- ছুঁবি না- নো ছুবি,
- নিয়ে যাও- লই যাওনতো।

'মাগইন্যা অবাক হবার ভান করে বলল, গঙ্গাপদ এহনো ছোড। হিতে এহনো জালত যাউন্যা নো আয়। আর তুঁই মাইয়াপোয়া মানুষ। তুঁই এত বড় হালিশ দি কী গরিবা।' (পৃ- ২৯)

- করবা- গরিবা,
- যেও না- যাউন্যা,
- এখনো- এহনো।

'অ গঙ্গার মা। তুঁই কড়ে গেলা? সেদিন সকালবেলা বংশীর মা ভুবনদের উঠানে দাঁড়িয়ে ভুবনকে ডাকছে।' (পৃ- ৩০)

- কোথায়- কড়ে,

- গেলা- গেলে।

'ভাইনা উগ্গা আজিয়া বার- চইদ্য দিন বই বই খার। জাওনর কোনো নাম নাই নার দুনা ভাত খা। আঁরা কম খাইলেও মাইগইন্যার পাতত্ তো কম দিতে নো পারিব। ভাত খাইবার সমত হিতে পাতিলের খবর নো রাখে।' (পৃ- ৩০)

- আজ- আজিয়া,
- চোদ্দ দিন- চইদ্য দিন,
- যাওয়ার- জাওনর,
- পাতে- পাতত্

'তুই কঁত্তে যাবি মাগইন্যা? আজিয়া আঁইস্যচ্ দে বার চইদ্য দিন অই গেইয়্যে গই। তুই কালিয়াই যাবি গই।' (পৃ- ৩১)

- কোথায় যাবি- কঁত্তে যাবি,
- এসেছিস- আঁইস্যচ্,

'বা আজি, তোঁয়ারে এক্কান কথা কইতাম্।' (পৃ- ৩১)

- তোমাকে- তোঁয়ারে,
- একখানা- এক্কান,
- বলতাম- কইতাম।

'ব্রজেন্দ্র মাগইন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অই হালার পোয়া কী অইয়ে তোর আঁইস্যচ্ পর্যন্ত কিছু নো কঅর। গাঁজার কল্কিও নো লঅর।' (পৃ- ৩২)

- এসেছে- আঁইস্যচ্,
- না- নো,
- কথা- কঅর।

‘আঁরার কথামত কাম গইল্যে তোর অপমানর জ্বালাও কমিবো আর তোর মামীর বিষও মরিবো।’ (পৃ- ৩৩)

- গেলে- গইল্যে,
- কমবে- কমিবো।

‘মামী আঁরারলাই অপেক্ষা গরি থাইবো। আঁরা নো পৌঁছন পর্যন্ত ধরফরাইবো। নদীর পথ। যাইতে বউত সময় লাগিবো।’ (পৃ- ৩৪)

- করে- গরি,
- থাকবো- থাইবো,
- পৌঁছানো- পৌঁছন,
- অনেক- বউত,
- লাগবে- লাগিবো।

‘অবা। তুঁই ভিতর আই বইও। এই রাইতত্ কডে যাইবো। কিন্তু বাআজি আঁই বঅর গরিব মানুষ। তোঁয়ারারে কী খাইতাম দিয়্যম বুঝিত নো পারির। বারান্দাত্ উড়ি তুঁই এই পিড়াআনত বইও। চাই, শান্তির মাত্তোন চইল পাইনি।’ (পৃ- ৩৪)

- বস- বইও,
- তোয়ারে- তোমাকে,
- দিতাম- দিয়্যম।

‘নাতিউয়া হেদিন মনত বঅর দুঃখ লই গেহয়ে। তুঁই হিতারে হেদিন্যা যাইবাল্যাইগই হেএন গরি নো কইলেও চইল্তো। আঁর উগ্গামাত্র মাইয়ার পোয়া বআর কষ্ট পাইয়ে হেদিন্যা।’ (পৃ- ৩৬)

- সেদিন- হেদিন,
- গেছে- গেহয়ে,

‘গোপাল টাকাগুলো নিতে নিতে বলে, কালিয়া তো পাঁচন বাঁধনরও দিন। পাঁচনর তরিতারকারি নো আইন্যম?’ (পৃ- ৩৭)

- বাঁধবার- বাঁধনরও,
- পাঁচরকম- পাঁচনর,
- নিয়ে এলাম- নো আইন্যম।

‘কী ইত্যা লাইগ্যো, কী ইত্যা লাইগ্যো।’ (পৃ- ৩৯)

- কী জন্য- কী ইত্যা
- লেগবে- লাইগ্যো।

‘বিজনবিহারী কামিনী বহদ্দারকে উদ্দেশ্য করে কথা শুরু করল, কী সোহাগীর বাপ, তোঁয়ার গাউর টাউর ধরা হইয়নি? দেইলাম দে আইজো গোঁজ বাঁশ নো আনো।’ (পৃ- ৪০)

- তোমার- তোঁয়ার,
- আজ- আইজো।

‘এই রইম্যা বছর আঁরার লাভর মিডা পিঁইড়া খাই যারগই। আঁরা কিছুই গরিত নো পারিব। কিছু গরনের ক্ষেমতা আঁরাত্তোন নাই। বলল পূর্ণ বহদ্দর।’ (পৃ- ৪১)

- গরতে- গরিত,
- ক্ষমতা- ক্ষেমতা।

‘বলল হালার পোয়াত্তোন কোনো শরমভরম নাই। হুদি বউ লই ফুতনর চিন্তা।’ (পৃ- ৪২)

- ফুরতি- ফুতনর।

‘দশ বারোজন বহদ্দার পাউন্যা নাইয়াসহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে সারি করে জাল বসায়। জেলেরা জাল পাতানোর এই সারিকে পাতা বা বেতা বলে।’ (পৃ- ৪৬)

- পাওনা- পাউন্যা,
- নৌকা- নাইয়া।

‘অখন যাওন পাড়িবো। নো গেইলে পেট চলিবো কে এন গরি। দুই এক জোআর মাছ অই গেলে মাছঅ পঁচিবো জালও ফাড়িবো বলল- গোলক।’ (পৃ- ৪৭)

- এখন- অখন,
- যাওয়া- যাওন,
- পারবো- পাড়িবো।
- পঁচবে- পঁচিবো,
- ফাটবে- ফাড়িবো।

‘মাছ তো তোঁয়ার কাছে বাজার দামে বেচনর কথা, তুঁই তো তোঁয়ার ইচ্ছা মতন দিতা চাইতা লাইগ্যা।’ (পৃ- ৪৯)

- বেচার- বেচনর,
- চাইতে- চাইতা।

‘গোকুলবাঁশি একজন পাউন্যা নাইয়া। সে পিছন থেকে দৃঢ়স্বরে বললে এই অপমানের প্রতিশোধ লওন পড়িবো।’ (পৃ- ৫০)

- পাওনা- পাউন্যা,
- নেওয়া- লওন।

‘বেয়াগ্‌গিন হারাই আঁই আঁর ইস্ত্রি; মা বাপের লই অন্নাগো গেরামে আইছি। আঙ্গারে আন্নারার হাড়াত থাইবারলাই ইক্কিনি আজা দেন। আঁই লেয়াপড়া জানি। অন্নো গো পোলাপাইনের আঁই পড়াশোনা শিখায়্যুম।’ (পৃ- ৫৩)

- লেখাপড়া- লেয়াপড়া,
- শেখাব- শিখায়্যুম।

‘জোনাব আলীর বাপ জেলেদের মুখে অপ্রভংশ হয়ে জনইপ্যার ব্যপ হয়ে গেছে।’ (পৃ- ৫৪)

- জোনাব- জনইপ্যার।

‘বংশীর মা বলল, আজিয়া ইলিশমাছ হিবা নো বেইচ্যো। ইবা আঁরা খাইয়্যম। বউত দিন ইলিশমাছ নো খাই।’ (পৃ- ৫৫)

- বেচে- বেইচ্যো,
- অনেক দিন- বউত দিন।

- খাই নি- নো খাই।

'দিদি চল যাই কদিন। বাপের বড়িত গেলে তোঁয়াত্তোন ভালা লাইবো। তোঁয়ার ভাই-বউও আঁরে বার বার গরি কইয়ে তোঁয়ারে লগে লই যাইবাল্যাই।' (পৃ- ৫৬)

- লাগবো- লাইবো,
- তোমাদের- তোঁয়াত্তোন।

'অ, আর একখান কথা, আঁরার সমাজত তো আরও চাইরজন সর্দার আছে। হিতারারে কথাগিন বুঝাই রাখ।' (পৃ- ৫৭)

- চারজন- চাইরজন,
- কথাগুলো- কথাগিন।
- আমাদের- আঁরার।

'কই, গঙ্গাপদর মা কড়ে, কি অল্যাই সালিশ ডাইক্যা সভার মইধ্যান্‌দি আইয়েরে কও।' (পৃ- ৫৮)

- কোথায়- কড়ে,
- কি জন্য- কি অল্যাই।

'এক ঘইজ্যা গরি রাইখ্যম।' (পৃ- ৫৯)

- রাখতাম- রাইখ্যম,
- করে- গরি।

তথ্যসূত্র

আবুল কাসেম আদিল, ‘বাংলাভাষা : প্রমিত ও অপ্রমিত’, *www.wordpress.com*, 26.08.2016, https://abulqasemadil.wordpress.com/2016/08/26/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE/, 11th April 2019.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত উপন্যাসগুলি কাহিনি সংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভের আগে একটু দেখে নেওয়া যাক যে চারটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে গবেষণা সৌন্ধর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে তা হল মানিক বন্দ্যাপাধ্যায়র 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৪-১৯৩৫), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) এবং হরিশঙ্কর জলদাসর 'জলপুত্র'(২০১২)। এই চারটি নির্বাচিত আঞ্চলিক কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক-

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৪-১৯৩৫) উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার

১৯৩৬ সালে পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক পঠিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর গ্রাম এবং তার আশেপাশের পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর গ্রাম এবং তার আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মাঝি ও জেলেদের বাস্তব জীবনালেখ্যই যেন অঙ্কিত হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝি ও জেলেদের দরিদ্রের পদ্মার মাঝিদের জীবন সংগ্রামই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে লেখনী দিয়ে। তাদের প্রতিটি দিন কাটে দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা-দারিদ্রের সাথে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাটাই যেন তাদের জীবনের পরম আরাধ্য। এটুকু পেলেই তারা সুখী। কুবেরের পদ্মানদীর অসহায় দরিদ্রের মাঝি প্রতি নিয়ত অভাব অনটনের সাথে লড়াই করে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। মূলত কুবের কে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ধরে বাকি চরিত্র গুলির চিত্রন সম্পন্ন করেছেন উপন্যাসিক। উপন্যাসের নায়িকা কপিলা যদিও কুবের বিবাহিত এবং তার স্ত্রী জীবিত এবং তাদের সন্তান সন্ততি আছে। তবে কুবেরের স্ত্রী মালা জন্ম থেকেই পঙ্গু। উপন্যাসে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হোসেন মিয়া। সে পদ্মার তীর সংলগ্ন মাঝিপ্রধান গ্রামগুলোর অসহায় মাঝিদের মাঝে প্রায় সেবকরূপেই আবির্ভূত। তবে আপাত দৃষ্টিতে তাকে সবার সেবক বলে মনে হলেও সেই সেবা কর্মের পিছনে রয়েছে এক দুরভিসন্ধি সে বহুদূরে একটা নির্জন দ্বীপের পত্তন করেছে। সে দ্বীপ নির্জন শ্বাপদসসংকুল। অথচ সেই নির্জন দ্বীপেই সে একের পর এক পাঠাতো পদ্মা নদীর অসহায় মাঝিদের, তাদের মুখোমুখি হতে হত, অস্তিত্ব রক্ষার কঠিণ সংগ্রাম। এখাবেই চলে অসহায় দ্বীপহীন পদ্মানদীর মাঝির জীবন। চিরটাকাল তারা কাটিয়ে দেয় এক অজ্ঞানতার ধোঁয়াশায় ভিতরে, এক গোলকধাঁধায় তাদের জীবন বন্দী, এ গোলকধাঁধা, থেকে বের হওয়ার রাস্তা তাদের হইত জানা নেই কিংবা কেউ সাহস করে তা থেকে বের হতেও চায় না। এভাবেই কাটে পদ্মানদীর মাঝির প্রতিটা দিন-রাত আর কেটে যায় সারাটা জীবন। সেই জীবনের গল্পই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

পদ্মা তীরবর্তী পরিবার গুলোর, জীবনকাহিনী এর মূল উপজীব্য বিষয়। সম্ভবত এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে আদ্যন্ত কথোপকথনে প্রকৃতি মানুষের হাতে নির্যাতিত একটি গোষ্ঠী জীবনের ছোটো ছোটো সুখ দুঃখ ভালোবাসা, অসহায়তা ও আত্মরক্ষার তীব্র জৈবিক ইচ্ছার কাহিনী, গরীব মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ ও সংগ্রামের ও সংযমের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি উপন্যাসটিকে বাংলাসাহিত্যের অমরত্ব দান করেছে।

কুবের কপিলার আন্তঃসম্পর্ক উপন্যাসটিকে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে। তাদের দুজনের ভালোবাসা ছাড়াও মান অভিমান গুলো পাঠক হৃদয় ছুঁয়ে যায়। 'আমারে নিবা মাঝি লগে'। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আবহমান বাংলার চিরন্তন প্রেক্ষাগৃহ। আমাদের সমাজ সামাজিকতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্র তুলে ধরেছেন কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ ও প্রকৃতির কঠোরতার মধ্যে জেলে পরিবারগুলো কেন বাঁচতে চায়, কীভাবে বাঁচে, সমাজপতিদের মনোভাব কেমন হয় কীভাবে তারা শোষণ করে, গরীব মানুষদের অসহায়তাকে তারা কীভাবে কাজে লাগায়, আবার এই জেলেপল্লীর মানুষগুলোর ভাব-ভালোবাসা বা মন্দ লাগার ব্যাপার গুলো কেমন হয় তার পরিপূর্ণ বর্ণনা আছে, এই উপন্যাসের মধ্যে। সব মিলিয়ে এই উপন্যাস একটি সার্থক উপন্যাস।

অদ্বৈত মল্লবর্মন : 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার

'তিতাস একটি নদীর নাম, তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ প্রাণভরা উচ্ছ্বাস স্বপ্নের ছন্দে সে বয়ে চলে। ভোরের হাওয়া তার তন্দ্রা ভাঙে দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতে চাঁদ আর তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াতে বসে কিন্তু পারে না। শুরুতেই এই কথাগুলি রয়েছে উপন্যাসে। নদী অববাহিকায় বসবাসরত মৎসজীবী সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে, এই অববাহিকাতে বসবাসকারী ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষদের দিনরাত পরিশ্রম করলেও প্রাচুর্যের মুখ কখনো দেখে না। অভাব অনটন তাদের জীবনে যেন একই সুতোর গাঁথা। তবু এ দুঃখ দরিদ্রপূর্ণ জীবনে আসে প্রেম ভালোবাসা। এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে মৎসজীবীদের জীবন কষ্টের হলেও নির্বিঘ্ন নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে একসময় নদীতে চর পড়ে। নদী তার যৌবন হারায়। সেই সঙ্গে শেষ হয় নদীর মাছ ও জলের তরঙ্গ। নিরুপায় জেলেরা বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের যুগ-যুগান্তরের আবাস ছেড়ে জীবীকার অন্বেষণে অন্যত্র পাড়ি জমায়, আবার কেউ উপায়ন্তর না পেয়ে সেখানেই থেকে যায়। তখন তাদের দুঃখের সীমা আরো দীর্ঘায়িত হয়।

তিতাসের তীরে গড়ে উঠেছে সৃষ্টিশীল জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা যে আন্তরিক মমতায় অদ্বৈত মল্লবর্মন তুলে এসেছেন তার উপন্যাসে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এক উপেক্ষিত সমাজের জীবন সংগ্রামের কাহিনী দিয়েছেন অবিনশ্বরতা।

চার খন্ডে ও দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এ উপন্যাসে তিতাস একটি নদীর নাম পর্বে তিতাস নদীর বৈশিষ্ট্য ঋতু

পরিবর্তনের সাথে সাথে তিতাস পাড়ের মালোদের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আছে গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ নামে দুই মালোর জীবন সংগ্রামের কাহিনী। এরাই অনন্তের মাকে নিয়ে যায় গোকর্ণ ঘাটে। গৌরাঙ্গ মালোর জীবন দরিদ্রে পিষ্ট এবং তার দিন আর চলে না। গৌরাঙ্গের জীবনচিত্র দেখে সহজেই বোঝা যায় তিতাসের জলের সাথে তাদের জীবন বাঁধা। তিতাস যখন জল কম থাকে, তখন মালোদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের শেষভাগে গোকর্ণ গ্রামকে করে তোলা হয়েছে যেন এক হতাশাগ্রস্ত জনপদ। দেখে চেনার উপায় নেই এখানে একদিন জনবহুল এক মালোপাড়া ছিল। মালোপাড়াতে আর মালোরা নেই আছে শুধু জল। তিতাস! মালোদের জীবন ছিল একদিন এর সাথে বাধা মালোদের কোনো কিছু শপথ করত তো তিতাসের জল নিয়ে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাতাস তাদের সাথে ছলনা করতে পারবে না। অবশ্য মালোদের এই বিশ্বাসকে তিক্ত করে দেয় তিতাস। মালোরা উদবাস্তু হয়ে যায়। তিতাসের কোলে জন্মানো সন্তানরা তিতাসেই হারিয়ে যায়। তিতাস পারের মালোদের ঘরবাড়ির সম্পর্কে উপন্যাসের শূণ্য ভিটাগুলিতে বর্ণনা আছে।

তিতাসের বর্ণনা শেষ হয় দীর্ঘ হতশ্বাসের মধ্যে দিয়ে নদী কীভাবে মানুষদের কবিতা হয়ে ওঠে সেই এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি চরিত্র হেরে গিয়েছে তিতাসের রূপ পরিবর্তনের কাছে। তিতাসের বুকে চর জেগে ওঠায় তিতাস তার সন্তানদের মতোই নুইয়ে পড়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে বাসন্তী আর কিশোর পিতা রামকেশব জীবিত থাকে। দুজনেই নিঃস্ব রিক্ত। রামকেশব তার পুত্রকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিল তা ধূলিস্যৎ হয়ে যায়। কিশোর অনন্তের মাকে বিয়ে করার পর যখন স্ত্রী হারিয়ে পাগল হয়ে যায় তারপর আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে শেষপর্যন্ত রামকেশব বেঁচে থাকে। চোখের সামনে পুত্রের এই নির্মম ট্রাজেডি বিধস্ত হয় রামকেশবের দেহমন, আর অনন্তের মা শেষপর্যন্ত ঠাহর করে কিশোর ছিল তার স্বামী। কিন্তু যখন সে কিশোরের সেবা শুরু করে সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এবং শেষ পর্যন্ত গনপিটুনিতে তারা দুজনেই মারা যায়, মিশে যায় অনুভূতি তিতাসের জলে।

দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮) উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার

দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনজীবনের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ইতিহাস লক্ষ্য করি, যা আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। দেবেশ রায়ের উপন্যাস ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’। বাংলা উপন্যাস সাহিত্য মহাকব্যিক উপন্যাস বলে অভিহিত। ৫০৪ পাতার এই বৃহৎ উপন্যাসটি মোট ছটি পর্বে (আদি, বন, চর, বৃক্ষ, মিছিল ও অন্ত্য) এবং একটি পরিশিষ্ট অংশে বিন্যস্ত। ১৯৮০ সাল থেকেই বিভিন্ন শারদীয়া পত্রিকায় আলাদা আলাদা ভাবে পর্বগুলো প্রকাশিত হলেও গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের এই মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রতিবেদনে উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তাকে এবং তিস্তাতীরবর্তী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবন যন্ত্রনাকে তুলে ধরেছেন। জলপাইগুঁড়ি জেলার তিস্তানীর চর, চরে বসবাসকারী কৃষক সম্প্রদায়, তাদের জমির মালিকানা নিয়ে জোতদার দের

সাথে দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন কারনে, উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী জাতির জাতিতত্ব, রাজনৈতিক দলের আন্দোলন এবং তিস্তা ব্যারেজ তৈরীর ফলে তিস্তার মানুষদের পরিবর্তনের রূপরেখাটিই হল উপন্যাসের প্রধান বিষয়। উত্তরবঙ্গ নামক একটি বিশেষ অঞ্চলের জনজীবনের সমস্যা তুলে ধরেছেন। উত্তরবঙ্গের জনজীবনের উন্নয়নের জন্য তিস্তাকে বেঁধে ব্যারেজ তৈরী করা হলেও কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি সর্বহারী নিম্নবর্গীয় মানুষদের। উন্নয়ন হয়নি উপন্যাসে বর্ণিত বাঘারু, কাদাখোয়, মাদারি ও মাদারির মা'র মতো সর্বহারা মানুষদের। এইসব অন্তপরিচয়হীন, অক্ষরজ্ঞানহীন, ভাষাহীন না বৃত্তের মধ্যে থাকা মানুষরা অন্ধকারের তলানিতেই থেকে গেছে। কেননা এদের নাম নেই ঠিকানা নেই, এদের কোন মিছিল নেই, আবার এদের জন্য কোনো অপারেশন বর্গাও নেই, এদের জন্য ব্যারেজের জৌলসও নয়। এদের একমাত্র পরিচয় এদের কাজের মালিক। বাঘারু তাই তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে- 'লিখি দেয় গয়ানাথ জোতদার'। অথচ চরম বিপদের দিনে প্রয়োজন হয় এই বাঘারু, কাদাখোয়া, মাদারিদের।

দেবেশ রায় জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্যের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির সাথে বসবাসকারী আলোচিত জনজীবনের বসবাসের যে রীতি-নীতি তা তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই উত্তরবঙ্গের মাটি মানুষ প্রকৃতিক বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেননি, আর পারেননি বলেই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' হয়ে উঠল প্রকৃতি ও মানুষের জীবনগাঁথা। একদিকে যেমন ব্যক্তির ও ইতিহাসের মিলনে এক দেখজ নতুন আখ্যান।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে বাঘারুর কাছে প্রকৃতি আনন্দভূমি নয়। প্রকৃতি তার কাছে জীবনের আশ্রমভূমি। বাঘারুর ভাষা, হৃদয় শরীর প্রকৃতির সাথে নিবেদিতপ্রাণ, কখনোই আলাদা করা যায় না, উপন্যাসের 'বনপর্বে' দেখা যায় বাঘারু আর আকাশের চাঁদ একে অপরের দোসর হয়ে উঠেছে। এখানে বাঘারু কখনো আপনি খেয়ালেই প্রকৃতি হয়ে পড়েছে আবার প্রকৃতির চাঁদ কখনো মানবিক হয়ে উঠেছে। বাঘারু একটা ঢেলা কুড়ায়। বাঘারু একটা ঢেলা কুড়ায়। ঢেলাটা ছুড়ে বাঘারু দাড়িয়ে পড়ে। চাঁদটাও থেকে যায়। একটু দুরে ঢেলাটা পড়ে যাওয়ার ধুপ আওয়াজ হয়। চাঁদটার দিকে একটু ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকিয়ে বাঘারু আবার হাঁটতে শুরু করে হাঁসখালির বাঁধের দিকে। চাঁদও গড়াতে থাকে আপলচাঁদের দিকে। এখন বাঘারুকে একটু একটু করে উঁচুতে উঠতে হচ্ছে- কড়াইয়ের গা বেয়ে। চাঁদটাও একটু একটু করে ওপরে উঠে যেতে থাকে- আরো উত্তরে।

এই উপন্যাসের নায়ক বাঘারু। এই অনালোকিত, অনালোচিত, আত্মপরিচয়হীন, ভাষাহীন বাঘারুকে দেবেশ রায় প্রকৃতির রংতুলি দিয়ে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যে বাঘারু প্রকৃতির সন্তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাঘারুকে উপন্যাসের প্রথম থেকেই পাওয়া যায় গাজোল ডোবার জোতদার গয়ানাথের ভৃত্য বা চাকর হিসাবে, তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেয়। কুকুরের সাথে বাঘারুর যে একত্মতা তা অসাধারণ।

'চর পর্বে' লেখক উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তাকে এমন ভাবে উপন্যাসের প্রতিবেদনে তুলে ধরলেন যেন তিস্তানদী

আর নদী না থেকে হয়ে ওঠে প্রকৃতির আশ্রয়ভূমি। শুধু প্রকৃতিরই আশ্রয়ভূমি নয়। মানব জীবনের আশ্রয়ভূমি শীতকালে এই ভূখন্ডের মধ্যে দিয়ে পাথরের টিলা জেগে ওঠে, তাকে ঘিরে ভেজা বালিতে সেই টিলার জীবন্ত ছায়া সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘুরে যায়। এই ভূখন্ডের নতুন অংশ জুড়ে কোনো অরন্য জেগে ওঠে। যে নদী এমন ঘন ঘন বদলায়, যে নদীকে নদী হিসাবে চিনতে চিনতেই ভাঙা হয়ে যায়। নদীর ভেতর চলে যায় সে নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে নদীকে ব্যবহার করত। ব্যবহার বলতে যে শোষণ বোঝায়, তেমন ব্যবহার নয়। এ যেন মনে হয়, এ নিসর্গকে দেখতে পারে, পাহাড়, বন, নদী দিয়ে ঘিরে রাখা পাহাড় থেকে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছে এই নদী বন, পাহাড় এই সীমার দক্ষিনে কোনো পাহাড় নেই।

'মিছিল' পর্বে শেষ অধ্যায়ে বাঘারুর জন্মভূমি আপলচাঁদ এবং বাঘারু একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। আপলচাঁদ শুধু বাঘারুর জন্মভূমিই নয়, আপলচাঁদ তার কাছে একটা গোটা দেশ একটা গোটা পৃথিবী। ফলে বাঘারুর কাছে আপলচাঁদের সমস্ত দৃশ্যই তার চেনা এমনকি অপলচাঁদও তাকে নিজের অংশ ভেবে গ্রহন করেছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিজস্ব প্রবাহমান গতি আজ আধুনিকতার দাপটে ধ্বংসের দিকে চলেছে, প্রতিনিয়ত তার অবক্ষয় ঘটেছে। আবহমানের প্রকৃতি এখন মানুষের নির্দেশেই চলমান, সমাজ ও মানুষের সাথে প্রকৃতির সহাবস্থানের ইতিহাস এখন অতীত।

প্রকৃত পক্ষে বাঘারু মহাপ্রকৃতিরই সন্তান। তাই তিস্তার নদী বন্ধন, তিস্তার ব্যারেজ, তিস্তা পারের অর্থনৈতিক উন্নায়ন-এর কোনোটায় তার দিন যাপনের সাথে জড়িত নয়। ফলে তিস্তাপারের প্রগতির পথকে অস্বীকার করে বাঘারু মহাপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আত্মসমর্পন করে প্রকৃতির আরেক সন্তান মাদারি ও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে কারনে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে- সেই কারনে বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে কারনে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক সাপ খোপ চলে যাবে সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফেরস্টে বাঁচবে না। এই নদী বন্ধ ও ব্যারেজ দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়বে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে। এই অর্থনীতি ও উন্নয়নকে প্রত্যাখান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।

সে এখন সারারাত ধরে এই ফরেস্ট পেরবে- যেখানে সে জন্মেছিল। দুটো একটা রাস্তাও পেরবে। কাল সকালে আবার ফেরস্ট পেরবে। দুটো একটা হাটগঞ্জও পেরবে। কখনো মাদারির ঘুম পাবে। বাঘারু মাদারিকে বুকে তুলে নেবে।

উপন্যাসে আর এক প্রকৃতি মানুষের চরিত্র হল মাদারি ও মাদারির মা। যারা সামাজিক জীব হয়েও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। যাদের শুধু উত্তরবাসর বিস্তৃর্ণ লোকালয়ে নয় বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও আর্শয় নেই মাদারি ও মাদারির মা তাদের প্রতিনিধি। যাদের খাদ্য তালিকাতে আছে পশুখাদ্য তবু তারা বেঁচে থাকবে।

হরিশঙ্কর জলদাসের ‘জলপুত্র’ (২০১২) উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার

জলপুত্র শুরু হয়েছে ভুবনেশ্বরীকে নিয়ে যে কিনা অপেক্ষায় আছে পূর্বরাতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া তার স্বামী চন্দ্রমণির। উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরীর যে অপেক্ষা যেন শেষ হওয়ার নয়। আর তাই বোধ হয় দেখা যায় উপন্যাসের শেষেও ভুবন অপেক্ষায়মান। নিহত একমাত্র পুত্র গঙ্গাপদর লাশের সামনে বসে সে অপেক্ষা করছে গঙ্গার স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য। সে সন্তানের নাম গঙ্গা আগেই ঠিক করে রেখেছিল ‘বনমালী’ কেননা গঙ্গার প্রিয় মানুষ সমাজপ্রিয় জন জয়ন্ত তো গানের কলিতেই উচ্চরণ করেছিল ‘বনমালী তুমি পর জনমে হইও রাধা’। যে বণমালীকে নিয়ে গঙ্গা বা ভুবন এবং গঙ্গার যৌথ স্বপ্ন ‘আর বড় আশা আছিল আঁর বংশের কেউ বিদ্বান আইবো’। জেলেপাড়ার মানুষে বলতে চন্দ্রমণির বাড়িতে ব্যারিস্টার এসেছে।

জেলে পল্লীর মানুষ যে শিক্ষিত হবার নয় ব্যারিস্টার হবার নয় সে সত্য গঙ্গা উপলব্ধি করেছে তার শৈশব থেকেই। বাবা চন্দ্রমণি প্রকৃতির আঘার সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু গঙ্গা পেরেছে। বারবার পেরেছে। প্রকৃতির পর তার প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সমাজের মানুষ। নিজ সম্প্রদায়ের সকলকে সুসংগঠিত করে নায্য হিস্যা আদায়ের ব্যাপারে ঐক্যমত তৈরি করার সফলতার কারনেই সামাজিক সে শত্রুর বিষানল গঙ্গাকে বারবার আক্রমন করেছে। ধনবাঁশি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, শক্কুর আলী গভীর রাতে লোক দিয়ে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে দিয়েছে তাকে। সম্পদ আগ্রাসন এবং মুনাফা নিশ্চিত করার এই দুই প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল গঙ্গা। সরচ স্বপ্নচারীকে মাকে সাহস জাগিয়েছে এই বলে যে মা তুমি ভয় পেও না।

উত্তর পতেঙ্গার ভদ্রপল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন যে জেলে পাড়ার মানুষ এই গঙ্গা তার পাড়াটি আসলে কেমন? পাড়ার মানুষেরা কেমন? বলা যায় প্রায় মাইল দেড়েক দুয়েক দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে পাড়াটি শুয়ে আছে। হিন্দু ও মুসলমান পাড়াগুলো এই জেলে পাড়াটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই অবস্থান করছে সেখানে তাদের জীবন চলছে সংস্কৃতির পরিমন্ডলে। জেলেপাড়ার জীবন গাবের রসে চুবানো। এখানে প্রাণ আছে কিন্তু প্রাণবান পরিবেশ নেই। জীবন আছে কিন্তু জীবনের সুস্থির বাতাবরণ নেই। এদের জীবনরস ফুরিয়ে যায় পারস্পরিক গুঁতোগুতিতে, হিংসা, কুৎসা, গালিগালাজ, ছোটোখাট মারামারি এই পাড়াটিকে ভ্যাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ। আর আছে জেলেপাড়ার গায়ে শত শত শতাব্দীর দারিদ্রের গভীর চিহ্ন।

এই জেলে সমাজের ভেতর থেকে জেগে ওঠা মানুষ গঙ্গা, যে জেলেরা বুঝেছিল শক্কুর বা শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নিলেও সুদ থেকে নিজেদের মাছ রক্ষণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ প্রয়োজন। এক্যবদ্ধতা এবং শিক্ষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আসতে পারে মুক্তি। শিক্ষিত রামগোলাম ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সে প্রচেষ্টাতে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

কিন্তু সমাজ তো নীতি দিয়ে চলে না। আর চলবে না বলেই জেলেপাড়ার সকল মানুষ সবসময় একইভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকে না। বারবার ভাঙচুরের ভেতর দিয়ে সে ঐক্যকে ধরে রাখার প্রয়াস, গঙ্গার নিজের পরিবারের মানুষদের কাছ থেকেও সে আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে গঙ্গা আর ওর মা ভুবনেশ্বরীর সহায়সম্পদ। পাড়ার মানুষদের সামাজিক প্রচেষ্টায় রক্ষা পায় তারা, শশিভূষণ- শক্কুরের যে ষড়যন্ত্রে গঙ্গাপদকে হত্যা করার কথা চিন্তা করা হয় সেখানে কিন্তু হাজির জেলে প্রতিনিধি গোপাল ও গোপাল যে মিরজাফর তা সকলেই জানে, সে নিজেও কম জানে না। গোপালই বিভীষনের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার কর্মকান্ডের বিবরণ দেয়।

তথ্যসূত্র

মজুমদার সমরেশ ‘‘উপন্যাসে অঞ্চলিকতা : বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস’’, সত্যবতী গির ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা), প্রবন্ধ সঞ্চায়ণ, কলকাতা, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০০৬, পৃ- ১৪৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রকাশগত দিকের উল্লেখযোগ্য শাখা রূপতত্ত্ব। এখানে মুলত ধ্বণি, শব্দ ইত্যাদির গঠণ ও তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়। আলোচ্য বিষয় অব্যয়, সর্বনাম। অব্যয় হল যে সকল শব্দ, লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয় না, তাকে অব্যয় বলে। অর্থাৎ যার কোনো ক্ষয় নেই। ও, আর, বিনা, তথাপি ইত্যাদি। আর সর্বনাম হল নামের পরিবর্তে যা বসে। সে, তিনি ইত্যাদি। এখন দেখানো যেতে পারে নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ কোথায় কোথায় এই রূপতত্ত্বের প্রভাব পড়েছে-

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?’ (পৃ- ১৭)

- আমাকে- আমারে (সর্বনাম)

‘নাই কী রে, নাই? রোজ আমাদের মাছ দেওনের কথা না তর?’ (পৃ- ১১)

- তোর- তর (সর্বনাম)

‘গোপি মুখ ভার করিয়া বলিল, বতান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যে মুখে লয় কয় না?’ (পৃ- ১৭)

- বজ্জাতটা- সর্বনাম,
- আমারে- সর্বনাম।

‘জ্যাঠারে তুই চিনস না কুবির।’ (পৃ- ২১)

- তুই- সর্বনাম।

‘তর নিজের জ্যেঠা না?’ (পৃ- ২১)

- তোর- তর (সর্বনাম)

‘পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই।’

- তার- তগর (সর্বনাম)

‘তোনারে পালি কই কুবের।’ (পৃ- ৩৪)

- তাকে- তেনারে (সর্বনাম)

‘কুবের বলিল কেডা জানি?’ (পৃ- ৩৩)

- কে- কেডা (সর্বনাম)

‘মনডা পোড়ায় তর গেলেই পারস সোয়ামির ঘর।’ (পৃ- ৬০)

- তোর- তর (সর্বনাম)

‘হোসেন বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি।’ (পৃ- ৬০)

- তোমাকে- তোমাগো (সর্বনাম)

অব্যয়

‘কুবের বলিল উহু তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না।’ (পৃ- ৯)

- অব্যয়- বিনা।

‘জিরানের লাইগা মরস ক্যন ক দেহি? বাড়িত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়াল।’ (পৃ- ৯)

- লেগে- লাইগা,
- কেন- ক্যান,
- দেখি- দেহি,
- দিয়েনে- দিয়াল।

‘রাগ করিয়া বলিল কী কন!’ (পৃ- ১১)

- কী বলেন- কী কন।

‘নিয়া আয় গা, যা। বড়ো দেইখা আনিস।’ (পৃ- ১১)

- নিয়ে- নিয়া।

‘সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশি লইস, আঁই।’ (পৃ- ১১)

- কর কেন- করস ক্যন,
- কটা- কয়ডা।

‘কাল দিমু নিয্যস দিম।’ (পৃ- ১২)

- নিশ্চয়- নিয্যস।

‘কাল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই...’ (পৃ- ১২)

- একেবারে- এক্কেরে।

‘মিছা কত্তনের মানুষ তুমি না।’ (পৃ- ১২)

- বলার- কত্তনের।

‘কুবের অবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা। হটা হইল কিনা ?’ (পৃ- ১৫)

- পুইরা- পূরণ হয়ে,
- এটা- এটা,

‘গনেশ ক্ষুন্ন হইয়া বলিল, তুই নি গোসা করস কুবির।’ (পৃ- ১৫)

- অব্যয়- নি,
- কর- করস।

‘আয়ল কোয়ান থেইকা?’ (পৃ- ১৫)

- এল- আয়ল,
- কোথা- কোয়ান

‘গোপী বলিল, রাই উ ওই, বাবুগোর পোলা না খান ধরা হইছে বাবা।’ (পৃ- ১৭)

- রাই উ ওই
- না খান।

‘কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, নকুইলা কী লো হারামজাদি জ্যাঠা কইবার পার না?’ (পৃ- ১৭)

- কী লো,
- বলবার- কইবার।

‘লখা মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁ হুঁক। উয়ারে পিসি দিব।’ (পৃ- ২০)

- অব্যয়- উঁহুঁক,
- ওরে- উয়ারে।

‘কুবের বলিল হল যাই।’ (পৃ- ২০)

- অব্যয়- হল।

‘আজান খুড়া আছে। ল যাই।’ (পৃ- ২১)

- অব্যয়- ল যাই।

‘চালার লাইগা ছন লাগে আইনা লমু।’ (পৃ- ২১)

- অব্যয়- লাইগা,
- লমু।

‘কমুনে আজান খুড়া, সগগল কমু।’ (পৃ- ২৭)

- অব্যয়- কমুনে বলব।
- সগগল- সকল।

‘কুবের সন্ধিগ্ধ হইয়া বলে, দিবানি নিয্যস?’ (পৃ- ৩০)

- অব্যয়- দিবানি- দেব,
- নিয্যস- নিশ্চয়।

‘কপিলার গলাটা সে টিপিয়া দেয়, হি হি করিয়া হাসে।’ (পৃ- ৬০)

- অব্যয়- হি হি।

‘আমিনুদ্দির চোখ ছলছল করে।’ (পৃ- ৮৪)

- অব্যয়- ছলছল।

‘মালা সলজ্জভাবে বলে মনে এউককা সাধ ছিল মাঝি কমু।’ (পৃ- ১০৩)

- অব্যয়- এউককা- একটা।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘বাবা সুবলা তোর একটি ঘোড়া, আর কয়ডা পক্ষী আইক্যা দেও।’ (পৃ- ২৪)

- তোর- সর্বনাম।

‘না না আমরা নাওই রান্ধুম’ (পৃ- ৩৪)

- আমরা- সর্বনাম।

‘সে কথা কইনা জাল্লা, আমি।’ (পৃ- ৪০)

- সে- সর্বনাম।

‘তুই কেমনে জানবি এজনা আমার কি?’

- আমরা- সর্বনাম।

‘সুবলা তিরস্কার করিল ‘দাদা তোমারে কি মধ্যে ভূতে অমল করেছ।’

- তোমাকে- তোমারে (সর্বনাম)

‘একজনের কথা যে কইলা, সে মাইয়া কে?’

- সে- সর্বনাম।

অব্যয়

‘ভাঙা বেড়ার ফাঁকে দিয়া বোশনি ঢুকে, কেডায় যামুন ফক ফক কইরা হাসে।’ (পৃ- ২২)

- অব্যয়- ফকফক।

‘বুড়ারে দাঁড় টানতে দিয়া জোয়ান বেটা রইছে, আবার রস কেমুন পরাণ পিরীতি মধুলাগে।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- কেমুন- কেমন।

‘উঠান মাটি ঠনঠন পিড়া নিল সোতে, গঙ্গা মইল জল তিরাসে ব্রহ্ম মাইলে শীতে ‘ঘ অড়ইঠ অইঙলা সাধুর নির্বন্ধ তিশয্যে সুবল গানটি গাহিল।’ (পৃ- ৩৬)

- অব্যয়- ঠনঠন,
- অড়ইঠ,
- অইঙলা।

‘ছোট জাল্লা, তোমার ত খুবই সাইৎ। চল, মাছ ডাঙ্গিতে লইয়া জায়।’ (পৃ- ৪৪)

- অব্যয়- সাইৎ।

‘খাড়, হেইশালা গুরুদাওয়াল, অখনই বাপের বিয়া মার সভা দেখাইয়া দেই।’ (পৃ- ১০২)

- অব্যয়- অখনই- এখনই।

‘অন্যমনস্ক অনন্তের মার দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া অন্য একজন বলিল। কাকের মুখে সিন্দুরাই আম লো মা।’

- অব্যয়- লো মা।

‘অনন্তের মার মন উদ্দাম হইয়া উঠিল, কওনা গো ভইন তোমার কথাখান বিস্তারিৎ কইরা, শুনি, পুরাণ সার্থক করি।’ (পৃ- ১১৭)

- অব্যয়- কওনা গো।

‘বলিল যালা সুবলার বউ অনন্তের পাশে গিয়া শুইয়া।’

- অব্যয়- যা লা

‘যা-তা কইও না ভইন। পুলা রইছে, দেখ না।’ (পৃ- ১২৩)

- অব্যয়- কই ও না।

‘আলো, পোড়াকপালি, অখনই যা।’ (পৃ- ১২৬)

- অব্যয়- আলো,

‘হ, গইইত পুরুষ ছাড়া নারীর জীবনের কানাকড়ি দাম নাই।’ (পৃ- ১২৭)

- অব্যয়- হ চাইইত (চাইত)

‘পাগালেরে পাইলে তার লখ্ কইরা জীবন কাটাই।’ (পৃ: ১২৬)

- অব্যয়- লখ্ (সখ)

‘অ বনমালী সেওৎখানে তাড়াতাড়ি বাইর কর।’ (পৃ- ১৩৬)

- অব্যয়- সেইখান- সেওৎখানে

‘বও বও, কাদির বও। তামুক খাও।

- অব্যয়- বত্ত বত্ত (বস বস)

‘আইজের দিনখানা সইয়া থাক। দাও দাও আমি খোল কাইট্যা আনি।’

- অব্যয়- দাও দাও।

‘না-জল-না-শুকনো, এমুন জায়গাত্ রাইখ্যা পাছ ফিরা আইয়া পড় আর পিছনের দিকে চাইস না।’ (পৃ- ১৫৩)

- অব্যয়- পাছ (পিছন)

'... ক দেখি অনন্ত এ কথার মানতি কি?' (পৃ- ১৬৯)

- অব্যয়- মানতি (মিনতি)

'জানি নো জানি নয়ানপুরের মানুষ সকই জানি, অতঠিসারা কইর না।' (পৃ- ১৭৩)

- অব্যয়- কইর না (করো না)

'আমারে দিয়া দে দিদি, আমি খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া মানুষ করি, পরে একদিন বেইমান পক্ষীর মতো উইডা যাউক, আমার কোনো দুখ নাই। (পৃ- ১৭৬)

- অব্যয়- যাউক (যাক)

'উদয়তারা একদলা কাই হাতের তালুতে দলিতে দলিতে বলিল।' (পৃ- ১৭৬)

- অব্যয়- দলিতে দলিতে।

'আচ্ছা- পানির তলে বিন্দাজী ঝিকমিক করে, ইলগা মাছে ঠোকর দিলে ঝর ঝরাইয়া পড়ে?' (পৃ- ১৭৬)

- অব্যয়- ঝিকমিক, ঝরঝরাইয়া।

'মরি হায়বে কিবা শোভা! রাখালগণ! রাখালগন ডাকিতে আছে ঘন ঘন বৃন্দাবনে। (পৃ- ১৭৮)

- অব্যয়- লাউদি।

'এই ব'ছর তোরে আমি বিয়া করি কেমুন লা উদি।' (পৃ- ১৮২)

- অব্যয়- লাউদি।

'হ বা জি। বেপারীর বড় মিছা কথা নয়।' (পৃ- ১৯৫)

- অব্যয়- হ বা জি (হে বাবাজি)

‘তার মধ্যে এমুন গাজব।’ (পৃ- ১৯৮)

- অব্যয়- এমুন- এমন

‘এই রকম দিনে ডাকাতি হাওবে ডাকাতি করব?’ (পৃ- ২০০)

- অব্যয়- হাওরে (হতো রে)

‘কাদিরের চোখ ছলছল করে উঠল।’ (পৃ- ২০৬)

- অব্যয়- ছলছল।

‘আকাঠ মান্দাইলের নাও ঝুনুর ঝুনুর করে নাও জিত্যা আইলাম রে নাওয়েরে গলুই পাইলাম না।

- অব্যয়- ঝুনুর ঝুনুর।

‘আরে বেইমান কাউয়া, এই সগল কথা তোরে কে শেখাইল, ...’ (পৃ- ২১৭)

- অব্যয়- কাউয়া (কাক)

‘তা দরজা বন্ধ কিয়ের লাগি।’ (পৃ- ২২০)

- অব্যয়- কুয়ের লাগি (কিসের লাগি)

‘কেন গো দিদি, আমরা কি বাজারের গামছা না, সাবাজ যে ডুইব্যা তলায় পইডা ক্ষয় হযু।’ (পৃ- ২৪৭)

- অব্যয়- হমু (হব)

‘নেউক হুক্কা নেউক।’ (পৃ- ২৪৯)

- অব্যয়- নেউক।

‘বাড়ির লগে বাড়ি- দুজনেই একসাথে গলাই গলাই।’ (পৃ- ২৫০)

- অব্যয়- গলাই গলাই।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘মোর নামখানা ফোমে রাখিবেন হুজুর ফরেস্টচন্দ্র বাঘারুবর্মন।’ (পৃ- ৩৯)

- আমরা- মোর (সর্বনাম)

‘গয়ানাথ সব শিখিবার চাছে, হে ফরেস্টার, মোক হালুয়াগিরি খান শিখি দে।’ (পৃ- ৩৯)

- আমার- মোক (সর্বনাম)

‘যা করিবার উমরায় করিবেন তোমরালা এ্যালায় হাল ঠেলিবার ধরিছেন।’ (পৃ- ৪৩)

- তোমরা- তোমরালা (সর্বনাম)

‘মুই হাল দিছু আর তুই বেটার ঘর ভটভটাছিস, শালা।’ (পৃ- ৪৫)

- আমি- মুই (সর্বনাম)

‘মোক ঐঠে যাবানাগিবে।’ (পৃ- ৫৯)

- আমার- মোক (সর্বনাম)

‘বীরেনবাবুর কথা শেষ হলে সে বলে বসে, হে এ বাবুসন (বাবুরা) তঁয় কহথে কি হামনিমন (আমরা) সব জমি ছেড়ে হ অউর বাগানিয়া লোক সব জমি দখল লে লিবে? ত হামনিমন কাঁহা যাবে।’

- তারা- তয় (সর্বনাম)
- আমরা- হামনিমন (সর্বনাম)

‘কিন্তু তোমাক মোর নামখানা সলমল বড় ইয্যা যাছে।’ (পৃ- ৯৪)

- মোর- আমার (সর্বনাম)

‘কনট্রাকটর বুজালেও ও আমাগো দিয়্যাই কইরত।’ (পৃ- ১১৮)

- আমাদের- আমাগো (সর্বনাম)

‘হে-এ দিদি, মোর মাইটাক আর হামাক নে কেনে।’ (পৃ- ৪৬৮)

- মোর- আমার,
- হামাক- আমার।

‘ঘোষমশাই কইছিল দোকান বন্ধ করিবার আগত একখান লাড্ডু আর একখান নিমকি নিবার তানে কইছিল মুই ভুলি গেইছু।’ (পৃ- ৩৫৬)

- মুই (সর্বনাম)

‘গয়ানাথ ভিড়টার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, শালা ফাট, কাম নাই কুত্তার নহরে সার।’ (পৃ- ৪৩০)

- সর্বনাম- শালা, কুত্তার।

‘বাদ দে, ওটাক নিবার লাগিবে না, শালা গরম খাইলেই হইল।’ (পৃ- ২২৪)

- সর্বনাম- শালা।

‘কালত তোমাগো পাঁঠা খাইবে হব।’ (পৃ- ২৬০)

- তোমাগো।

‘পরশমনি বলে না হামরা ত খাইনা।’ (পৃ- ২৬১)

- হামরা (আমরা)

‘হামরালা গাছগিলাক আর তক খুঁজিনিস।’ (পৃ- ২৮০)

- হামরালা (আমরা), তক (তাকে)

‘আরে আপনার সেই মানাবাড়ির মাগিটাইত ভাইস্যা আইসছে।’

- মাগিটাই।

‘তগই ভাল হইত। আমারে একশ দিতি।’

- তগই, আমারে (সর্বনাম)

‘দড়ি নিয়া আমাগো রেসকু দিব্যার ধইরেছ।’

- অব্যয়- আমাগো (আমাদের)

‘তারে টাকা দিব কিডায়।’ (পৃ-৩৩২)

- তারে (তাকে), কিডায় (কে)।

‘সে কাম তোমরালা পাবলিক জোগারু করি করিবেন না ...’ (পৃ- ৩৫৬)

- সর্বনাম- তোমরালা,

‘মোক হাউলি খাটোবার চাছেন।’ (পৃ- ৩৫৯)

- সর্বনাম- মোক।

‘কায়ও না আয়ে? শালো বলদের দল!’ (পৃ- ৪৩০)

- সর্বনাম- শালো, বলদের।

‘তু বল না কঠো?

তু বল্ মাইকে মদেশিয়া মেয়ের রিনরিন গলা।

লে লে শুন। তু আঁখ বুজা কর।’ (পৃ- ২২)

- অব্যয়- কঠো, লে লে।

‘দে-খ্ দে-খ্, ভাইমন অউর বহিমন, দেখো হাম খাড়া উঠলেক হো-খা-আ-আ-ড়া।’ (পৃ- ৩০)

- অব্যয়- দে-খ্ দে-খ্ ,অউর।

‘হু-জু-উ-র মুই ফরেস্টার চন্দ্র আসি গেইছু।’ (পৃ- ৩৮

- অব্যয়- হু-জু-উ-র,

‘আসিন্দির জোড় হাতে চিৎকার করে ‘হে বাপা, মোক ক্ষেমা দাও।’ (পৃ- ৪৫)

- অব্যয়- হে বাপা।

‘একেবারে পাবণ থাকিবে, নড়চড় না হবে।’ (পৃ- ৫৪)

- অব্যয়- নড়চড়

‘এইঠে ও ত স্যারের কাছে মোর কথাটা কহা যায়’ (পৃ- ৫৮)

- অব্যয়- এইঠে ও ত- এখানেও,
- কহা- বলা।

‘হয় হয় রওনা দিছে হে’।

- অব্যয়- হয় হয়, হে।

‘শালা কার কথা, কী কথা কিছু শুনবেক নাহ্, চিল্লাখেত চিল্লাখে’। (পৃ- ৭৩)

- অব্যয়- চিল্লাখে।

‘পুলিশ আয়গা ব্যাস ফটাফট দু দলের কমরেডনম এ্যারেষ্ট।’ (পৃ- ৭৮)

- অব্যয়- ফটাফট।

‘নয়ানাথ বলে হে বাঘারু, পাছত ওঠ কেনে।’ (পৃ- ৯২)

- অব্যয়- পাছত- (পছনে)

‘আরে বাঘারু খান ত মোর নাম না আছিল। মানযিলা ছিমে।’ (পৃ- ৯৫)

- অব্যয়- ত, দিয়ে (দিয়েছে)

‘ধারও আছিল চকচকা’ (পৃ- ৯৬)

- অব্যয়- চকচকা।

‘মানত ন আসে কোটত অসিছু, কোটত যাছু’। (পৃ- ৯৬)

- অব্যয়- মানত ন, আসিছু (এসেছে), যাছু (নিয়েছে)।

‘ব্যাস মুই য্যালা ধরি নিছু মুই পড়ি যাম যাম।’ (পৃ- ৯৭)

- অব্যয়- যাম যাম (যাব যাব), নিছু।

‘নামের পালাটিয়াখান ঢলঢলাছে খলখলাছে।’ (পৃ- ৯৭)

- অব্যয়- ঢলঢলাছে, খলখলাছে।

‘এম.এল.এ বলে ন্যাও, খ্যাও কেনে।’ (পৃ- ১০৭)

- অব্যয়- ন্যাও (নেওয়া অর্থে), খ্যাও (খাওয়া অর্থে)

‘তোমার তানে কথা কহিছে এটা, এতত ?’ (পৃ- ১০৭)

- অব্যয়- এতত।

‘শালো ডমনা তারপর হন হন করে এগিয়ে আসে, যেন একটুকু গাল গালই বাকি ছিল (পৃ- ১০৮)

- অব্যয়- হন হন।

‘এম.এল.এ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলেন মুখখান পাছত করি কথা কহিবার লাগিবে। (পৃ- ১১১)

- অব্যয়- পাছত (পিছন)

‘হে-ই নকুইল্যা তুই ক কেনে।’ (পৃ- ১১৩)

- অব্যয়- হে-ই।

‘এ্যাহন ত তারই করি ক ক।’ (পৃ- ১১৪)

- অব্যয়- ক ক।

‘পাতাগিলা ঝলঝল করিবার ধইচছি য্যন বিষ্টি হবা ধরিছে।’ (পৃ- ১২৭)

- অব্যয়- ঝলঝল।

‘বাঘারু বলে খাড়ো খাড়ো কনেক খাড়ো।’ (পৃ- ১৪৮)

- অব্যয়- খাড়ো খাড়ো (দাঁড়াও দাঁড়াও), কনেক (কিছুক্ষণ)।

‘পাগল করি দিবরে ধইচেছে সেউ ডাকটা এই পাখি কেনং করি ডাকি (পৃ- ১৬০)

- অব্যয়- কেনং (কেমন), ধইচেছে (ধরেছে)।

‘শালো, কোটত খুঁজিবে মোর দেউনিয়া, মোক?’
আর এই বাথানক?’ (পৃ- ১৭৬)

- অব্যয়- কোটত (কোথায়), দেউনিয়া, বাথানক।

‘তাড়াতাড়ি যাবেন, গিরহন (গ্রহন) নাগিবে। (১৭৯)

- অব্যয়- গিরহন (গ্রহন)

‘মুই আসিছু এইঠে খাড়ান, বাঘারু যাবার উদ্যোগ করতেই।’ (পৃ- ১৮০)

- অব্যয়- আসিছু (এসেছে)।

‘আঁ আঁ করে কাঁদি ওঠে।’ (পৃ- ১৮৬)

- অব্যয়- আঁ আঁ।

‘কী হইছে কনা, শালা পালা গাবার ধরছে, নিতাই ধমকে ওঠে।’ (পৃ- ২০৯)

- অব্যয়- ক না।

‘হে এ নরেশ একখান বোল্ডার ফেল্যা এইখ্যানে মাটি ভাইংসা গিছে।’ (পৃ- ২২৮)

- অব্যয়- ভাইংসা (ভেঙে)

‘শালা অমূল্য কোটত গেইল।’ (পৃ- ২৩০)

- অব্যয়- কোটত (কোথাই), গেইল (গেল)।

‘হে এ বলি এককারে কিচকিচ করত্যাছে-’ (পৃ- ২১৮)

- অব্যয়- হে এ, এককারে (একেবারে), কিচকিচ, করত্যাছে (করছে)।

‘চল, আগত চল’ (পৃ- ২২৫)

- অব্যয়- চল।

‘ছাড়ু কিনা ছাড়ু
না ছাড়ু না ছাড়ু।’ (পৃ- ২৪২)

- অব্যয়- ছাড়ু।

‘হে ই, হেট, হেট খবোরদা- আ-রো-হে ...’ (পৃ- ২৪৫)

- অব্যয়- হে-ই, আ-রো-হে।

‘আরে বোবা নাকি? (পৃ- ৩২৬)

- অব্যয়- বোবা।

‘পেছন থেকে একটা গলা শোনা যায়- চালের উপরত্ কয়কান মানষি দেখিছেন।’ (পৃ- ৩৩০)

- অব্যয়- উপরত (উপরে), কয়খান (কতগুলো)

‘নিদ যাছেন নাকি বাপা হে - ?’ (পৃ- ৩৫৮)

- অব্যয়- বাপা হে।

‘এইঠে তোমার চক্ষুর ওপর দিয়া গেছু আর তোমরালা দেখিরে পাও না?’ (পৃ- ৩৫৮)

- অব্যয়- গেছু (গেছে)

‘হে-এ দিদি, মোর মাইটাক আর হামাক নে কেনে, হে দিদি মোক নে কেনে, মোর মাইটাক দে কেনে।’ (পৃ- ৪৬৮)

- অব্যয়- হে-এ, মাইটাক (মাইকটা), নে কেনে।

‘চল কেনে চল।’ (পৃ- ৪৬৯)

- অব্যয়- কেনে।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘খেতে খেতে গঙ্গা মুখ তুলে বলেছে, মা আজিয়া তোয়ার মাছ বাঁধা খুব হোয়াইদ্যা অইয়ে।’ (পৃ- ২২)

- তোমার- তোয়ার (সর্বনাম)

‘গাঁজার কল্কিও নো লঅর।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- ল অর।

‘অ বদ্দা, অ জেডা, অ মামা আঁরে দুয়া মাছ দাও না।’

- অব্যয়- অ বদ্দা, অ জেডা, অ মামা।

‘আঁই ভুবনেশ্বরী মামীর ভাইনা। তাঁই আঁরে কুসুমিরে নাইয়র লই যাইবার লাই ডিডায়েদে।’ (পৃ- ৬৩)

- তাকে- আঁরে (সর্বনাম)

‘বাধা আইয়েন আজিয়া তোঁয়ারে কইদ্যে।’ (পৃ- ৬৮)

- তোমাকে- তোঁয়ারে (সর্বনাম)

‘মঙ্গলী বলে উঠেছিল, অ ছেয়ার, কীত্তা লাইগ্যা।’ (পৃ- ৮৩)

- ছোয়ার- ছেলের (সর্বনাম)

‘আঁই ভুল কইত পারি, আঁর খাতা কি মিছা কথা কইব না?।’ (পৃ- ৮৪)

- আমি- আঁই (সর্বনাম)

‘তোঁয়ার লগে আজিয়া দুই কড়ি বছর ঘর গরিব।’

- তোমার- তোঁয়ার (সর্বনাম)

‘ঠিক আছে আঁরা রাজি।’ (পৃ- ৯১)

- আমরা- আঁারা (সর্বনাম)

অব্যয়

‘অ পুত, আর ইক্কিনি থক্কা। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগারের দিকে চোখ রেখে বলে ভুবনেশ্বরী।’ (পৃ- ৮)

- অব্যয়- অ পুত।

‘কইমপতি বলছে, বেচারির দেইলে কইলজা ফাডি যা গই। কিরইম্যা সোনার অঙ্গ কালা অই জারগই।’

- অব্যয়- কইলজা, ফাডি যা গই।

‘ঘা, অপুত খা। তোর জেডি বংশীর মা আজিয়া মাছ ইউন দিয়ে দে, ভুবনেশ্বরীর মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে ওঠে।’ (পৃ- ২১)

- অব্যয়- ইউন, দিয়ে দে, অপুত খা।

‘বকুলি বলে ‘তুঁই এরইম্যা গরি টিয়া দি দি আঁরে ত ঋণী গরি ফেলিলা বহদ্দর।’

- অব্যয়- এরইম্যা, দি দি, আঁরে।

‘আঁই কি তোঁয়ারে বাঁধা দিয়্যম না? কোনোদিন বাধা দি না? কঁত্তে আনিবার?’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- আঁই, তোঁয়ারে (তোমারে), কঁত্তে (করতে)।

‘ব্রজেন্দ্র মাগইন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘অই হালার পোয়া কী অনয়ে তোর আঁইস্যচ্ পর্যন্ত কিছু নো কঅর। গাঁজার কল্কিও নো লঅর।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- ক অর, ল অর।

‘মাগইন্যা ধীরে ধীরে বলল। আজিয়া দুইজ্যা আঁর মামী আঁরে খুব অপমান গইজ্যে।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- আঁর, গইজ্যে।

‘অ বউ কন্ আইস্যে চাও। তোঁয়ার বদ্দা লাগে বলে, তোঁয়ারে নাইয়র নিত আইস্যে।’

- অব্যয়- অ বউ।

‘মামী আঁরারলাই অপেক্ষা গরি থাইবো। আঁরা নো পৌঁছন পর্যন্ত ধরফরাইবো। নদীর পথ। যাইতে বউত সময় লাগিবো।’ (পৃ- ৩৪)

- অব্যয়- আঁরারলাই, আঁরা নো।

‘নাতিউয়া হেদিন মনত বঅর দুঃখ লই গেইয়ে।’

- অব্যয়- গেইয়ে।

‘কডে বই যে বউ। তুঁই দেখর বউ অর স্বপ্নন।’ (পৃ- ৯৭)

- অব্যয়- যে বউ, বউঅর (বউয়ের)

‘ফাউন মাসত খাবাইয়্যম।’

- অব্যয়- খাবাইয়াম।

তথ্যসূত্র

বিশ্বাস সুখেন, ‘প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা’, কলকাতা, প্রত্যয় প্রকাশনী, ৬১, মহাত্মাগান্ধি রোড, প্রথম প্রকাশ, পৃ : ১৫৫-১৮২

চক্রবর্তী, বামনদেব, ‘‘উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, বর্ণপরিচয়’’ অস্থায়ী কলেজ ষ্ট্রীট পুরবাজার কে ৩/৬ মার্কস, স্কোয়ার, উদ্যান, প্রথম, প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ : ২১৬-২২২, ৯৩-৯৬.

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার

অপ্রমিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করতে গিয়ে, নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৪-১৯৩৫), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) এবং হরিশঙ্কর জলদাসের 'জলপুত্র'(২০১২) এই উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ অপ্রমিতের ব্যবহারে কতদূর সার্থকতা পেয়েছে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে। ধ্বনি অর্থাৎ sound। ব্যাপক অর্থে পাখির কলধ্বনি, হাততালির শব্দ সব sound বা ধ্বনি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এগুলি আলোচ্য নয়। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে phone বলা হয়, বাংলাতে বাগধ্বনি বা phone এই ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হল বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ। বিশেষ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট নাম কে বোঝায় সেই বিশেষ্য বা নামের পরিবর্তে যা বসে তা বিশেষণ আর কোনো কাজ বোঝালে ক্রিয়াপদ। নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করা হল-

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য, বিশেষণ

'ধনঞ্জয় বলে সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।' (পৃ- ৮)

- সাঁঝের দর- সন্ধ্যাবেলার দাম,
- বিশেষণ- সাঁঝের,
- বিশেষণ- দর

'রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদল পাঁক দিমুনে ছুঁইড়া মুখের মধ্যে।' (পৃ- ১৭)

- একদল পাক- একদলা পাক
- বিশেষণ- একদল
- বিশেষ্য- পাক।

'গণেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়াবই মেলায় যামু।' (পৃ- ২৪)

- ঢোঁক গিলিয়া- ঢোঁক গিলে

- বিশেষণ- গিলিয়া
- বিশেষ্য- ঢোঁক।

'নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে, আমি আলাম গো কুবির দা।' (পৃ- ২৬)

- গদগদ কণ্ঠে
- বিশেষ্য- কণ্ঠ
- বিশেষণ- গদগদ।

'গাও জ্বলাইনা কথা দেহি খইব পারা ফোটে।' (পৃ- ৪০)

- বিশেষণ- খইর পারা।

'কুবের বলে লখ্যা আইলি রে হারামজাদা পোলা।' (পৃ- ৫৯)

- বিশেষ্য- পোলা
- বিশেষণ- হারামজাদা।

'গণেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল কুচরিত্তির কি বা? গীত শোননে দোষ নাই।' (পৃ- ৬০)

- কুচরিত্তির- খারাপ চরিত্র।
- বিশেষ্য- চরিত্র
- বিশেষণ- কু।

'আর কিব্যা আমুনা ভাবিলে মনডা পোড়ায়।' (পৃ- ৮৪)

মনডা পোড়ায়-

- বিশেষ্য- মনডা,
- বিশেষণ- পোড়ায়।

‘ধনঞ্জয় বলে সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।’ (পৃ- ৮)

- জিজ্ঞাসা করা- জিগা (ক্রিয়াপদ)

‘নাই কিরে নাই রোজ আমাদের মাছ দেওনের কথা না তর? আয় গা, যা। বড়ো দেইখ্যা আনিস।’

- দেওয়ার- দেওনের (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ১১)
- দেখে- দেইখ্যা (ক্রিয়াপদ)
- আনিস- আনিস (ক্রিয়াপদ)

‘কুবের মাথা নাড়িল আইজ পারুম না শেতলবাবু, আজানখুড়া সিধা মোর দিকে চাইয়া রয়েছে, দেখ না?’

- পারব না- পারুম না (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ১১)
- চেয়ে- পাইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘ধনঞ্জয় তৎক্ষনাৎ রাগ করিয়া বলিল মিছা কইলাম নাকিরে কুবির? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।’

- বললাম- কইলাম (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ১২)
- জিজ্ঞেস- জিগাইস (ক্রিয়াপদ)

‘গনেশ খানেকক্ষণ ভাবিয়া বলে হাল ধইরা যদি পারস কুবির খুড়া আর আমি বইঠা বাই তাড়াতাড়ি পৌছান যায়।’

- ধরে- ধইরা (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ১৩)
- পার- পারস (ক্রিয়াপদ)
- বইঠা বওয়া- বইঠা বাই (ক্রিয়াপদ)।

‘শেষে বিরকত হয়ে কুবের বলিল চুপ যা গণেশ, পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা, গনেশ ক্ষুন্ন হয়ে বলিল, তুই নি গোসা করস কুবির? করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই।’

- চুপ কর- চুপ যা (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ১৫)
- রাগ কর- গোসা করস (ক্রিয়াপদ)

- করব- করুম (ক্রিয়াপদ)
- মারবার- মাইরবার (ক্রিয়াপদ)।

'পিসি বলিল, শিনি যে ধন? বউ ওদিকে বিয়াইয়া সারছে দেইখ্যা আয়।' (পৃ- ১৭)

- সেরেছে- সারছে (ক্রিয়াপদ)
- দেখে- দেইখ্যা (ক্রিয়াপদ)।

'কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, নকুইল্যা কী লো হারামজাদি জ্যাঠা কইবার পার না।' (পৃ- ১৭)

- চেঁচিয়ে- চেঁচাইয়া (ক্রিয়াপদ)
- বলবার- কইবার (ক্রিয়াপদ)।

'রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদল পাঁক দিমুনে ছুইড়া মুখের মধ্যে।' (পৃ- ১৭)

- করে- কইরা (ক্রিয়াপদ)
- জিজ্ঞাস করা- জিগায় (ক্রিয়াপদ)
- দেব- দিমুনে (ক্রিয়াপদ)
- ছুঁড়ে- ছুইড়া (ক্রিয়াপদ)

'গনেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, চল কুবির, চল কুবির না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।' (পৃ- ১৯)

- করে- কইরা (ক্রিয়াপদ)
- থুয়ে- থুইয়া (ক্রিয়াপদ)
- বওয়া- বইয়া (ক্রিয়াপদ)

'আঁতুড়ে হইয়া ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, আ গো খাইও না, শুইন্যা যাও চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে।'

- যেও না- যাইও না (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ২১)
- শুনে যাও- শুইন্যা যাও (ক্রিয়াপদ)

‘কিয়ের সমান। ছন পা পাইতা ভিজা ভিতে শোওন যায়? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা থাক। চালার লাইগা ছন লাগে আইনা লমু।’ (পৃ- ২২)

- পেতে- পাইতা (ক্রিয়াপদ)
- শোওয়া- শোওন (ক্রিয়াপদ)
- মেরে- মাইরা (ক্রিয়াপদ)
- লেগে- লাইগা (ক্রিয়াপদ)

‘মালা আপশোশ করিয়া বলিল কবে গেল? আগে নি একবার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইলাম কইলকাতার পয়হায় দশখান পাওন যায়।’ (পৃ- ২২)

- বলল- কইল (ক্রিয়াপদ)
- আনবার- আইনবার (ক্রিয়াপদ)
- বলতাম- কইতাম (ক্রিয়াপদ)

‘কুবেরকে জড়াইয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, আমি আলাম গো কুবির দা।’ (পৃ- ২৬)

- জড়িয়ে- জড়াইয়া (ক্রিয়াপদ)
- এলাম- আলাম (ক্রিয়াপদ)

‘নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যদবার আইলাম।’ (পৃ- ২৬)

- এলাম- আইলাম (ক্রিয়াপদ)

‘শ্যাষ বেলায় সস্তায় কিনলাম কুবির পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষম্যাশ চোদ্দ পয়হায় দেল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবার কইলাম তা, কয় ত্যাল মরিস নাই, চালও নাকি বাড়ছে।’ (পৃ- ৩০)

- রাধবার- রাইধবার (ক্রিয়াপদ)
- বললাম- কইলাম (ক্রিয়াপদ)

‘সিধু আহত হইয়া বলে, দিমুনা? কস কি কুবের।’ (পৃ- ৩০)

- হয়ে- হইয়া (ক্রিয়াপদ)
- দেব না- দিমুনা (ক্রিয়াপদ)

‘মাছগুলো বাড়িত দিয়া আসিস, লইয়া যা।’ (পৃ- ৩৩)

- দিয়ে- দিয়া (ক্রিয়াপদ)
- নিয়ে- লইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘কুবের বলিল কেডা জানে? মুটাইছে দেখলাম।’ (পৃ- ৩৪)

- কেটা জানে- কেডা জানে(ক্রিয়াপদ)
- মোটা হয়েছে- মুটাইছে (ক্রিয়াপদ)

‘গাও জ্বালাইনা কথা দেহি খইর পারা ফোটে, যায় নি মুখে। মধু দিছিল আঁতুড়? গোসা হইলে মারুম গোপির মা।’

- জ্বালিয়ে- জ্বালাইনা (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ৪০)
- দেখি- দেহি (ক্রিয়াপদ)
- দিয়েছিল- দিছিল (ক্রিয়াপদ)
- রাগ- গোসা (ক্রিয়াপদ)
- মারব- মারুম (ক্রিয়াপদ)

‘কুবের বলিল লখ্যা আইলি রে হারামজাদা পোলা?’ (পৃ- ৫৯)

- এলি- আইলি (ক্রিয়াপদ)

‘সে সোয়ামি দূর কইরা খেদাইয়া দিছে তার লাইগ্য মোনডা পোড়ায় তর গেলেই পারস সোয়ামির ঘর।’

- দিচ্ছে- দিছে (ক্রিয়াপদ) (পৃ- ৬০)
- লেগে- লাইগা (ক্রিয়াপদ)
- পোড়ে- পোড়ায় (ক্রিয়াপদ)

‘কুবের বলিল গাও লাগাও বাই, জোরে খ্যাপ মার।’ (পৃ- ৭৭)

- লাগিয়ে- লাগাও (ক্রিয়াপদ)

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য বিশেষণ

‘দাড়া ফুলেরে আগে দেইখ্যা লই। বড় রঙ্গিলা ফুল। কিন্তু চিনতে পারলামনা। এই মাইয়ারে জিগা ইটা কি ফুল কইয়্যা যাক।’ (পৃ- ৪৫)

রাঙা/লাল ফুল- রঙ্গিলা ফুল

- রঙ্গিলা- বিশেষণ
- ফুল- বিশেষ্য।

‘নইদার পুতে কি কয়! আমার মাথায় শোলার মুটুক উঠল না, আর লাগি কি তোর মাথা নুয়ান লাগছে দশজনের বৈঠকে?’ (পৃ- ১০২)

- শোলার মুটুক- বিশেষণ- শোলা
- বিশেষ্য- মুকুট।

‘তার অন্যমকস্কতাকে নির্মমভাবে আঘাত দিল মঙ্গলার বউকি গ বিন্দাবনের নারী, কোন কালো চোরা লড়দা গেছে মাইরা বাঁশের বাড়ি।’ (পৃ- ১১৫)

- বিশেষণ- বাঁশের,
- বিশেষ্য- বাড়ি

‘মনে লয় পোড়া কাঠ মাথায় মাইরা খেদেইয়া দেয়, পোড়ামুখি মাইয়া আমার কাল করছে।’ (পৃ- ১৫০)

- পোড়ামুখি

  বিশেষণ- পোড়া

  বিশেষ্য- মুখ।

‘এখন আর কিছু করলাম না। দিমু খেদাইয়া একদিন চেলাকাঠ পিঠে মাইরা।’ (পৃ-১৫০)

- চেলাকাঠ

  বিশেষণ- চেলা

  বিশেষ্য- কাঠ।

‘আমারে দিয়াদে দিদি, আমি খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া মানুষ করি পরে একদিন বেইমান পক্ষীর মতো উইড়া যাউক, আমারে কোনো দুখ নাই।’ (পৃ- ১৭৬)

- বেইমান পক্ষী

  বেইমান- বিশেষণ

  পক্ষী- বিশেষ্য।

‘না হইবে না, চরের মাইয়া আবার টাস- টাইস্যা কথা। খালি হইব না। তোমারে কইল কেডায়? কাদিরের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।’ (পৃ- ২০৬)

- টাস- টাইসা কথা : বিশেষ্য- কথা

  বিশেষণ- টাস-টাইসা।

- চোখ ছলছল : বিশেষ্য- চোখ

  বিশেষণ- ছলছল।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : ক্রিয়াপদ

‘কি খামু তবে’(পৃ : ১৩)

- খাওয়া- খামু (ক্রিয়াপদ)

‘করমালী বলে, বন্দালী ভাই, কইছ কথা মিছে না। তোমার আমার ঘরের মানুষ ... ফজরে উইঠা মুনিবের বাড়ি গিয়া ঘুমের অলস ভাঙ্গি।’(পৃ: ২১)

- বলা- কইছ (ক্রিয়াপদ)
- উঠে- উইঠা (ক্রিয়াপদ)
- ভেঙে- ভাঙ্গি (ক্রিয়াপদ)

‘সে তখন পরের বাড়ি কাঁথা সিলাই করে, আর সেই সূচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে।’ (পৃ: ২২)

- সেলাই- সিলাই (ক্রিয়াপদ)
- এসে- আইয়া (ক্রিয়াপদ)
- বেঁধে- বিন্ধে (ক্রিয়াপদ)

‘বাসন্তী তার মা বলল উঠানজোড়া আলিপনা আকুম; অ বাবা কিশোর, বাবা সুবল; তোর একটা ঘোড়া, আর কয়টা পক্ষী আইক্যা দেও।’ (পৃ: ২৮)

- আঁকা- আকুম (ক্রিয়াপদ)
- এঁকে- আইক্যা (ক্রিয়াপদ)
- দাও- দেও (ক্রিয়াপদ)

‘আর সুবলদাদা করল কি মাগ্‌গা মা, দুহাতে মাথাত্‌, তুইল্যা দৌড়।’ (পৃ: ৩০)

- তুলে- তুইল্যা (ক্রিয়াপদ)
- দৌড় (ক্রিয়াপদ)

‘বুড়ি বলে ‘অ মাইয়ারা মা, জোকার দেওনা।’(পৃ-২৯)

- দাওনা- দেওনা (ক্রিয়াপদ)

‘কিশোর বলিল ‘এই জাগাতই রাইত থাইক্যা যাইরে।’ (পৃ: ৩০)

- থেকে- থাইক্যা (ক্রিয়াপদ)

‘তা হইলে কি জাইন্যাশুইন্যা নগরবাসী এই গাঁও ঠিক করত?’ (পৃ: ৩১)

- জেনে শুনে- জাইন্যাশুইন্যা (ক্রিয়াপদ)

‘সুবলকেও সাহস দিল ‘না সুবলা, ডরাইসনা।’(পৃ- ৩২)

- ভায় না দেখানো- ডরাইসনা (ক্রিয়াপদ)

‘চিন নি তিলক, এটা কি গাঁও’ (পৃ-৩৩)

- চেন না- চিন নি (ক্রিয়াপদ)

‘ইখানেই নাও রাখ সুবলা, দুপুরের ভাত ইখানেই খাইয়া যায়।’ (পৃ-৩৩)

- খেয়ে- খাইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘না না আমরা নাওই রান্ধুম।’ (পৃ-৩৪)

- রাধব- রান্ধুম (ক্রিয়াপদ)

‘কিইরে সুবলা কি করবে কর। নাও ভাসাইয়া দিমু। (পৃ-৩৫)

- ভেসে- ভাসাইয়া (ক্রিয়াপদ)
- দিমু- দিব (ক্রিয়াপদ)

‘আমরা ডরাইতাম সান্দিরা বাজাইত আর তামুক খাইত্।’ (পৃ- ৭৬)

- বাজাত- রাজাইত (ক্রিয়াপদ)

‘এই কামও কইর না বাহারুল্লা ভাই। জান থাকতে জমি ছাইড না।’ (পৃ-৯৩)

- কর না- কইর না (ক্রিয়াপদ)

‘তখন থাইক্যা তোরেও যেন ঈশ্বরে আঁটকুড়া বানাইয়া রাখে। (পৃ-১০২)

- থেকে- থাইক্যা (ক্রিয়াপদ)
- বানিয়ে- বানাইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘অনন্তকে লইয়া পড়িল, কিরে গোলাম! বিয়া করবি? সে উত্তর দিল করমু।’ (পৃ- ১০৩)

- করব- করমু (ক্রিয়াপদ)

‘অ দিদি অ অনন্তের মা দেইখ্যা যাও তোমার অনন্তের কান্ড।’ (পৃ-১১০)

- দেখে- দেইখ্যা (ক্রিয়াপদ)

‘পরস্তাব শুনাইবে ত শুনাও ভনই।’ (পৃ- ১১৫)

- প্রস্তাব- পরস্তাব (ক্রিয়াপদ)
- শুনবে- শুনাইবে (ক্রিয়াপদ)

‘তুমি ভাইন আসল কথা শুনাই লা না চাইপা গেলা।’ (পৃ-১১৫)

- চেপে- চাইপা (ক্রিয়াপদ)

‘তুমি তখন বাইরে হইয়া যাও, আমার মাইয়ারে আমি সমঝামু।’

- বোঝাব- সমঝাবু (ক্রিয়াপদ)

‘তবু পুরুষ মানুষ থাইক্যা মনটাকে ফিরাইয়া রাখ। (পৃ-১২৬)

- থেকে- থাইক্যা (ক্রিয়াপদ)
- ফিরে- ফিরাইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘তারপর ডুবা নাও লাগাইয়া তোমারে ডাক দিমু।’ (পৃ- ১৩৬)

- দেওয়া- দিমু (ক্রিয়াপদ)

‘অ- বনমালী যেওৎখানে তাড়াতাড়ি বাইর কর। একটা আলুর নাও ডুবতাছে।’(পৃ-১৩৬)

- বওয়া- বাইর (ক্রিয়াপদ)
- ডুবছে- ডুবতাছে (ক্রিয়াপদ)

‘একবার ঘুইরা দেখি।’ (পৃ-১৪৬)

- ঘুরে- ঘুইরা (ক্রিয়াপদ)

‘নাওয়ে গিয়া থাইক্যা চুল কাটাইতে গেলাম।’ (পৃ-১৪৮)

- থেকে- থাইক্যা (ক্রিয়াপদ)
- কাটাতে- কাটাইতে (ক্রিয়াপদ)

‘সবচনীর পূজা করুম।’ (পৃ-১৫০)

- করব- করুম (ক্রিয়াপদ)

‘এখন আর কিছু করলাম না। দিমু খেদাইয়া একদিন চেলাকাঠ পিঠে মাইরা।’ (পৃ- ১৫০)

- তাড়িয়ে- খেদাইয়া (ক্রিয়াপদ)
- মেরে- মাইরা (ক্রিয়াপদ)

‘তাহলে তোর মা কাউয়া হইয়ে আইয়ে?’ (পৃ-১৫১)

- এসে- আইয়ে (ক্রিয়াপদ)

‘একটা কলার খোল কাইট্যা আনতে পারলে না।’ (পৃ-১৫১)

- কেটে- কাইট্যা (ক্রিয়াপদ)

‘আর পিছনের দিকে চাসি না।’ (পৃ- ১৫৩)

- তাকানো- চাইস (ক্রিয়াপদ)

‘এখন কানে ধইরা তুইল্য দিমু ছাইড়া- আপদ যাইব।’ (পৃ- ১৫৩)

- ধরে- ধইরা (ক্রিয়াপদ)
- তুলে- তুইল্যা (ক্রিয়াপদ)
- দেব- দিমু (ক্রিয়াপদ)

‘এদ্দিন পালালি লালালি খাওয়াইলি ধোয়াইলি?’ (পৃ- ১৬২)

- পালন করা- পালালি (ক্রিয়াপদ)
- লালন করা- লালালি (ক্রিয়াপদ)
- খাওয়ালি- খাওয়াইলি (ক্রিয়াপদ)

‘বাইর কইরা দিল; আর ডাইক্যা ঘরে নিল না?’ (পৃ- ১৮৯)

- ডেকে- ডাইক্যা (ক্রিয়াপদ)

‘এইবার হাঁইট্যা দেখ।’ (পৃ- ১৯৪)

- হেঁটে- হাঁইট্যা (ক্রিয়াপদ)

‘তার চোখে চোখ রাইক্যা জিগমু।’ (পৃ- ২০০)

- রেখে- রাইক্যা (ক্রিয়াপদ)
- জিজ্ঞেস করব- জিগমু (ক্রিয়াপদ)

‘নে, নাও বানা ঘর বানা, পানিতে ফালাইয়্যা দে। জা খুশি কর।’(পৃ- ২০৩)

- ফেলে- ফালাইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘নেউক হক্কা নেউক’ (পৃ: ২৪৯)

- নেওয়া- নেউক (ক্রিয়াপদ)

‘তোর বাপ কইসে। কোটত শেয়াল খাগের বেটা। শালো ছাগির ছোয়া।’(পৃ- ৪৫)

শোয়ালখাগের বেটা - শেয়াল খেগোর বেটা

- বিশেষ্য- বেটা
- বিশেষণ- শেয়ালখাগের

‘গয়ানাথ পেছন থেকে বনমোরগের চিৎকার করে ওঠে ‘শালো মুই হাল দিছু, আর তুই বেটার-ঘর ভটভটাছিস, শালো,’ (পৃ- ৪৫)

- বিশেষ্য- বেটার ঘর
- বিশেষণ- ভটভটাছিস

‘শালো ছাগির বেটা, যা কেনে তুই হালার ধর মুই না যাও জরিপের পাখে,’ (পৃ- ৪৫)

- ছাগির বেটা- ছাগলের বেটা
- বিশেষ্য- বেটা
- বিশেষণ- ছাগির

‘মুই না চাও পালটিয়া গান। নামের পালাটিয়াখান ঢলঢলাছে খলখলাছে। মোক একখান মানষির নাম দেন।’

- বিশেষণ- ঢলঢলাছে, খলখলাছে।

‘মুইত কহিছু বাপবক, তোমার কি এ্যালায় লুকি থাকিবার বয়স।’ (পৃ- ৩৬২)

- বলছ- কহিছু (ক্রিয়াপদ)
- লুকিয়ে- লুকি
- থাকবার- থাকিবার।

'লে লে তু আঁখ বুজা কর।' (পৃ- ২২)

- বন্ধ কর- বুজা কর (ক্রিয়াপদ)

'হুজুর মুই ফরেস্টচন্দ্র আসি গেইছি।' (পৃ- ৩৮)

- এসে- আসি (ক্রিয়াপদ)
- গেছি- গেইছি (ক্রিয়াপদ)

'নো নো কাঠ ভাসি যাছে, কাঠখানা ভাসি গেলাক আর তঁয় কইয়ে ভাসি আইলক।' (পৃ- ৬৫)

- ভেসে যাচ্ছে- ভাসি যাচ্ছে (ক্রিয়াপদ)
- এল- আইলক (ক্রিয়াপদ)

'সে জোতদার টোতদার নিয্যা যা কওয়ার বাও।'

- নিয়ে- নিয্যা (ক্রিয়াপদ)
- বলার- কওয়ার (ক্রিয়াপদ)
- বল- কও (ক্রিয়াপদ)

'কহেন আপনারা এইঠে কি চাটিবার ধইচছি আমি?'

- চাটবার- চাটিবার (ক্রিয়াপদ)
- ধরেছি- ধইচছি (ক্রিয়াপদ)

'কমরেড তোঁহাক জমিত যাবার কইসে কেন? কুনো গোলমাল বাধি গেইল।'

- বলছে- কইসে (ক্রিয়াপদ)

‘এককেবারে বইঠকে বইঠকে বাতচিত? খাড়কে খাড়কে না?’

- বসে বসে- বইঠকে বইঠকে (ক্রিয়াপদ)
- দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে- খাড়কে খাড়কে (ক্রিয়াপদ)

‘হৃষীকেশ বলে হালায় আর সিগারেট ফুঁকাইতে হবে না।’

- ফুঁকতে- ফুঁকাইতে (ক্রিয়াপদ)

‘মুইএ্যানং কান্দিবার ধরিছু যে জঙ্গলের গাছঠে পাখি উড়ে জেইসে।’

- কাঁদবার- কান্দিবার (ক্রিয়াপদ)
- ধরছে- ধরিছু (ক্রিয়াপদ)

‘আর মুইত এক বাঘারুক নামিবার কইচছি।’ (পৃ- ৬৪)

- নামবার- নামিবার (ক্রিয়াপদ)
- বলছি- কইচছি (ক্রিয়াপদ)

‘হ্যাঁ, ঐসব বলো সাহা ফরেস্ট বলো, জোতদার বলো চরফর তুইলব্যা না। শালা তোমায় কৃষক সমিতি করা চইলবে না।’

- তুলব- তুইলব্যা (ক্রিয়াপদ)
- চলবে না- চইলবেনা (ক্রিয়াপদ)

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য, বিশেষণ

পানতাবুড়ি বলে উঠল কী সোন্দর নাচ্‌রে বাপ পোয়া ইবার।’ (পৃ-৯)

- সুন্দর নাচ- সোন্দর নাচ
- বিশেষ্য- নাচ,
- বিশেষণ- সোন্দর।

‘ভুবনেশ্বরী, গঙ্গাপদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে।’ (পৃ- ১১)

- ফিসফিস- বিশেষণ।

‘হরিবন্ধু দেখল তার পুত্রবধূরে চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।’ (পৃ- ২৯)

- চোখ- বিশেষ্য,
- আগুন- বিশেষণ।

‘নদীর দিকে তাকিয়ে মাগইন্যা ভাবতে লাগল- নারীর রূপ নারিকেলের মালার মত।’ (পৃ- ৩৪)

- বিশেষ্য- নারীর রূপ,
- বিশেষণ- নারিকেলের মালার মত।

‘চিন্তিত কণ্ঠে বলে পূর্ণচন্দ্র।’ (পৃ- ৪৭)

- চিন্তিত কণ্ঠে- বিশেষ্য।

‘চোখগুলো টকটকে লাল ঘরের মধ্যে হরিবন্ধু বলল। অমা, তুঁই আইস্যোনা? (পৃ- ৫১)

- টকটকে- লাল- বিশেষ্য- লাল,
  বিশেষণ- টকটকে।

‘পানির রঙ দেইখ্যস্নি। ঘোলা এই ঘোলা পানি ইলিশর পানি। (পৃ-৭৪)

- পানির রঙ- জলের রং
- বিশেষ্য- পানি,
- বিশেষণ- রং।
- ইলিশর পানি
- বিশেষ্য- পানি,
- বিশেষণ- ইলিশর।

‘ওম ঈশ্বর আঁরে কি গইল্য, আঁর পেয়ার মাথা ফাডি দরদর গরি রক্ত পড়ে রে ভগবান।’ (পৃ- ৭৫)

- বিশেষণ- দরদর গরি (দরদর করে)
- বিশেষ্য- রক্ত পড়ে।

‘দুধের মাইয়ারে এই রমম্যা চোয়ার মল্লি?’ (পৃ- ৭৭)

- বিশেষ্য- মাইয়া (মেয়ে)
- বিশেষণ- দুধের।

‘বদ্দারের, রাশির মাথা কোঁরত বাঁধি ফেলাও।’ (পৃ- ৭৮)

- বিশেষ্য- মাথা,
- বিশেষণ- রাশির।

‘আঁই এই বুড়ো শরীল লইতো আর নো পারিব।’ (পৃ- ৭৮)

- বিশেষ্য- শরীল (শরীর)
- বিশেষণ- বুড়ো।

‘বদ্দা, আঁবার সোনার সংসার গিন নো ভাইঙ্গো।’ (পৃ- ৮২)

- বিশেষ্য- সংসার,
- বিশেষণ- সোনার।

‘ছাই মাখি তোঁয়ার হেই সুখের মুখত।’ (পৃ- ৮৩)

- বিশেষ্য- মুকত (মুখ)
- বিশেষণ- সুখের।

‘অশিক্ষিত মাইয়ারা লগে কী কথা?’ (পৃ- ৮৩)

- বিশেষ্য- মাইয়ারা (মেয়েরা)
- বিশেষণ- অশিক্ষিত।

‘খাই খাই ধুমচি হইচ।’ (পৃ- ৮৩)

- ধুমচি হইচ- মোটা হয়েছ
- বিশেষ্য- হইচ,
- বিশেষণ- ধুমচি।

‘কী চেঁডর মাস্টার- চাপাস্বরে বলে উঠল সে।’ (পৃ- ৮৩)

- চেঁডর মাস্টার
- বিশেষ্য- চেঁডর,
- বিশেষণ- মাস্টার।

‘আঁই কি মিছা কথা কইয়ে না? তোরার মতে গরিব। মাইনষরকি খাইয়েবে আর কী লাভ ক? নরকের ডর নাই? (পৃ- ৮১)

- বিশেষ্য- ডর (ভয়),
- বিশেষণ- নরকের।

‘সংসারগান কি রইম্যা ভাঙি গেল গই।’ (পৃ- ৮৬)

- বিশেষ্য- গান,
- বিশেষণ- সংসার।

‘তারপর এই কানাবউ আইয়েরে জুটিল।’ (পৃ- ৮৯)

- বিশেষ্য- বউ,
- বিশেষণ- কানা।

‘ভুবন দরদি কণ্ঠে বলল, নো ভাইঙ্গো।’ (পৃ- ৯৩)

- বিশেষ্য- কণ্ঠ,
- বিশেষণ- দরদি।

‘টকটইক্যালাল খর বাইয় নাদির খাইলে।’

- টকটইক্যা লাল- টকটকে লাল।
- বিশেষ্য- টকটইক্যা,
- বিশেষণ- লাল।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : ক্রিয়াপদ

‘মা ঘরত যাইতো নো।’ (পৃ- ৭)

- যেতো- যাইতো (ক্রিয়াপদ)

‘চন্দ্রমণি আইজা নো আইয়ে বউ’ (পৃ-৮)

- আসেনি- নো আইয়ে (ক্রিয়াপদ)

‘পানতাবুড়ি বলে উঠল ‘কী সোন্দর নচরে বাপ পোয়া ইবার নাচ দেই এই বয়সতও বুকগান খালি খালি লা আর।’ (পৃ- ১১)

- এবার- ইবার (ক্রিয়াপদ)
- নাচরে (ক্রিয়াপদ)

‘বহদ্দারকে জিজ্ঞাস করল; এই মাছ উনর দাম কত দত্তন পড়িবো বহদ্দার (পৃ- ১৭)

- দাও- দাওন (ক্রিয়াপদ)

‘তোঁয়াত্তোন এই টিয়া ফেরত দত্তন পাইতো না। শুধু আর মিক্কে ইক্কিনি চাইবা, লোভী চোখ কথাগুলো বলে বিজ।’ (পৃ- ১৮)

- পারতনা- পইত্তোনা (ক্রিয়াপদ)
- চাইব- চাইবা (ক্রিয়াপদ)

‘ভুবন বলল, তোঁয়ার আশিব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যা ইক্কিনি আর পোয়ারে পরানখুলি আশিব্বাদ গইজ্যে। যে এন লেয়াপড়া গড়িত পারে।’ (পৃ- ২৭)

- উঠে- উইঠ্যে (ক্রিয়াপদ)
- করা- গইজ্যে (ক্রিয়াপদ)
- লেখাপড়া- লেয়াপড়া (ক্রিয়াপদ)
- করিত- গরিত (ক্রিয়াপদ)

‘আ আজি তোঁয়ারে এক্কান কথা কইতাম।’ (পৃ- ৩১)

- বলতাম- কইতাম (ক্রিয়াপদ)

‘আঁই কি তোঁয়ারে বাঁধা দিয়্যম না? কোনোদিন বাধা দিনা? কঁত্তে আনিবার।’ (পৃ- ৩২)

- দিতাম- দিয়্যম (ক্রিয়াপদ)
- আনবার- আনিবার (ক্রিয়াপদ)
- দিই না- দিনা (ক্রিয়াপদ)
- করতে- কঁত্তে (ক্রিয়াপদ)

‘মানত উইঠ্যা বাধা দিয়্যম না? কোনোদিন বাধা দিনা কঁত্তে আনিবার ছাড়া আইনতো যাইবো।’ (পৃ- ৩২)

- উঠে- উইঠ্যা (ক্রিয়াপদ)
- দিয়্যম- দেব না (ক্রিয়াপদ)
- আনতে যাব- আইনতো যাইবো (ক্রিয়াপদ)

‘আঁই ভুবনেশ্বরী মামীর ভাইনা। তাঁই আঁরে কুসুমিয়ে নাইয়র লই যাইবার লাই ডিডায়েদে।’ (পৃ-৩৩)

- যাবার জন্য- যাইবারলাই (ক্রিয়াপদ)

‘তোঁয়ারে তো নো চিনিলাম’ (পৃ- ৩৩)

- চিনলাম- চিনিলাম (ক্রিয়াপদ)

‘অবা। তুঁই ভিতর আই বইও। এই রাইতত্ কত্তে যাইবা। কিন্তু বাআজি বঅর গরিব মানুষ তোঁয়ারেরে কী খাইতাম দয়্যম বুঝিত নো পারিব। (পৃ- ৩৪)

- বহন করা- বইও (ক্রিয়াপদ)
- খেতাম- খাইতাম (ক্রিয়াপদ)
- দিতাম- দিয়্যম (ক্রিয়াপদ)

‘আজিয়া দইজ্যার অবস্থা দেইখ্যনি?’(পৃ-৪৭)

- দেখনি- দেইখ্যনি (ক্রিয়াপদ)

‘ডরাওনা? নো ডরাইস। মা গঙ্গা আছে। কিছু নো আইবো বগ্ত সাহস রাখ।’ (পৃ-৪৮)

- ভয় পাওয়া- ডরাইস (ক্রিয়াপদ)
- আসবো- আইবো (ক্রিয়াপদ)

‘বা আজি, তুঁই ইক্কিনি ধইজ্যা ধরি থাকো।’(পৃ-৫১)

- ধজ্য- ধইজ্যা (ক্রিয়াপদ)

‘গঙ্গার মা তোঁয়ার লগে কথা কইতো চাআর।’ (পৃ-৫৭)

- তোমার- তোঁয়ার (ক্রিয়াপদ)
- সাথে- লগে (ক্রিয়াপদ)
- চাই- চাআর (ক্রিয়াপদ)

‘ধনবাইশ্যার বাপ আঁরঅ খালি ভিঁডাগিন দখল গরি ঘর বাঁধি ফেইল্যে।’

- ফেলল- ফেইল্যে (ক্রিয়াপদ)

‘এই ঘইজ্যা গরি রাইখ্যাম’ (পৃ-৫৯)

- রাখতাম- রাইখ্যাম (ক্রিয়াপদ)

‘ইয়ানো আঁবার কোয়ালত আছিল; ভাদাইম্যার লগে অঁর মাইয়ার বিয়া দত্তন পড়িবো।’(পৃ-৬০)

- ছিল- আছিল (ক্রিয়াপদ)
- দেত্তা- দত্তন (ক্রিয়াপদ)
- পড়ব- পড়িব (ক্রিয়াপদ)

‘ওই ডু-নি হারামজাদা। খাড়াইতাম কইদ্যে নো ফুনআর।’ (পৃ-৬৪)

- দাঁড়াতাম- খাড়াইতাম (ক্রিয়াপদ)

‘তোঁয়ার কষ্ট আঁই আর সহ্য গরিত নো পারিব।’ (পৃ-৬৫)

- করিত- গরিত (ক্রিয়াপদ)

‘মামী কষ্টে সিস্টে রাতগান, কাডাও দাও।’ (পৃ- ৬৭)

- কাটিয়ে দাও- কাডাও দাও (ক্রিয়াপদ)

‘আঁবার পোয়াঅল লেয়াপড়া শিখিবো, নিজের নাম লেইত পারিব।’

- লেখাপড়া- লেয়াপড়া (ক্রিয়াপদ)
- শিখবো- শিখিবো (ক্রিয়াপদ)
- লিখতে- লেইত (ক্রিয়াপদ)

‘বদ্দারে, রশির মাথা কোঁরত বাঁধি ফেলাও।’ (পৃ-৭৮)

- ফেল- ফেলাও (ক্রিয়াপদ)

‘আঁাই যায় না বউত কাম। জাইল্যা অলরে জাগান পড়িবো। অশিক্ষার ঘুমঅত্তোন জাগান পড়িবো।’(পৃ-৭২)

- জাগাতে- জাগান (ক্রিয়াপদ)
- পাড়বো- পড়িবো (ক্রিয়াপদ)

‘পানির রঙ দেইখ্যাসনি। ঘোলা এই পানি ইলিশর পানি।’ (পৃ- ৭৪)

- দেখিসনি- দেইখ্যাসনি (ক্রিয়াপদ)

‘খোদার কআর নামি আইয়ক এবার উঅর। আঁর জামাইর হাত যে এন গরি ভাঙি দিএ, হিতার পোয়া ঈশ্বরে কড়ি লউক।’

- ভেঙে দে- ভাঙি দিএ (ক্রিয়াপদ)
- নেওয়া- লউক (ক্রিয়াপদ)

‘মা আঁই কে এড়া খাইয়্যম।’

- খেতাম- খাইয়্যম (ক্রিয়াপদ)

‘ভুবন বলল কীত্তম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জাগা নো দিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলাইবো।’

- ফেলিব- ফেলাইবো (ক্রিয়াপদ)

‘গঙ্গা চোর বদ্দার কান চেপে ধরলে সে বলে, আঁর বাপ জাল বুনিবার লাই আন্যিদ। (পৃ-৭৭)

- বুনবার জন্য- বুনিবার লাই (ক্রিয়াপদ)

‘বদ্দারে, রশির মাথা কোঁরত বাঁধি ফেলাও।’(পৃ- ৭৮)

- ফেল- ফেলাও (ক্রিয়াপদ)

‘অ-রামপদ, জলত যাচেনা।’(পৃ- ৭৮)

- যায় না- যাচেনা (ক্রিয়াপদ)

‘সিয়ান গরি আয়, রামু, খাওনর সময় আইয়ে,’ (পৃ-৭৯)

- স্নান করি- সিয়ান গরি (ক্রিয়াপদ)

‘আঁই দইজ্যত যাইতাম নো।’ (পৃ-৭৯)

- যেতাম না- যাইতাম নো

‘শব্দউয়া কইতে ইক্কিনি গলা নো কাঁপিল না?’ (পৃ-৮০)

- কাঁপল না- কাঁপিল না

‘বদ্দা, আঁবার সোনার সংসারগিন নো ভাইঙ্গো, তোঁয়ার পা আত পড়ি। তুঁই আঁরারে ছাড়ি নো যাইও।’ (পৃ-৮২)

- ভাঙো- ভাইঙ্গো
- যেওনা- নো যাইও

‘এই রকম হড়াই চইলব নি কাউগা টিয়া কামাই অয় এতে।’(পৃ-৮৩)

- চলবে না- চইলব নি

‘সম্মান ধুই ধুই হানি খাইয়্যাম নি।’ (পৃ-৮৩)

- আনি- হানি
- খায়নি- খাইয়্যাম নি

‘অশিক্ষিত মাইয়ার লগে কী কথা? সম্মানের দাম তুই কি বুইঝবা। খাই খাই ধুমচি হইচ।’ (পৃ-৮৩)

- মোটা হয়েছ- ধুমচি হইচ

‘কী চেঁড়র মাস্টার চাপাস্বরে বলে উঠল সে।’ (পৃ- ৮৩)

- চাপাস্বরে

‘তোঁয়ার হিসাবত গন্ডোগোল আছে।’ (পৃ- ৮৪)

- হিসাব- হিসাবত

‘বেবসা ছাড়ি দত্তন পড়িবো।’ (পৃ- ৮৫)

- পড়ব- পড়িবো

‘মাইনষে রাইলো আবার সংসার গর জয়ন্ত। কিন্তু সংসারে মন নো বইয়ে। মাঝে মধ্যেই কইলজাডা মোচড় দিউড়ে।’ (পৃ- ৮৯)

- সংসার কর- সংসার গর
- মোচড় দিচ্ছে- মোচড় দিউড়ে

‘রাখো তোঁয়ার শরম।’ (পৃ- ৮৯)

- লজ্জা- শরম

‘আজিয়া যে কাম গরি দেখাইও তুঁই গঙ্গা তোঁয়ারে নমস্কার গইত্যে ইচ্ছা গরের।’

- ইচ্ছা করে- ইচ্ছা গরের (ক্রিয়াপদ)
- করতে- গইত্যে

‘বুইঝ্যোনি তোঁয়ারা।’ (পৃ- ১১৫)

- বোঝনি- বুইঝ্যোনি

তথ্যসূত্র

চক্রবর্তী, বামনদেব, ‘‘উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, বর্ণপরিচয়’’ অস্থায়ী কলেজ ষ্ট্রীট পুরবাজার কে ৩/৬ মার্কস, স্কোয়ার, উদ্যান, প্রথম, প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ : ৮৯-৯২, ১৭৭-২১৫.

পঞ্চম অধ্যায়

সংলাপে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ : তার তালিকা ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ

মূল গবেষণার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ''বাংলা কথাসাহিত্যে অপ্রমিত শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগকৌশল নির্বাচিত : নির্বাচিত চারটি উপন্যাস'' এর মধ্যে আমার আলোচ্য বিষয় আটটি অধ্যয়ের মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়টি। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ : তার তালিকা প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ'। এঅধ্যায়ে দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৪-১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৮), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) ও হরিশঙ্কর জলদাসের 'জলপুত্র' (২০১২) এই চারটি উপন্যাসে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ ও প্রাসঙ্গিকতা।

বাংলা শব্দভান্ডার হল বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার যার মূল এবং আদি উৎস পালি এবং প্রাকৃত ভাষা দ্বারা, বাংলা ভাষাতে পরের কালে ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দরূপ ও পুনঃঋণশব্দ গ্রহণ করা হয়েছে, বিভিন্ন ভাষার সংপর্শে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে থেকে তাই বাংলার শব্দভান্ডার বর্তমানে অসংখ্য শব্দসম্বৃদ্ধ ও বিচিত্র। বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ও নানান ভাষার সংস্পর্শে এর শব্দভান্ডার বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলমান শাসন পত্তনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এল ইংরেজি। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বহুশব্দ বাংলা ভাষাতে প্রবেশ লাভ করে।

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলাতে এসে স্থান নিয়েছে, এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ, এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি ফারসি ও ইংরাজি শব্দ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিদেশী এদেশের ভাষাতে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফার্সি, তুর্কি এই সব ভাষারও কিছু শব্দ বাংলা ভাষাতে এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী মায়ানমার, চীন, জাপান থেকেও কিছু শব্দ আমাদের ভাষাতেও প্রচলিত রয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

এই উপন্যাসে আরবি, ফারসি, হিন্দি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে তা কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করা যাক -

'শ্যাষ রাতে তর বউ খালাস হইছে কুবির ...' (পৃ- ১৫)

- খালাস- শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : ধনঞ্জয় নৌকা থেকে নেমেছিল কারণ পাশের বসত বাড়িতে তার কী প্রয়োজন ছিল। সে গনেশের বাড়িটা আগে পড়ে। সে বাড়ি ঢুকল না। অসুস্থ কুবেরের সাথে এগিয়ে চলল। সেই সময় নকুলদাস তার ঘরের দাওয়ায় বসে থেকে তামাক খাচ্ছিল। কিবেরকে দেখে সে কুবেরকে ডেকে বলে, তোর বাড়িতে গিয়ে দেখ কী কান্ড হয়েছে। একথা শুনে কুবের উদ্‌গ্রিব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে নকুল তাকে জানাই তার বউয়ের বাচ্ছা হয়েছে। একথা শুনে কুবের বলে নয় মাস গিয়ে কটা দিন গেছে, এটা কী করে সম্ভব। একথা প্রসঙ্গে নকুলের সংলাপে 'খালাস' শব্দটি উচ্চারণ করেছে।

'গণেশ ক্ষুন্ন হইয়া বলিল, তুই নি গোসা করস কুবির করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?'

- গোসা- রাগ অর্থে। এটি আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : নকুল, কুবেরকে জানাই তার স্ত্রীর মালার রাজপুত্তের মতো ছেলে হয়েছে। গোরা, উজ্জল বর্ণ। কুবেরের চোখ দুটো একথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নকুল শয়তানির হাসি হেসে কুবেরকে বলে গোরাচাঁদ এল কোথা থেকে। ঘরে তো থাক না কুবের কিছু বলা যায় না। ছেলে হয়েছে একথা শুনে গণেশ খুব খুশি হলেও কুবের তাকে চুপ করিয়ে দেয়। বলে ছেলে দিয়ে করব কী? নিজের খাওয়া জোটে না। একথা প্রসঙ্গে গোসা শব্দটি গণেশের সংলাপে উঠে এসেছে।

'হ, বউ তো গোরাই, হ?' (পৃ- ১৫)

- গোরা- হিন্দি শব্দ

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : নকুল কুবের কে জানাই যে, তার ছেলে হয়েছে এবং রাজপুত্তুরের মতো উজ্জ্বল চাঁদবর্ণ তার রূপ, নকুল শয়তানির হাসি হেসে জানাই তুই তো কালাকুষ্ঠি কুবের গোরাচাঁদ এল কোথা থেকে? ঘরে তো রাতে থাকিস না। কিছু বলা যায় না, নকুলের একথা শুনে গনেশ জানাই 'বউ গোরা না নকুলদা'।

'গোপি বলল, বাই উ ওই, বাবুগোর পোলা নাখান ধলা হইছে বাবা নকুইলার মাইয়া পাঁচি কি কইলা গেল শুনবো? সায়েবগো এমন হয় না। না পিসি?'

- সাহেব- সায়েব (আরবি শব্দের প্রয়োগ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গোপি তার পিতা কুবেরকে জানাই নকুলের মেয়ে পাঁচি বলে গেছে সায়েবদের নাকি এমন হয়। নকুল তাকে বলে গেছে রাত করে মেজবাবু তাদের বাড়িতে আছে। গোপি তার পিতাকে জানাই এবার যদি জিগেস করে একদাল পাঁক ছুঁড়ে দেব তার মুখে।

'গরিব বইলা দুর্গা চাল কর্জনা দেওনের মতো গরিব আমি না, জাই না থুইস!' (পৃ- ২১)

- গরিব- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গনেশ কুবেরকে জানাই কাল ঘরে ফিরলে তার বউ তাকে জানাই চাল বাড়ন্ত। গণেশ তার বউকে বলে হীরুজ্যাঠার থেকে কিছু চাল ধার আনতে । কিন্তু জ্যাঠা তাকে ফিরিয়ে দেয় বলে বৃহস্পতিবারে চাল ধার দেওয়া যাবে না, একথাতে কুবের অবাক হয়ে যায় আর বলে তোর নিজের জ্যাঠা না? সে আরো বলে তির বউকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারতিস। একথা শুনে কুবের তার সংলাপে গরিব শব্দটি উল্লেখ করেছে।

'মালা আপশোশ করিয়া বলিল, কবে গেল?' (পৃ- ৩২)

- আপসোস- ফার্সি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বৃষ্টির দিনে মালা ও কুবেরের ঘর দিয়ে জল পড়ে। চালের ছন পেতে দেওয়া হয়েছে মালার বিছানার তলায়। ছন বার করার জন্য কুবের হোসেন মিয়ার কথা ভাবে তারপর তার এটাও মনে পড়ে হোসেন মিয়া নেই কলকাতা গেছে। একথা শুনে মালা বলে আগে একবার বললে এক পয়সার একটা মুই আনতে বলতাম।

'পিছে বইলা ক্যান কুবের বাই? আগাইয়া বও। খানাপিনা হয় নাই।' (পৃ- ৩৩)

- খানাপিনা- হিন্দি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : কুবের নৌকাতে উঠে আশ্চর্য হয়ে উঠল আমিনুদ্দিকে দেখে। আমিনুদ্দি আজ এক বিশিষ্ট্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। হোসেন মিয়ার দিকে সে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে আমিনুদ্দির দিকে। আমিনুদ্দির অস্বস্থি ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জহরের মধ্যস্থতায় অনেকবার বিবাদ মিটলেও মনে মনে আমিনুদ্দির উপর কুবেরের রাগ ছিল।

'... যখন পারব দিবা- না দিলি মামলা করুম না বাই! ...' (পৃ- ৫৮)

- মামলা- আরবি শব্দ

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : ভাদ্রের পরে আশ্বিন মাসে প্রবল ঝড় হয়ে গেল গ্রামের কিছু মানুষের ঘর পড়ে গেল। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি হল আমিনুদ্দির। প্রকান্ড একটা সিঁদুরের আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়ে পড়ে আমিনুদ্দির বউ আর ছেলেমেয়ে তিনটে ছিল, সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এই ক্ষয়ক্ষতির পর সকলেই হোসেন মিয়ার সাহায্য গ্রহণ করল। সকলের আগে কুবেরের ঘরটা উঠল। এদিকে ঝড়েতে গোপির পায়ে চোট লাগে একটা কাঠের টুকরো তার পায়ে ঢুকে যায়। এই পরিস্থিতিতে কুবেরকে একুশটাকা দশ আনার একটা খতে টিপ ছাপ দিতে হয়। এপ্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

‘বলে, কুবের বাই দাও। আরে হোই আমিনুদ্দি সামাল সে, পোলাপানের পারা কাইজ্যা করস,
তগর শরম নাই?’

- শরম- লজ্জা।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হোসেন মিয়া ঘরের মধ্যে যে সভা বসিয়েছিল সেখানে সবাই জমায়েত হয়। কুবের সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের পরিবেশ ও হোসেনের কথা শোনে।

‘আমিনুদ্দির চোখ ছলছল করে। সে বলে, আল্লা জানে মিয়া আর ফির‍্যা আমুনা ভাবিলে মনডা পোড়ায়।’ (পৃ- ৮৪)

- আল্লা- শব্দটি আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হোসেন মিয়ার নৌকা আসলে তাতে ছইয়ের মধ্যে নছিবন ও রাসুলের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর থেকে তাকাতে লাগল আমিনুদ্দিন তাদের মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা জানাই বাহাল তবিয়তে ঘরের কাজ করতে দেখে এসেছে তারা। দুশমন বলে গাল দিয়ে হোসেনকে নাকি কড়া কড়া কথা বলেছে অনেক। একথা শুনে আমিনুদ্দিনের চোখ ছলছল করে।

‘ক জানো মিয়া কলের জাহাজ হলি, জানন কত জোর চলতেছি ...’ (পৃ- ৮৭)

- জাহাজ- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হোসেন মিয়ার নৌকাতে যখন অনেকেই ময়নাদ্বীপ পাড়ি দিচ্ছিল। হোসেন মিয়া তাদের নাবিক দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাঁর নৌকা পরিচালনা দেখে তা বোঝা যায়। সামনে একটা কম্পাস ধরে সে হাল ধরে বসে। নৌকার ছজন মাঝি দাঁড় দানতে থাকে। সারাদিন পর রক্তিম সূর্য সমুদ্রের জলে ডুবে গেলে। পূর্বে বহু দূরে কালো কিছুর মতো একটা দ্বীপ ছাড়া সূর্য শুধু দেখিয়ে গেল আকাশ ও জলরাশি। রাত্রেও দাঁড় টানার বিরাম রইলনা দুজন দুজন মাঝিকে দুঘন্টা করে বিশ্রামের জন্য দেওয়া হল। সকালে চারিদিকে কুয়াশা। তারা দেখল ধনমানিক দ্বীপের কাছে এসে পড়েছে তারা। দ্বীপটির অবস্থান দেখে ঠিক করা যাবে বাবনাবাদদ্বীপের সঙ্গে এর যোগরেখা। কম্পাসের উপর নির্ভর করে চলবে ময়াদ্বীপের উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ‘জাহাজ’ শব্দটি পাওয়া যায়।

‘... দাড়িতে হাত বুলায় হোসেন সকলকে অভয় দিয়া আবার বলে, ডরাইও না, দশ বাজলি
কুয়াশা থাকবো না।’

- ভয়কর না- ডরাইও না (হিন্দি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : ময়নাদ্বীপে পাড়ি দেওয়ার কালে কুয়াশাতে আচ্ছন্ন চারিদিকের পরিবেশ দেখে হোসেনমিয়া একথা নৌকায় অবস্থিত লোকজনদের সম্পর্কে বলেছিল।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রন

এই উপন্যাসে আরবি, ফারসি, হিন্দি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে তা কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করা যাক -

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে দেখা যায় সংলাপে অন্যভাষার প্রয়োগ রয়েছে। কোথায় হিন্দি, আরবী বা ফরসি, ইংরাজী, এমন অনেক ধরনের আগত শব্দের মিশ্রণ রয়েছে। এই উপন্যাসের সংলাপে আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা দেখানো যাক। আর কী প্রসঙ্গে সংলাপগুলি এসেছে সে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা যাক।

‘তিলক ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল ‘হ শিক্ষিত হইলে শাদি সম্বন্ধ করব কিনা।’ (পৃ- ৩০)

- শাদি- শব্দটি হিন্দি শব্দ। যার অর্থ বিয়ে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : কিশোর সুবল ও তিলকচাঁদ তিনজন মিলে দাঁড় নৌকায় ছিল। সন্ধ্যা হলে ভৈরবের ঘাটে আসল তারা। এখানে কয়েকঘর মালো থাকে। আরো একটা বাঁক ঘোরার পর কিশোর একটা জায়গা দেখে ঠিক করল সেখানে রাত কাটাবার। মালোদের গ্রাম দেখা যায় মালোদের অনেক জায়গা রেলকোম্পানির হয়ে গেছে। এ গ্রামের মালোরা গরীব না। বড় নদীতে মাছ ধরে। সুবল জানাই এখানকার মালোরা জামা জুতো ভাড়া করে রেলকোম্পানির বাবুর বাসার কাছে বেড়ায়। আর বাবুরা মালোপাড়ার বসে তামাক টানে আর বলে ‘পোলাপান ইস্কুলে দেও শিক্ষিত হও; শিক্ষিত হও’। একথাতে তিলক ক্ষেপে উঠে উপরের সংলাপটি বলেছে। সেখানে হিন্দি শব্দ ‘শাদি কথাটি পাওয়া যায়।

‘সুবলাকেও সাহস দিল ‘না সুবলা ডরাইস্না।’ (পৃ- ৩২)

- ডরাইস্না- ভয় পাস না। (হিন্দি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : তিলকচাঁদ নৌকার দাঁড় টানছিল সে সময় কেউ একজন কিশোর আঘাত পায়। সুবল দাঁড় টানছিল। পার পারছিল না তার কিছুতেই। বৈঠার আওয়াজ বেসুরো ঠেকলে কিশোর মনকে প্রবোধ দিয়ে একথা বলে সুবলকে।

‘ছোট জাল্লা, তোমার ত খুবই সাইৎ। চল, মাছ ভাঙ্গিতে লইয়া যাই।’ (পৃ- ৪৪)

- জাল্লা- শব্দটি আরবী। কথাটার অর্থ মাছ বিশেষ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- পূর্বদিকে মোড়লদের পল্লী। গাছগাছালিতে ঢাকা উত্তর দিকে নদীটা বেঁকে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়েছে। দক্ষিণ দিকে নদী একেবারে তীরের মত সোজা যতদূর দেখা যায় জল আর জল। যতদূর দেখা যায় ধানগাছ। কিশোর, তিলককে

জানাই দাঁড় সাবধানে চালতে কারন তাতে ধানগাছ নষ্ট হতে পারে। নৌকা মাঝ নদীতে গেলে কিশোর জাল তুলতেই দেখল সরু সরু মাছ রূপোর মতো রঙ। মাছগুলো অনির্বাচনীয় ভঙ্গিতে নাচতে লাগল। মোড়ল আগেই ঘাটে বসেছিল প্রথম দিনের মাছ দেখে খুশি হল। মোড়লের মুখে 'জাল্লা শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে।

'খেলাতে দোলপূর্ণিমায় খুব আরব্বা হয়। মাইয়া লোক করতাল বাজাইয়া যা নাচে। নাচত না।
যেন পরীর মত নিত্য করে।' (পৃ- ৪৭)

- পরী- শব্দটি ফারসি শব্দ। যার অর্থ সুন্দরী পাখাওয়ালা নারী।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : চৈত্রের মাঝামাঝি। বসন্তের তখন পুরো যোবন। তখন দোল পূর্ণিমা। মানুষ নিজেকে জিনে রাঙায় তাতে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। তখন তার আত্মপর বিচার না করে সকলকে রাঙিয়ে আপন করে তোলে। তেমনি রাঙানোর ধুম পড়ে গেল শুকদেবপুরের খলাতে। তারা ঘটা করে দোল খেলবে। মোড়ল গায়ের রায়ত হিসাবে কিশোরও নিমন্ত্রিত হল। সেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোলি গানবাজনা রঙখেলা, খাওয়াদাওয়া হবে। উপরের কথাটি তিলক তাদের বলে এবং তিলকের কথা শুনে লোভ হয়। তিলকের কথাতে 'পরী' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

'... এই টেকা দিয়া তারা মালোপাড়ার যদি একটা ইস্কুল দিত।' (পৃ- ৯২)

- ইস্কুল- শব্দটি স্কুল, এখানে উচ্চারণে 'ই' স্বরবর্ণের আগম হয়ে শব্দটি ইস্কুল হয়েছে।
- ইস্কুল- স্কুল (ইংরাজী শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- ধান খুব ফলন হয়েছে। তাই তারা জারি গান গাইতে চাই। কিন্তু জারি ওস্তাদের খোঁজার সময় নেই। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রামপ্রসাদ উঠোনের দিকে একবার চায়। এ উঠানে কত জারি গান হয়েছে। মল্লুকের সেরা ওস্তাদ আনা হত। বাহারুল্লার গানগুলো কত ভালো লাগত। তার সুর তাদের মনে এখনো গেঁথে রয়েছে। জয়নালের কান্নাতে 'বিবিক্ষেত্র পত্র ঝরে'। বীররস ও করুণ রসের এমন গান শুনলে আর ওঠা যায় না। আবার সামনের অমাবস্যায় কালীপূজা। এবার তার গান দেবে আট পালা। মাতবর জানাই সে টাকাতে তারা যদি মালোপাড়াতে একটা স্কুল দিত।

'এই কামও কইর না বাহারুল্লা ভাই। জান থাকতে জমি ছাইড় না।' (পৃ- ৯৩)

- জমি- শব্দটি ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : একটা স্কুল করার কথা বললে বাহারুল্লা ভাই। কিন্তু উচিত কথা বললে মালোরা লাঠি মারতে চায়। বাহারুল্লা বলে মালোগুলো সুখে আছে। মরছি আমরা চাষারা পাট বেচবার সময় কিছু টাকা হয়। কিন্তু খানজার আর মহাজন সমলাতে সব শেষ। তোমাদের দয়াতে এখনো তার জমিতে হাত পড়ে না। পড়ে কি হবে বলা যায় না।

‘অ মাত্বর কতদিন পরে। আচ্ছা বারিন্দায় উঠ দেখ কি কান্ডখানা হইয়া আছে।’ (পৃ- ৯৪)

- বারিন্দায়- বারান্দায়। শব্দটি ফারসি থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বারান্দার ওপরে একপাশে চালের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছে কতগুলো এলোমেলো দড়ি। কয়েকটা ছেঁড়া জালের উপরে রামপ্রসাদ কুকুর কিন্ডলীর মতো শুয়েছিল। ধাঁ করে উঠানে নেমে রামপ্রসাদ সামনে দিয়ে ভৌতিক ক্ষিপ্রতায় তিন লাফে পার হয়ে গেল। পরনে একটা গামছা। মাথায় একবোঝা আলুথালু চুল। মুখ ভরতি দাড়ি। অস্বাভাবিক ফোলা তার শরীর, সে মাতবর কে দেখে একথা বলেছিল।

‘অনন্তকে লইয়া পড়িল,‘কিরে গোলাম। বিয়া করবি?’ (পৃ- ১০৩)

- গোলাম- শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গুরুদয়াল বাজারের ঘাটে গিয়ে বলে তিন ছেলের বাপ শ্যামসুন্দর বেপারী আবার যদি বিবাহ করে তো পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে উঠবে। কালোর ভাই একথার প্রতিবাদ করে। একবার যখন বিয়ে করার কথা বলেছে তো করবে। মরণকালে স্ত্রী তার মুখে জল দেবে। ছেলেটাতো কুকুরের মতো। কালোর ভাইয়ের একটা পুত্র লাভ করেছিল। পিতৃত্বহীন তার কাছে আপবাদ। এই নিয়ে তাদের মধ্যে একটা গন্ডগোল শুরু হয়। এমনকি একে অপরকে আঘাত করার অভিপ্রায়ও শুরু হল। শেষে কালোর ভাইয়ের কথায় ঠিক হল উত্তর মুলুক থেকে একটা লোক রেলগাড়িতে করে বউ নিয়ে বাড়িতে আসল। অনন্তের মাওবিবাহের দিন উপস্থিত ছিল। বিবাহের বাজনা শুনে তার ও বিবাহের কথা মনে পড়ে। মনে খুশি চাপতে না পেরে অনন্তকে সে একথা বলে।

‘আসমানে চান্দ উঠলে পর লোক জানে।’ (পৃ- ১১৮)

- আসমানে- শব্দটি হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ আকাশে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বাসন্তীর বাপ দীননাথ। সে এখন রামকেশবকে এড়িয়ে চলে। আগে দুজনে ভাব ছিল। পরে বাসন্তীকে কিশোরের সাথে বিবাহ দেওয়ার কানাঘুষা যখন চলতে লাগল ভাবটা তখন খুব বেড়েছিল। এখন দীননাথ বাড়ির উঠান ও মাড়ায় না। ঘাটে দেখা হলে পাছে কিছু জিজ্ঞাসা করে সেই ভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে। একদিন কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলতে পারল না। রামকেশব তার হাত ধরে শুনিয়ে ছিল তার কিশোর পাগল হয়েছে সেকথা। রামকেশবের কথাতে হিন্দি শব্দ ‘আসমনে’ কথাটি এসেছে।

‘তুই অখন বাইর হইয়া যাও। আমার মাইয়ারে আমি সমঝামু।’ (পৃ-১২৫)

- সমঝামু- বোঝাব।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : অনন্তের সাথে সুবলার বউয়ের মতিগতি ঠিক না তা খুব তাড়াতাড়ি সবাই জেনে যায়। সুবলার বউ তার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেয়। তার কথা শুনে দীননাথ তার পিতা রেগে গেলে তার মা সান্ত্বনার সুরে একথা বলে বোঝায় মেয়েকে।

‘একটা আলুর নাও ডুবতাছে।’ (পৃ- ১৩৬)

- আলু- শব্দটি চিনা শব্দ। চিন থেকে পাওয়া।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : সকরকন্দ আলু বেচার জন্য রওয়া হয়েছিল একটি নৌকাতে কানায় কানায় বোঝাই বড় বড় আলু। আধসের থেকে একসের ওজন। নৌকার বাতা ডোবে ডোবে। তার ওপর বৃষ্টির জল। কাদির মিয়া হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সাগরগঞ্জ আলু জলে তলিয়ে যাওয়ার আছে কাদিরের ছেলে তার পিতাকে পাড়ে উঠে যেতে বলে। এমন সময় ছোটো আলুর নৌকা ডুবে যেতে দেখে।

‘শহর নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।’ (পৃ- ১৩৮)

- শহরে- কথাটি ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।’

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বৃষ্টির দাপটে নৌকাগুলো ভেঙে চৌচির। একটানা ঝিমঝিম শব্দ। কাদিরের লক্ষ ছিল নৌকার বাতার বাইরে। যেখানে কোনো দুর থেকে তীরের বেগে ছুটে এসে ফোঁটাগুলো তিতাসের বুকে বিঁধিয়া আলোড়ন করছে। চরের জমিতে আলু করেছে কাদির শনিবারে হাটে গিয়ে বেচে। বড় দরাদরি, আর বাকি নিলে পয়সা দেয় না। আর শহরে নিমে বেচলে সিকার মাল টাকায়।

‘কি চল্ নামছে রে বাবা, গাঁও গেরাম মালুম হয় না’। (পৃ- ১৩৮)

- মালুম- শব্দটি হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : শহরে গিয়ে মাছ বেচার কথা প্রসঙ্গে কাদির একথা বলে। ব্যাপারীদের কাথে জাল্লার সাথে মুলামুলি করে দর দেয় টাকার জায়গায় সিকেতে। আর শহরে নিয়ে বেচলে সিকের মাল টাকায়।

‘বাজার জমছে। চল তোরে লইয়া বাজারটা একবার ঘুইরা দেখি।’ (পৃ- ১৪৬)

- বাজার- শব্দটি ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বনমালীর মন থেকে কল্পনার রামধনু মুছে যায় তার মায়ের বলা গল্পের দৈত দানব ও তার চিন্তাকে মুখর করেছিল। ছেলেটির গায়ের রঙ ফর্সা। এক চিলতে সাদামাঠা কাপড় কটিতে জড়ানো। বর্ণলালিত্য নষ্ট করে দিয়েছে। তক্তায় তক্তায় জোড়া দেওয়া দুইমুখ সরু চ্যাপ্টা লোহা দিয়ে, তারই দুই মুখ এক করে ‘কাপাস’ সূতো গলায় ঝুলানো। পিতামাতা মারা যাওয়ার পর মাসাবধি হবিষ্য করার সন্তানের এসমস্ত প্রতীক। এরকম সময়ে বণমালী তাকে জিজ্ঞাসা করে তার বাবা না মা মারা গেছে? সে মালো কি না? অনন্ত এত কিছু না বুঝলেও এটা বুঝেছিল যে, বণমালী ও তার মাসির মতো না হলে এতকথা জিজ্ঞাসা করে। বনমালী অনন্তকে বলেছিল বাজারে যাওয়ার কথা।

‘আমারে দিয়া দে দিদি, আমি খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া মানুষ করি; একদিন বেইমান পক্ষীর মত উইডা যাউক, আমার কোনো দুখ নাই’ (পৃ- ১৭৬)

- বেইমান- শব্দটি আরবি ও ফারসি শব্দের মিশ্রণ রয়েছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : উদয়তারা, অনন্তকে সঙ্গে করে তার বাপের বাড়ি আনে। সেখানে উদয়তারার বড় বোন নয়নতারার দৃষ্টি পড়ে অনন্তের দিকে। উদয়তারা জানায় যে এর মা, বাপ নেই সুবলার বউ একে মানুষ করত। একদিন তাড়িয়ে দিল। নয়নতারা জানাই মাটির পুতুল না। কাঠের পুতুল না। একটা ছেলে পেয়ে গেলি। পেটে ধরলি না। পথে পাওয়া তাই কি আপন হয়ে গেল। কিন্তু পরের ছেলে বেইমান। আসমান তারা, উদয়তারার বোন। তার স্বামীর মালোদের মধ্যে বেশ নাম ডাক আছে। সে অনন্তকে নিজের কাছে রাখার কথা বলেছিল।

‘তোর মন কাঁচা শরীর কাঁচা, তাই মনে হয় বড় হইলি না; যদি পুলাপান হইত, বয়সও মালুম হইত’ (পৃ- ১৮৫)

- মালুম- শব্দটি হিন্দি শব্দ। কথাটির অর্থ বোঝা।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : উদয়তারা কোনে বউকে বলল আমি তোর বর হলাম। তোর কোনো লজ্জা করে না? কোনে বলে সত্যি বরের সামনে লজ্জা করে না। আর তোমার সামনে লজ্জা? কারন বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে তার স্বামীর বয়স তখন বারো বছর। তার সামনে খেলেছি, ঘুড়ে বেড়িয়েছি, মাছ ধরেছি আমি তাকে ভয় পাব? একথা প্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

‘বাজি তোমার হাতে কি
হাতে খাইয়া- নাচুনী’ (পৃ- ১৯৮)

- বাজি- শব্দটি ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : এক আবেদন ছিল ছাদিরের। গত বছরের পাট বিক্রির চারশ টাকা তার চাই। শৈশব থেকেই বাপের সাথে খাটতে খাটতে সে জান কালি করেছে। কোনোদিন কোনো সাধ আহ্লাদ পূরণ করার জন্য বাপের কাছে নালিশ জানাইনি। আজ সে তার নালিশটুকু জানাবে। তৃতীয় নালিশ রমুর। নানা তাকে শালা বলবে একথা শুনে তার বাপ প্রায় তাকে অপমান করে আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করবে। কাদির মিয়া ঘরে ঢুকলেই তিনজনই তার কাছে নালিশ জানাতে আসে। ছাদির প্রথম জানাতে এগিয়ে এল। এ প্রসঙ্গে ‘বাজি’ কথাটি এসেছে।

‘মিছা মামলা। বাপ দাদার আমলের জমি- জিরাত’ (পৃ- ১৯৮)

- মামলা- শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : কাদির ডাকল ছাদির কে। কাদির বলল উজানচরের মাগন সরকার মিথ্যে মামলা করেছে। বাপ- দাদার আমলের জমি জেরাত। ছাদির আরো বলে নেয্য মতে চেয়ে খাই, ধার কর্জ করি। পাট বিক্রির পর শোধ করি। ফসলের ক্ষেতে পা দিয় না, তার মধ্যে এমন গুজব। তিসরা সনের তুফানে বড় ঘর ভেঙে যায়, তখন দুশো টাকা ধার করি। পরের বছর পাট বেচি বারো টাকা মনে তাকে সুদে আসলে মিটিয়েও দিই। এবং সেই কাগজ ছিঁড়ে ফেলতেও বলে এতদিন পরে তা নিয়ে নালিশ করেছে। একথা প্রসঙ্গে মামলা কথাটি এসেছে।

‘পারব না। মুহুরী পারব না।’ (পৃ- ২০০)

- মুহুরী- শব্দটি আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : ছাদিরের যে মামলা হয়েছিল তাতে মহুরী ছিল নিজামত। সে জানাই মামলাতে তাকে জিতিয়ে দেব। মামলা তো জিতবই তার সাথে উলটে তাকে গোরু চুরি করার জন্য পালটা মামলা দেব।

‘আমার এই চোখের ভিতর দিয়া আল্লার তারে পোড়াইয়া খাক করব। কি সাধ্য আছে তার, এই রকম দিনে ডাকাতি হাওরে ডাকাতি করব।’

- আল্লার- আরবি শব্দ।
- ডাকাতি- ফারসি শব্দ।

‘কাদির বলিল, দে তোর পুতোর মক্তবে দে; কিন্তু কইয়া রাখলাম যদি মিছাকথা শিখে জালজুয়াচুরি ...’ (পৃ- ২০৭)

- মক্তবে- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : মুঞ্জুরীর মেয়েটা রাত না পোহাতেই উঠে বিশটা গোরুর গোয়াল পরিস্কার করে, খইলভূষি দেয়, কাক তাড়ানো, উঠোন ভর্তি ধান রোদে দেয়, রান্ধা, খাওয়ানো সব কাজ করে তাকে বলে কিনা পরের ঘর। একথা বলে রনুর মা, একথা প্রসঙ্গে কাদির বলে দে তোর পুতকে মক্তবে। একথা প্রসঙ্গে মক্তবে কথাটি এসেছে।

‘ছোটোলোকের খানা-পিনা মুনশীর পুত’। (পৃ : ২০৮)

- খানা-পিনা- শব্দটি হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বেলা পড়ে আসছিল। অদূরেই ঘাটের পথে লাল-কালো, ডুরি-ডুরি শাড়ি পড়া গেরস্থ বউ-ঝিরা সেই পথ দিয়ে তিতাসের ঘাটে যাচ্ছিল। কারো হাতে ধুচনি কারো কাঁধে কলসী। কারো পায়ে রূপোর মল। এসব দেখে জনৈক ছুতরের ফলাই গান জমে উঠল। এ প্রসঙ্গে ‘খানা-পানি’ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে সংলাপে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

‘যোগানন্দ বলে, কালি থিকা ত এইঠে ক্যাম্প বসিবে- ‘ও’- নাউছার বুঝে যায়। একটু চুপ কইরা থাকে তারপর যেন আপন মনেই, ‘হলকা ক্যাম্পত জমি দিবে আর পশুপাখি বলদ দিবে, তবে ত মোর এইঠে সংসার হবা ধরিবে।’ (পৃ- ১৬)

- ক্যাম্পত- ক্যাম্প ইংরাজি শব্দ।
- জমি- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : দক্ষিণে চকমৌলানি থেকে উত্তরে সেই হায়হায় পাথর থেকে টাঙিবাড়ি জঙ্গল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জোতদার নাউছার আলম। ওয়াকফ এস্টেটের মালিক ডুয়ার্সে যখন প্রথম বন্দোবস্ত দেয়া হয় তখন থেকে নাউছার আলাসরা এখানকার সব জমির মালিক। খাশ জমির আইন পাশ হওয়ার পর গত পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে নাউছার আলমের সঙ্গে সরকারের মামলা লেগে আছে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেছে কিন্তু তাতেও কোনো ক্ষতি হয়নি আলমের সরকার হেরেছে। নউছা একটু দূরে যোগানন্দ মন্ত্রী। প্রফুল্ল ঘোষ যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল তিন মাসের জন্য যোগানন্দ মন্ত্রী ছিল তখন। নউছার তাকে জিজ্ঞাসা করে ওই সাইনবোর্ডে কী লেখা আছে একথায় বলে ‘কৃত্রিম গো প্রজানন কেন্দ্র’। যোগানন্দ আরো জানাই কাল থেকে হলকা ক্যাম্প বসবে।

‘তুবল্ মাইকে মদেশিয়া মেয়ের রিনরিন গলা।
লে লে শুন। তু আঁখ বুজা কর। উসকো বাদ ই টিকিটপর।
হাতে লাগা দে উঠবেক উ আমি কিন লিব।’ (পৃ- ২২)

- তু বল- তুই বল (হিন্দি শব্দ)
- শুন- শোন(হিন্দি শব্দ)
- আঁখ বুজা কর- চোখ বন্ধ কর (হিন্দি শব্দ)
- উসকো- ওকে (হিন্দি শব্দ)
- টিকিট (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হাটে একটি ছেলে ‘পশ্চিমি লটারি বিক্রি করছে, প্রিয়নাথ সেখানে গিয়ে জানাই ‘হলকা ক্যম্প’ বসবে তাই মাইকে কিছু বলতে পারবে না। প্রিয়নাথ হাট কমিটির দিকে যায়। আর মেইকে রিনরিনে গলাতে শুনতে পাই টিকিট বিক্রির বিভিন্ন কথা।

‘আমাদের ক্যাম্পের অ্যালাউন্স দিচ্ছে।’ (পৃ- ২৫)

- অ্যালাউন্স (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : ‘হলকা ক্যাম্প’ আপনারা সবাই আসবেন। আপনাদের জমিজমা বিচার হবে। কিন্তু এই হাকিমের চাইতেও আরো বড় হাকিম আছে। সেখানে বিচার হবে। এসব ‘অ্যালাউন্স’ দিচ্ছে।

‘দেখ দেখ ভাইমন অউর বহিমন, দেখো হাম খাড়া উঠলেক হো খা-আ-আ-ড়া’ (পৃ- ৩০)

- ভাইমন, অউর, উঠলেক- হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হাটের পূর্ব দিক থেকে উত্তর দিকে যে রাস্তাটি গেছে বেঁকে তারই সমকোনে হাটটি বসেছে। হাটের আড়ালে হাঁট। পাটহাটির উত্তরে এক লম্বা জমিতে হাটের আড়ালে হাট, কুপি জ্বলছে। তাতে মানুষের মুখ আর চোখে আলো পড়ে। সাট্টা, জুয়া, ডুগডুগি খেলা চলছে, আর সেখানে সারি সারি অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি আর গ্লাস নিয়ে মেয়েরা হাড়িয়া বা পচাই বিক্রি করছে। সেখানে কে একজন বলে ওঠে একথা।

‘ধূপগুড়ি হাট ত পাইকারি হাট’ (পৃ- ৩২)

- পাইকারি- ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হাটের রাস্তার দুদিকে হ্যাজাক বাতি, ডান হাতিতে একটু দূরে ইন্টার প্রভিলিয়াল ট্রাক দাঁড়ানো। সুহাস যেন হাটের ম্যাপটা আরো একবার ছেকে নিতে চাই। চায়ের দোকানের লোকটা অর্থাৎ মালিকটা, সুহাস যখন চা খাচ্ছিল তখন তার কাছে এক ডিশ মিষ্টি এনে বলে নিন স্যার কলকাতার মিষ্টি, তখন সেখানে হাট কমিটির বয়স্ক লোকটি এসে বসে এবং ধুপগুড়ির হাটের কথা বলেন পাইকারি হাট ওটি। এপ্রসঙ্গে পাইকারি কথাটি এসেছে।

‘ত মুই যাচ হজুর,বাঘারু কয়েকপা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, হুজুর একখান সিগারেট খায়্যা যাছু।’(পৃ- ৪০)

- হুজুর- শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : ফরেস্টার গয়ানাথের বাড়িতে হালুয়াগিরি শেখানোর জন্য যাওয়ার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে আমার দুটো কথা আছে, এক আমি ফরেস্টারচন্দ্র এখানে গয়ানাথ জোতদারকে খালাশ দিয়েছি। মনে রাখবেন হুজুর ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। ফরেস্টারচন্দ্রের বাঁ পাছায় আর ডান পিঠে বাঘের দুখানা থাবার দাগ আছে। বাঘারু তার জমি জোতদারদের দিয়ে দিয়েছে এখন গয়ানাথ হালুয়া হওয়ার ধরেছে। এপ্রসঙ্গে বাঘারু ‘হুজুর’ শব্দটির প্রয়োগ করেছে।

‘আসিন্দির বলে-তোমরালার কাম কি ঐ মাঠে যাওয়ার?ছাড়ি দেন। উকিলবাবুকে পাঠি দেন।’(পৃ- ৪৩)

- উকিল- শব্দটি আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গয়ানাথ হাল দেবে বলে দুটো গোরু জোগার করেছে। বুড়ো শুধু বসে থাকবে। সার্ভের সাহেব নাকি নকশালিয়ার ঘর। যে জোতদার নিজে চাষ দেখবে সে বলবে হাল চালাও, নরম না শক্ত মাটি। আর হাল যে দিতে পারবে না তাকে ক্যানসিল করা হবে। গয়ানাথ এখন হালুয়াগিরি শিখছে। আপলচাঁদ ফরেস্টের পাশে তার জমি। সাহেবের হাতে গোরু গেলে যাতে ভুল করে তাই গয়ানাথ, বাঘারুকে জানাই গোরুটাকেও তাদের আওয়াজ চিনিয়ে রাখতে এপ্রসঙ্গে আসিন্দির বলে উকিল পাঠিয়ে দিতে ওখানে আমিনও আছে তারাই হাল ঠেলবার ধরেছেন।

‘ত তুমি চলি আইস কেনে মুই পেরাকটিস দিছু।’ (পৃ- ৪৩)

- পেরাকটিস- পেকটিস ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : আসিন্দির, গয়ানাথ ও বাঘারুকে জিজ্ঞাসা করে হাকিম কি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিবেন নাকি? কাল হাটে শুনেছি ঘর হাকিম নাকশালিয়া। সেটেলমেন্টের হাকিম এসে গা টিপবে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ছেড়ে দাও আমি ক্যাম্প দেখব। জীবনেও একটা সেটালমেনটাও দেখি নি। খতিয়ান ও থাকল আবার প্যাকটিস ও থাকলো। হালুয়াগিরির প্যাকটিস। ফরেস্টের জমিতে যদি হাল দেওয়ার কথা বলে, প্যাকটিস আছে। হাকিম বললে বলবে আমি বুড়ো হয়েছি আমার জোয়ানখানা হাল দিচ্ছে বলে গয়ানাথ।

‘শালো তোর ওনিং পাছত মারো।’ (পৃ- ৪৫)

- ওনিং- কথাটি ওয়ানিং। ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গয়ানাথ মাটি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, সে নিজেকেও দেখেনা বলদগুলোকেও না। তারপর সে যেটুকু হাল দিয়েছিল, সেখান থেকে মাটি ছুড়ে তার ঘরের দিকে ছুঁড়তে লাগে। আসিন্দির হাসির শব্দে গয়ানাথের বৌ আর মেয়ে দৌড়ে এসে দাঁড়ায়। মোটর সাইকেল টাতে লাথি মারে। এমন সময় নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আসিন্দির গয়ানাথকে একথা বলেছে।

‘শালো, ছাগির বেটা, যে কেনে তুই হাল ধর মুই না যাওজরিপের পাখে, তোকেই হাল দিবার নাগিবে।’ (পৃ- ৪৫)

- জরিপের- কথাটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : আসিন্দির ‘ওনিং এর কথা শুনে গয়ানাথ বলে ‘ওনিং সে মানে না। চায়ের কাপটা নিয়ে এসে গয়ানাথ সামনে তার মেয়ে দাঁড়ায়। গয়ানাথ চা বসে বসে খেতে গেলে পিঁড়িতে বসে সে রাগের শেষটুকু চিৎকার করে বলে ওপরের কথাটা।

‘গয়ানাথকে বলে হে বাপা, তোমার সার্ভে পার্টি ত যাছে হে সার্ভের জায়গাত।’ (পৃ- ৪৬)

- সার্ভে পার্টি- কথাটি ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গয়ানাথ হাল দেওয়ার জন্য বাঘারুর সাথে দুটো বলদ নিয়ে যায়। সে সময় সামনের কুয়াশা কাটছে। চার পাঁচজন লোক ফরেস্টের পাশ দিয়ে বন পেরচ্ছে। আসিন্দিরকে বাঘারু ডাকে আসিন্দির ছুটে গিয়ে গয়ানাথকে বলে তোমার সার্ভের পার্টি যাচ্ছে সেই সার্ভের জায়গাতে। বাঘারু গিয়ে হালের দড়ি ধরে।

'সে ত স্যার যদি আপনি এইটাক নদী বলি ডিক্লার করি দেন...' (পৃ- ৫৮)

- স্যার- ইংরাজী শব্দ।
- ডিক্লার- Declare অর্থাৎ ঘোষনা করা।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গয়ানাথ, সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে মাপামাপিতে কি দেখলেন নদীটা ভেঙেছে। গয়ানাথ তাকে জানাই ম্যাপ বদলে কিছু হবে না, যেমন আছে তা থাকুক। সুহাস একথায় বলে গাজোল ডোবা নেই, হাঁসখালি নেই, চুরাশি নম্বর নেই ম্যাপে লিখে দেব সব ঠিক আছে? গয়ানাথ আরো জানায় ফরেস্টার চন্দ্রের জমি চাষের জমি করা হয়েছে। সুহাস তাকে জানাই এর উল্টো তো হতে পারে। সুহাস বুঝতে পারে গয়ানাথ কোনো কথা প্রমান করতে চায়ছে। তবে বর্ষায় নদীটা যতটা আসে শীতে ততটা না।

'ত তুমি চলি আইস কেনে মুই পেরাকটিস দিছে।' (পৃ- ৪৩)

- প্যাকটিস- পেরাকটিস (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : একথায় হাকিম বলে আমি বুড়ো হয়েছি।

'মুই ওয়ার্নিং দিছু তোমাক।' (পৃ- ৪৫)

- ওয়ার্নিং- ওর্নিং (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : মাঠের পাশ থেকে আসিন্দির জোড়হাতে চিৎকার করে ক্ষেমা দিতে বলে সে আসিন্দির তারা গলা শুনে চিৎকার করে ওঠে গয়ানাথ। ক্ষেমা দাও কথাটা কেন শুনলে না আমি তো ওয়ার্নিং দিয়েছি বলে আসিন্দির গয়ানাথকে।

'এই চিয়ারখান নিয়া ছুটিয়া সার্ভের জায়গাত ছুটি যা।' (পৃ- ৪৬)

- সার্ভের- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : দূরের দিকে তাকালে কুয়াশা গভীর আর তার মধ্যেই বাঘারু দেখল চার-পাঁচজন লোক ফরেস্টের পাশ দিয়ে পেরোচ্ছে। আসিন্দির বাঘারুকে বলে দৃশ্যটা ভালো করে দেখতে। গয়ানাথ জানাই তোমার সার্ভে পার্ট যাচ্ছে। আসিন্দির, বাঘারুকে জানাই চেয়ার নিয়ে যেতে।

'আমাকে একটু টাইম দেন স্যার।' (পৃ- ৫৯)

- টাইম (ইংরাজি শব্দ)
- স্যার (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : এটা নদীর 'আউটলাইন'। স্পিল এরিয়া নয়। গয়ানাথ বাবু যদি প্রমান থাকে তাহলে হাজির করুণ বিনোদবাবু বলেন। সুহাস বলে আপনাদের প্রমাণ থাকলে বলুন। গয়নাথ জানাই একটু টাইম দিন নিশ্চয় জানাব, দেব প্রমাণ।

'স্যার আপনি ত এই জিলার ম্যাপট্যাপ সব দেখি নিছেন?' (পৃ- ৬৩)

- জেলার ম্যাপটা- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : লোকটি চলে যাওয়ার পর বিনোদবাবু, গয়ানাথ ও সুহানকে বলে আপনারা এই ম্যাপটা দেখে নিয়েছেন তো? তিস্তার খুব পাখে খাড়ি আছে, আর পূর্বে চালসা হায়হায় পাথর আর পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট।

'অ হ মইনুদ্দিন। আয় ত চ্যাম্পিয়ণ সাঁতারু স্যার।' (পৃ- ৬৪)

- চ্যাম্পিয়ন- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : যেহেতু বাঘারু আর মইনুদ্দিন এখানে পাক খাচ্ছে। ওঠা বৈকুণ্ঠপুরের বোদাগঞ্জ আর আপলচাঁদ এক হয়েছিল। ঠাকুরদার মৌজাখানা ছি সেখানে।

'স্যার, আপনি ত এই জিলার-ম্যাপট্যাপ সব দেখি নিছেন।' (পৃ- ৬৩)

- ম্যাপ- শব্দটি ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বনমোরগের মতো চিৎকার করে গয়ানাথ তার গলা শুনে ভিড়টাকে ঠেলেঠুলে একজন তার সামনে এসে দাঁড়াই, মৌজা লাইটা ধরে তাকে যেতে নির্দেশ দেয় গয়ানাথ, নদীর পাড় ঘেঁষে, এরকম চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পড়ে সুহাসের মনে হয় আগে এই লোকটিই চেয়ার মুছছিল আর গাছে উঠছিল। গয়ানাথের মুখে লোকটার নাম বারবার শুনে মনে পড়ছেনা সুহাসের বিনোদবাবু সুহাস ও গয়ানাথকে লক্ষ করে বলে স্যার আপনি তো এই জেলার ম্যাপট্যাপ দেখে নিয়েছেন।

‘বুদ্ধিমান এদিক ওদিক ঘুরে রাধাবল্লভের পিছনে এসে বলে কমরেড লেকচার এইখানে দাও, এত লোক ঠিক শুবার হবে।’ (পৃ- ৭০)

- লেকচার- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : দলবল নিয়ে রাধাবল্লভ এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ায়। দলবল নিয়ে সার্ভের জায়গাতে পৌঁছাতে দেরি হওয়াতে সে ভূমিকা নিতে পারছে না। ঠিক ছিল শুরুতেই রাধাবল্লভ একটা বক্তৃতা করবে। এখানকার কুখ্যাত জোতদারদের নাম বলবে অফিসারদের সাবধান করে দেবে। তা হলে কৃষক সমেত এই জরিপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। কিন্তু তাদের পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল।

হৃষিকেশ ঠাট্টা করে বলে ভগতের কোটটা আমরা পড়ে যাব উকিল লাগবে দেখতে, ভগতের একটা কালো কোট ছিল সারাটা শীতকাল নেংটির ওপর ওই কোটটি থাকে। বক্তৃতা ভাঙার পর চায়ের দোকানে ভিড় উপচে পড়ে। রাধাবল্লভ জমির দিকে তাকিয়ে চোখ মোছে। বুদ্ধিমান, রাধাবল্লভকে নির্দেশ দেয় এখানেই লেকচার দাও। এপ্রসঙ্গে ‘লেকচার’ শব্দটি এসেছে।

‘তোঁহার মালকিকার (মালিকেরা) এতনা ঠিকা মজদুরকো কামমে লেতা রোজ। লেকিন কাইকো পার্মানেন করনেস ত বুঝা আতা হ্যায়, কিয়া না-ই বাগানপর কাম হ্যায় বহুত ইসকো অউর জমিকো জরুরত হ্যায়।’ (পৃ- ৭৬)

- মালকিকার- মালিকেরা- শব্দটি আরবি শব্দ।
- কামমে- কাজে- হিন্দি শব্দ।
- লেতা- হিন্দি শব্দ।
- বহুত, ইসকো, অউর, জরুরত- হিন্দি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হৃষীকেশের গান যখন শুরু হয়েছে রাধাবল্লভের বক্তৃতা থেমে গেছে। আনন্দপুরের বিরেনবাবু আর ফাগু ওরাও রাধাবল্লভকে ভিড়ের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসে। বীরেনবাবু রাধাবল্লভকে বলে সার্ভে তো শুরু হল, এখন বাগানের ব্যাপারে কী ভাবা যাবে? রাধাবল্লভ জানাই জোতল্যান্ডের ভেস্ট জমিতে কৃষকদের দল একদিন চাষ করে আসছে আমরা সরকারের কাছে পাট্টা চাই। এই পরের ভোটে সি.পি.এম হেরে গেলে আবার তোমাদের ঝামেলা বীরেণবাবু বলে। আর সরকার তো তোমাদের পক্ষে। অফিসার তো নকশাল। বীরেণবাবু বলে এই বাবুরা আমাদের সব জমি কেড়ে নেবে। আর বাগানিয়া লোক এসব জমি দখল নিয়ে নেবে, তো আমরা যাব কোথায়। একথা প্রসঙ্গে।

‘বায়না ঢ্যানে তোমরা খাশজমিঠে দেশিগা- ভাটিয়া- মদেশিয়া সব কোই হয়, চলো চলো বাত খতম কর’ (পৃ- ৭৮)

- বাত, খতম- কথা, শেষ (শব্দগুলি হিন্দি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বীরেনবাবু বোঝেন তিনি ভুল কথা বলে ফেলেছেন যদি মিমাংসার সূত্র না মেলে তাহলে মাঠে মারা যাবে। ফাগু, রাধাবল্লভকে বলে তোমার কৃষক সমিতির লাল ঝান্ডা, আর আমাদের মজদুর ইউনিয়ন লাল ঝান্ডা, রাধাবল্লভের রাগের

পরিবর্তে ক্লান্তি ছিল। কোম্পানিকে বলবে যে খাশ জমির কৃষক উচ্ছেদ করা চলবে না, উল্টো কোম্পানি তোমাদের দিয়ে আমাদে উচ্ছেদ করছে। এরপর একদিন তীধনুক দিয়ে মারামারি লেগে যাবে একথা প্রসঙ্গ আলবিশ, রাধাবল্লভের কথার খেই ধরে বলে ব্যস লেগে যাবে মারামারি। ফাগু বলে আরে ছেড়ে দাও ওসব কথা কে না জানে তোমাদের দেশিয়া-ভাটিয়া-মদেশিয়া সব চলে।

'কায় হিশাব কিয়েগা?' (পৃ- ৭৯)

- হিশাব- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : রাধাবল্লভ নিজেকে জানাই না সে ভদ্রলোক না সে জোতদার, বীরেণ বাবু তাকে বলে কেন সবাই তো তোমাকে বাবু বলে ডাকে। যে যাক যারা জমি দখল করে আছে তাদের যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না করতে হয় সেটা দেখতে হবে। কৃষকদের আইন অনুযায়ী কোম্পানি পাট্টা দিক।

'হাম ত জানথে কিসকো কেতনা জমিন আলবিশ কথা শুরু করলে রাধাবল্লভ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, চুপ যান ভগত চুপ যান।' (পৃ- ৭৯)

- জানথে, কিসকো, কেতনা- হিন্দি শব্দ।
- জমিন- আরবি শব্দ।

'জরুর হামনিমন বলেগা সব পাট্টা দোও, উসকো বাদ কোম্পানি দোও।' (পৃ- ৭৯)

- জরুর, হামনিমন, বলেগা, উসকো- হিন্দি শব্দ।
- কোম্পানি- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বীরেনবাবু বলেন যে তোমাদের দেখতে হবে কতটা জমি দখল আছে। কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে ওই জমিতে কাজ করছে তো তাদের কোম্পানি থেকে পাট্টাও দিতে হবে। একথাতে অলবিশ জানাই অবশ্যই তারা বললে তাদের পাট্টা চায়। তারপর কোম্পানি দাও। দুই বিঘা জমি নিজেদের জন্য রেখে বাকিটা দিয়ে দিতে হবে। এটাই নিয়ম। এ প্রসঙ্গে কথাগুলি এসেছে।

'কমরেড তোঁহাক জমিত যাবার কইসে।' (পৃ- ৮০)

- জমি- শব্দটি ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ - রাধাবল্লভ, ভগতকে জানাই তাড়াতাড়ি চল গোলমাল হতে পারে। আলবিশ ভিড়ের ভেতরে বুদ্ধিমানকে খুঁজে বেড়ায়। বুদ্ধিমান হৃষীকেশের গানের তালে মাথা নাড়তে থাকে। বুদ্ধিমান, ভগতকে বলে চারুয়ার পালা হবে বসে যেতে।

রাধাবল্লভ, বুদ্ধিমানের পিঠেতে হাঁটু দিয়ে গুতো মারে। বুদ্ধিমান বুঝতে পারে কোনো গোলমাল হয়েছে। আলবিশ বলে বুদ্ধিমান তোমার জমি যাবার সময় এসেছে।

'অ, আয় শালার ত চাকরি হবা ধরিছে হামরালার উচ্ছেদের তানে- উকিল।'(পৃ- ৮০)

- উকিল- শব্দটি আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বুদ্ধিমানের জমিতে হাত পড়বে একথা আলবিশ যখন বুদ্ধিমানকে জানাই হৃষীকেশ তখন গানের মধ্যে ডুবে আছে। তাকে ডাকা মানে পালা ভঙ্গ করা। আর তার মানে এতোগুলো লোক জেনে যাবে। তাতে গোলমাল আরো পাকাতে পারে। ওরা হৃষীকেশকে না বলেই চলতে শুরু করে। বুদ্ধিমান বেঁটে আর আলবিশ ঢ্যাঙা। বুদ্ধিমান তাকে জিজ্ঞাস করে কোন বীরেনবাবু? সে জানাই আনন্দপুরের বীরেনবাবু। তার তো চাকরি হবে আমাদের উচ্ছেদ করতে পারলে। একথা প্রসঙ্গে উকিল শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

'সাথিমন, চা বাগানকো লেবারলোক অউর কিষাণলোক দুষমন নাখে।' (পৃ- ৮৩)

- চা- চীনা শব্দ।
- লেবার- ইংরাজী শব্দ।
- অউর- হিন্দি শব্দ।
- দুষমন- হিন্দি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বুদ্ধিমান ভিড়টার পাশ কাটিয়ে মাঠ বরাবর ছুট দেয়। লড়াই বাঁধবে। পিছনের শ্রমিক ও সামনের কৃষক দিয়ে সুহাস মাঝখানে। রাধাবল্লভ জানাই সে সার্ভে করতে এসেছে কিন্তু জমি মাপবে না। উত্তরাধিকার অংশ নিয়ে কথা বলবে। সুহাস আগেই আন্দাজ করেছিল এক এলাকায় খাশ জমি দখল করেছে। তাতে প্রত্যেকেরই প্রায় এক দুইহাল জমি আছে। এখন মাপামাপি করতে গেলে সেটা ধরা পড়বে। এরা প্রথম থেকেই জমি মাপতে দেবে না। খাশজমি রেকর্ড করতে চায়। গর্ভমেন্ট থেকে প্রথমে অর্ডার ছিল খাশ জমি মাপা হবে আর দখল দারদের নাম রেকর্ড হবে। পরে অর্ডার আসে ওসবের দরকার নেই। বিনোদবাবু তাকে না বলেই জমিতে চেন ফেলে একটা গোলমাল বাধালেন। যে দলটা এসে দাঁড়িয়েছিল তার সুহাস ও রাধাবল্লভের কথা শুনছিল। সুহাসের কথা বলার পর শ্রমিকদের দলের ভিতর থেকে বক্তৃতা শুরু হল। প্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

'প্রিয়নাথ উত্তর দেয়, আমার ত আর দাগ নম্বর চিনি না স্যার।' (পৃ-৮৮)

- দাগ- আরবি শব্দ,
- নম্বর, স্যার- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বিনোদবাবু, অনাথবাবু, প্রিয়নাথবাবু হাতির রাস্তা থেকে আসছেন। সুহাস লাফিয়ে আলের ওপরে ওঠে, বিনোদবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার কিছু হয়নি তো? সুহাস তাদেরকে বলে আপনারা চেইন ফেলেছেন অথচ এতক্ষণ কোথায় ছিলেন। তারা জানাই মারামারি দেখে তার সাহস পায়নি, সুহাস তাদের জানাই 'চেইন' গোটাতে হবে। একথা প্রসঙ্গে প্রিয়োনাথ উত্তর দেয় দাগ নম্বর চিনি না স্যার আমরা লাইন বেঁধে 'চেইন' টানদিলাম। তেমনি টানছি।

'জরুর। লেকিন ঐ রিশিরো মাথা গরমা গরম।
উ কাঁহাসে লাঠি লেকে জিন্দাবাদ দেবো,...' (পৃ- ৯১)

- জরুর, লেকিন, কাঁহাসে- হিন্দি শব্দ।
- গরমা-গরম- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : অনেকেই এম.এল.এ কে এগিয়ে দিতে আসে। রাধাবল্লভ মোটা আলটাতে নামে সাথে ভগত হৃষীকেশ এগোই না, ফাগু এম.এল.এ-র পাশাপাশি চলে। বীরেন একটু পিছনে। ফাগু বলছিল আপনি কিছু ভাববেন না, এটা ঘরের মামলা, ঘরেই ফয়শালা হবে। এম.এল.এ ফাগুকে বলে শোনো কমরেড সব কথা তো ঠিক কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে তোমার পার্টির পক্ষে কোন কথাটা ঠিক। ফাগু বলে আজ যদি আমার পার্টির মধ্যে মারামারি হত, দাঙ্গা হত, খুনোখুনি হত, তাহলে পুলিশ আসত, খরবের কাগজে ছাপত। এতে আমার পার্টির বদনাম। একথাতে এম.এল.এ উপরের কথাটি বলে।

'এই ধরো কেনে, ডাল কাটিবার তানে, সারাদিন কাটাকুটি চলিত, ধার ও আছিল চকচকা।' (পৃ- ৯৬)

- চকচকা- শব্দটি তুর্কি থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বাঘারু প্রসব প্রসঙ্গে বাঘারু জানাই তার মায়ের চোট বড় হয়ে আসছে এক সময় ঢাক হয়ে গেল তারপর প্রসব বেদনা। তারপর বাঘারুর জন্ম বাঘারু দেখে পাখিগুলো আকাশে পাক খাচ্ছে শালগাছ মগডালে বসছে। আর বাচ্ছার তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ। কিন্তু মায়ের নাড়ী কাটা হয়নি বাচ্চার থেকে নিজে কুড়ুল দিয়ে নাড়ী কাটল।

'...স্যালায় মুই উপরের ডালঠে য্যালায় একখান বড় বাঘার মতন আওয়াজ ছাড়িমু ... '(পৃ- ৯৭)

- আওয়াজ- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বাঘারুর বাঘ ধরার কথা আলোচনা, কথা প্রসঙ্গে বাঘারু বলে বাঘ গাছের ডালে উঠে পড়লে তরতর করে ডাল বেয়ে উপরে উঠল বাঘ। বাঘের মুখের চেপে গেছে বাঘের দাঁত। বাঘ তা বের করতে পারছে না শুধু মাথা ঝাঁকাচ্ছে। এপ্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

'সে অফিস- টফিস হইয়্যা গিছে মনিদা; উনি ফুলবাড়ির লোক শুনলে কয়্যা দ্যান দ্যাখ্যা হব না।' (পৃ- ১১১)

- অফিস- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গাড়ি থেকে পাঁচজন নামে তারা হাঁটতে শুরু করে। বারান্দার ওপরে এককোনাতে একটা চায়ার এম.এল.এ এর ওই পাঁচজনার ভিতর থেকে কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে বলে বীরেনদা তুমি কি মিটিং করার জায়গা পাওনি। এম.এল.এ ন;এ আরে মণিদা আপনি কোথা থেকে। সে বলে তুমি লাথি মেরে ক্যালভার্ট ভাঙতে পারো আর আমি এটুকু করতে পারি না। প্রিয়নাথ একটা চট এনে পেতে দেয়। ফুলবাড়ির জায়গাটা নিয়ে একটু গোলমাল চলছে। সে প্রসঙ্গে একথাটি এসেছে।

'বড় গরম দেখছিস্? এ্যালায় থাক কেনে এ্যানং চিৎ হয়্যা।' (পৃ- ১৪৮)

- গরম- শব্দটি ফরাসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : কুকুরটা বাঘারুর পায়ের দিকে গড়িয়ে যায় বাঘারুর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কুকুরটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘারু চিৎ হয়ে পড়ে যায়। বাঘারু শক্ত হাতে কুকুর টাকে পাশে কাত করতে চায়। কুকুরটাও তার শরীরের জোড়ে বাঘারুকে চেপে ধরে। বাঘারু কুকুরটাকে চিৎ করে ফেলে। কুকুরটি চারটে ট্যাং তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে কুকুরটা কুঁই কুঁই শব্দ করে। এপ্রসঙ্গে কথাটি বলেছে।

'আরে এগুলাও রেডিওর খবর পাইয়া গিছে, যাউক বাঁচাইল, হে-এ অমূল্য।' (পৃ- ২১৪)

- খবর- শব্দটি আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : মিস্ত্রি পাড়াটা মূল বসতি এলাকার বাইরে ধানি জমির মাঝখানে এই একটা পাড়া। তারপর অনেকগুলো ধানি খেত। তার শেষে নাউয়াপাড়া। এখানকার বসতি জমাট। নাউয়াপাড়ায় ছোটো একটা তিস্তার পুরনো বেনো জল আটকে গেছে। এখন জল সবুজ। সেই কালের ওপরে মাহিন্দরপাড়া তার পাশে একটা বাঁশ ঝাড়। নাউয়াপাড়ার বাঁক নিয়েই দেখা যায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে দীননাথের মুদিখানা। দূর থেকে নিতাই বলে রেডিওর খবর পাওয়া গেছে বাঁচা গেল। এ প্রসঙ্গে 'খবর' শব্দটি পাওয়া যায়।

'পরশমণি বলে না হামরা ত খাইনা। এমনি ভেজ ই খাব।' (পৃ ২৫১)

- হামরা- আমরা (হিন্দি শব্দ)
- ভেজ- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : কম্যান্ডর বারন্দার উঠতে না উঠতেই বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে সবাই হৈ হৈ করে মাঠে নেমে যায়। ভারতীয় জোয়ানরা হাতে ধরে বারান্দায় তুলে নিয়ে আসে। বাংলাদেশের সবার পরনেই লুঙ্গি কারো কারো গায়ে গেঞ্জি। বাংলা ভাষার উচ্চারণের বৈচিত্র দেশের বাহিনীর ভেতরে যতটা ততটাই বাইরেও। রামশিস আর পরশমণি শুধু হিন্দি ভাষি। বাংলাদেশের ক্যাম্পে কোনো হিন্দিভাষী মানুষ ছিল না। নেপালিত নয়ই। সীমান্তরক্ষীদের রান্না হচ্ছে। মাংস রান্না দেখে পরশমণি বলে আমরা ভেজ খাব।

'এই দাদারা কিচেন গিয়া কয় কি, লোকটা ভেজ শব্দটি মনে করতে পারেনা, নিরামিষ খাইব। ক্যা? না দাদারা ভাইবছে আমরা বড় গোস্ত খাওয়াইয়্যা দিব নে।' (পৃ- ২৬২)

- কিচেন- ইংরাজি শব্দ।
- গোস্ত- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : পরশমণি যখন বলে মাংস রান্না হচ্ছে দেখে যে তারা ভেজ খাবে। একথা শুনে তাদের মধ্যে কেউ একজন বলে ওঠে ইন্ডিয়ান এই দাদারা নিরামিষ খাব। তারা ভেবেছে আমরা তাদের গোরুর মাংস খাওয়ার। এ প্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

'স্যার এল্যায় ত নিগিবার কষ্ট হবে। এক বস্তা চাউল আর এক বস্তা আটা নিগিবার পারি তা হলে তাই নাও।' (পৃ- ২৬৬)

- বস্তা- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : কম্যান্ডার বারান্দা থেকে টর্চ জ্বলে ওঠে দু-তিনটে। মাঠটা পেরিয়ে ঘোষ একেবারে গুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দাতে উঠতে গিয়ে ঘোষ বলে 'জল ত ঢুকে গেছে'। জোয়ানদের একজন বলে হ্যাঁ জল ঢুকে গেছে। গুদামের তালা খুলতে বলে। গুদামের ভেতরে টিন ছিল হয়ত তা শব্দ হয়ে ওঠে। তারা ভিতরে ঢোকে তখন একজন উপরের কথাটি বলে ওঠে।

'ভটভটিখান বাহির কর। জমিখান দেখি আসি।' (পৃ- ২৭৮)

- জমিখান- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : আসিন্দির পিছনে বসে গয়ানাথ তার পূর্বাবস্থাবহাল জমির হাল তিস্তা কোনোভাবে বদলে দিচ্ছে দেখতে গিয়ে দেখল ফরেস্টের অত ভিতরে বাড়িটাড়ি থেকে অতদূরে তিস্তা ফরেস্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটা জমি এতটায় খেয়ে ফেলেছে যে সেখানে আলাদা খাঁড়ি তৈরী হয়েছে। তখনই মাথায় বুদ্ধি খেলে গয়ানাথ জোতদারের। তার সামনে একটা অন্তত বছর সাতেকের শালগাছ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বাঘারু টর্চখানা নিয়ে আসে। সেই তরুন শালগাছের শেকড়ে পা দিয়ে গয়ানাথ তার জামাইকে আদেশ দেয় ভটভটি খানা নিয়ে যা, কুড়ুল আনবি এপ্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

'হ্যাঁ, ছাড়ি দিম, বলে গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে, বানার ক্যানং টান কোনঠে গিয়া ঠেকিবে আন্দাজ করিবার নাগে' (পৃ- ২৭৯)

- আন্দাজ- শব্দটি ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : দশমী একাদশীর চাঁদ হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেলে যেমন হয় আলোটা সেরকম হয়ে উঠল। বাঘারু আকাশের দিকে তাকায়নি গয়ানাথ। আসিন্দির তাকায় তারা বোঝে চাঁদ ডুবে গেছে। সূর্য কখন উঠছে কদিন ধরে তা বোঝা যায় না। ফরেস্টের ভিতরে অন্ধকার হয়ে ওঠে। নদীর জলটাও বদলে যায়। ঘোলাটে ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, এই পরিস্থিতিতে কথা প্রসঙ্গে উপরের কথাটি উঠে এসেছে।

‘জগদীশ বারুই পিছন থেকে বলে ওঠে হয়, আপনারা নৌকা রাইখবেন, আলকাতরা মাখাইছেন।’ (পৃ- ৩১৬)

- আলকাতরা- শব্দটি পোর্তুগিজ শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : অফিসার নৌকার কথায় বলে, তোমাদের কথাতে রাজি হলে টাকা দিতে রাজি হলে নৌকা পাওয়া যাবে। আর তা না হলে পাওয়া যাবে না। ফ্লাডের সময় এরকম করা বেআইনি। নরেশ অমূল্যের দিকে তাকায়। অশ্বিনী রায় পিছন থেকে অফিসারকে বলে স্যার আমারই ঐ চালটা। অশ্বিনী রায়ের গুয়াবাড়ির কথা শুনে হেসে ওঠে। অফিসার অশ্বিনী রায়কে বলে লোকটিকে খুঁজে আনতে একটা নৌকা দরকার সে লোকটি ভেসে গেছে এ কথা প্রসঙ্গে জগদীশ বারুই ওপরের কথাটি বলে ওঠে।

‘আপনি কি ফির‍্যা আইসবেন না। বাগান থক্যাই ফির‍্যা যাবেন শহরে।’ (পৃ - ৩১৯)

- শহর- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : যে লোকটা ভেসে গেছে জলে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। নৌকা চেয়ে আফিসারকে দেওয়া হয়নি। একথা অফিসার কন্ট্রোক রুমে জানানোর কথা বলে। অমূল্য অফিসারের সাথে যুক্তি দিয়ে কথা বলার লোক না। তা ছাড়া বাণভাসি সবাই এলে চিৎকার তুলতে পারত। আবার একথা ঠিক যে দাও মারার মতো টাকা চেয়েছে। ফলে অফিসারকে ধরার জন্য এতটা ছুটে আসা অনার্থক। জিপ গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে। নরেশ গাড়িতে উঠে বলেন আপনি কি আসবেন না। বাগান থেকে ফিরে যাবেন শহরে?

‘বলছি কলকাতা হাইকোর্টের মামলাখান শ্যাষ হইবার কুনো আন্দাজ কি পাওয়া গেইসে?’ (পৃ- ৩৫৪)

- হাইকোর্টের- ইংরাজি শব্দ।
- মামলা- আরবি শব্দ।
- আন্দাজ- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : উকিলবাবু হাতের কলমটা কাগজের উপর ফেলে হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে এমন করলেন যে মনে হল তিনি গয়ানাথের জন্যই অপেক্ষা করছিল। উকিলবাবু বললেন কলকাতার উকিল চিঠি দিয়েছেন কয়েকটা কাগজ কপি করে পাঠাতে হবে। গয়ানাথের উকিলবাবুর কলমটা তুলে টেবিলের ওপর একটু এগিয়ে যাতে পাশের বসে থাকা লোকটি না শুনতে পায় এমন আস্তে উকিল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের মামলাখানা শেষ হওয়ার কোন আন্দাজ কি পাওয়া গেছে। ওদিকে ব্যারেজের থাম্বগুলো নদীখানাকে অর্ধেক করে দেওয়া ধরেছে।

‘এ্যালায় টাইম পড়ি গেইমে পাবলিকের।’ (পৃ- ৩৫৬)

- টাইম, পাবলিকের- শব্দগুলি ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন মিলিয়ে বানিয়ে ফেলে দেউনিয়াগিরির পয়সা বেশি নগদ পয়সা কিন্তু জোতদারি নয়, পার্টি করলেই জোতদারি টেঁকানো যায় না। এটাও প্রমান করতে পারবে না পার্টি করা মানেই দাওনিয়াগিরি করা নয়। গয়ানাথের এ ধারনা হওয়ার পূর্বে কোনো সাক্ষপ্রমাণ করতে হয়নি। তার জোতদারি কখনো কংগ্রেস করতে পারেনি। ভোটাভুটির সময় লোকজন নিয়ে গিয়ে একটা ভোট দিয়ে আসা বিয়েশাদির মতো ব্যাপার। তার জীবনদর্শনেই বেঁধেছে উত্তরখন্ডে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। গয়ানাথ যেন গন্ধ পায় যোগ দেওয়ার একথা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে।

'গয়ানাথ হাত জোড় করে, আজি মোক ছাড়ি দিবার নাগিবে যাবার তানে ময়নাগুড়ি থামিম।' (পৃ- ৩৫৭)

- থামিম- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হয়ানাথ উত্তরখন্ডে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিন উকিলবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরয় তখন তার অন্য একটা হিসাব ছিল মুহুরী বাবুকে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে গয়ানাথ তাকে বিকেল পর্যন্ত বসিয়ে রাখবে। গয়ানাথকে দেখেই মুহুরী বলে এদের সবার কেস উঠেছে। আপনি একটু বসুন। এদের বিদায় করে আপনার কাজ করব। একথা প্রসঙ্গে এসেছে।

'খানিকটা ডাস্ট চা ঢেলে পোটলা করে মাদারির হাতে দেয়।' (পৃ- ৪৬১)

- ডাস্ট- ইংরাজি শব্দ।
- চা- চিনা শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বাহাদুর কৌটো তুলে এনে মগের মধ্যে তিন চামচ চিনি ফেলে দেয়। তারপর কড়া থেকে হাতাভর্তি দুধ তুলে মাদারির পাশ দিয়ে ঢালে। ডাস্ট চা ঢেলে মাদারি হাতে দেয়। এবং চায়ের রং না আসা পর্যন্ত নাড়তে হবে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

এই উপন্যাসে আরবি, ফারসি, হিন্দি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে তা কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করা যাক -

'ভুবন বলল 'তোঁয়ার আশিব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যো।' (পৃ- ২৭)

- কেলাস ফোরত- ক্লাস ফোর (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গৌরাঙ্গ সাধুর প্রতি ভুবনেশ্বরীর অগাদ ভক্তি। কারন সাধুত্বের জন্য যেমন তেমনি জেলেপাড়ার বিদ্যার গুরুত্ব উপস্থাপনের জন্য তেমনি। ভুবনের প্রনামের জগতে সাধু দুহাত তুলে বলেন। প্রণাম মা জননী, তোমার ছেলে লেখাপড়া করে নি? তখন ভুবন তার ছেলে গঙ্গাপদের সম্বন্ধে জানাই যে। গঙ্গাপদ ক্লাস ফোরে উঠেছে। সাধু জানাই পড়াশোনা করলেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা।

'ভুবনতার স্বভাব বিরোধী প্রচন্ড চিৎকার করে বলে উঠল 'খবদ্দার এই হালিশ তুই নো ছুঁবি। লই যাওনতো দূরের কথা।' (পৃ- ২৯)

- খবদ্দার- শব্দটিতে আরবি ও ফারসি প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- কালিয়া রান্না হলে হরিবন্ধু, গঙ্গাপদ ও মাগইন্যা বারান্দায় পাশাপাশি খেতে বসেছে। ভুবন ভাত-তরকারি পরিবেশন করছে। গোগ্রাসে খাবার গিলছে মাগইন্যা। হালিশ এর প্রসঙ্গ ওঠায় ভুবন হঠাৎ করে খাওয়া থামিয়ে সে মামীকে বলল কোন হালিশ। তখন মামী চালের সঙ্গে বাঁধা হালিশ কে দেখায়।

'বলল হালার পোয়াত্তোন কোনো শরমভরম নাই। হুদি বউ লই ফুতনর চিন্তা।' (পৃ- ৪২)

- শরমভরম- ফারসি ভাষা।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- পূর্ণচন্দ্র গত মাসে ছেলের বিবাহ দিয়েছিল। আশা ছিল বড়ো ছেলে রামপদ পমিৎকর্মা হয়ে উঠবে। কিন্তু আদতে তা হচ্ছে না। সকাল সন্ধা ঘরের ভিতর থাকে বউয়ের চারপাশ ঘুরঘুর করে। এ প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র কথাটি বলে ওঠে।

'ডরাওর না? নো ডরাইস্। মা গঙ্গা আছে। কিছু নো আইবো বগত্ সাহস রাখ।' (পৃ- ৪৭)

- ডরাওর- হিন্দি ভাষা।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- পালের টানে নৌকাগুলো একদিক কাত হয়ে গেছে। দাঁড়িরা দাঁড় টানা বন্ধ করে নৌকার উঁচু পারে চেপে বসেছে। অবিরাম পানি সেঁচে যাচ্ছে একজন। সে ক্লান্ত হয়ে গেলে অন্যজন কাজটি করে। হালে বসে মাঝিরা দাঁড়িদের সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে উপরের কথাগুলির মাধ্যমে।

'মাছ তো তোঁয়ার কাছে বাজার দামে বেচনর কথা, তুঁই তো তোঁয়ার ইচ্ছা মতন দিতা চাইতা লাইগ্যা।' (পৃ- ৪৯)

- বাজার- ফারসি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- কামিনী এ বছর শুক্কুরের কাছ থেকে দাদন নিয়েছিল। কথা ছিল বাজার দরে সে কামিনীর কাছ থেকে সে মাছ কিনবে। আজ কামিনীর জালে লাম্বুমাছের ঝাঁক পড়েছে। সেই মাছ পানির দামে নিয়ে যেতে চায় আবদুস শুক্কুর। কামিনী সে দামে মাছ বিক্রি করতে রাজি ছিল না। এভাবেই চলা কালীন চড় মেরেছিল শত্রু কামিনীর গালে। সেই সময় শুক্কুর এই কথা বলে ওঠে।

'জোনাব আলীর বাপ জেলেদের মুখে অপভ্রংশ হয়ে জনইপ্যার বাপ হয়ে গেছে।' (পৃ- ৫৪)

- আলীর- হিন্দি শব্দ

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- জলপুত্রদের মনে দীনদয়াল একটু একটু করে আলো ছড়াতে লাগল। আট-দশ বছরের বালক-বালিকারা দীনদয়ালের সকল কথার মাহাত্ম্য বোঝে না। তবে এটুকু বুঝতে পারে, এই মানুষটি অন্য দশজন মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। সদা হাস্যময় এই মানুষটি জে অফুরন্ত স্নেহের আধার ও ঈশ্বর প্রেরিত তা বিশ্বাস করতে লাগল। সবাই তাকে জনইপ্যার বাপ বলে ডাকে। আসলে জোনাব আলী তার অনেক ছেলের একটি। এ প্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

'ধনবাইশ্যার বাপ আঁর অ খালি ভিঁডাগিন দখল গরি ঘর বাঁধি ফেইল্যে। এই জাগা ইনর মালিক আঁর হউর। আজিয়া আঁই অসহায়। তুঁই আঁরে এই বিপদত্ সাহায্য গর বহদ্দার।' (পৃ- ৫৭)

- খালি- আরবি শব্দ।
- মালিক- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- বংশীর মা ভুবনকে নিয়ে বিজন বহদ্দারের বাড়িতে গেল। বহদ্দারের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে ভুবনের দুঃখের কথা বলে বংশীর মা কে। বিজনের স্ত্রী বহদ্দারের কাছে গিয়ে বলে গঙ্গার মা তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ভুবন ও বংশীর মা বিজনবিহারীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখে। ভুবন অত্যন্ত আকুতি স্বরে বলে উপরের এই কথাটি।

'বাআজি অল, আঁই অসহায় উগ্গা মাইয়াপোয়া। তোঁয়ারা জান স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি বিয়াগগুনের মানুষ গরিবাল্যাই আঁই কষ্ট মনে নো গরিব। (পৃ- ৫৮)

- মনে- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- ভুবন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সভার কাছাকাছি এগিয়ে এলো, উপস্থিত মানুষগুলো তাকে পথ করে দিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভুবন সভার ভিতরে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম বললো মাথাই মাছের চুপড়ি নিয়ে পথে পথে ঘুরি। এ কথা প্রসঙ্গে উপরের প্রসঙ্গটি এসেছে।

'তুই দে জালটাল বাওন ছাড়ি দি দিন বাইত গঙ্গাপদর হেডে বই থাগ, দিন চলে কেএন গরি?
খবর রাইখ্যা নি?' (পৃ- ৬৮)

- খরব- আরবি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- ভুবন মাছ বেচতে পরের দিন আর যায় নি কারন তার ছেলে জ্বরে কাঁপছে। মাঝে মাঝে ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠছে। জয়ন্ত এলে ভুবন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। দিন তিনেকের পর ক্ষতগুলোতে পুঁজ জমতে আরম্ভ হয়েছে। রাসমোহন ডাক্তার আবার এলেন। দেখে শুনে বললেন ঈশ্বরের আশির্বাদ আছে। ফাঁড়া কেটে গেছে।

'আরে চেয়ারম্যান সাব যে। পোয়ার বিয়াত আইবার ল্যাই আওনরে নিমন্ত্রণ করি আইলাম।

- চেয়ারম্যান- ইংরাজি শব্দ। (পৃ- ৬৯)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- আবদুল রহমান সাহেব সদাশিব দের বাড়ি এসে বলে তার বৌ বাড়ি আছে কিনা। তার মাথায় টুপি লম্বা দাড়ি পাঞ্জাবি গায়ে তার কথা প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান কথাটি এসেছে।

'খোদার কঅর নামি আইয়্যুক তারার উ অর।' (পৃ- ৭৫)

- ভগবান/আল্লা- খোদা (হিন্দি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : বিজনের মত আর চার-পাঁচজনের পাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জল ডাকাতরা। গোলকিবাহীর গাউর হারাধনের ডান হাতটা ছেঁচে দিয়েছে। পূর্ণ বহদ্দারের ছেলে রামপদ মাছ ধরতে দিতে চায়নি বলে দাঁড়ের জৌরে আঘাতে ডাকাতের একজনকে চোয়াল ভেঙে দিয়েছে সে। ফলে রামপদকে বেদম পিটিয়েছে। ঘাটের কাছে এই রক্তারক্তি অবস্থা দেখে সবাই খোদার নাম করছিল।

'লিডারগিরি থামাই দেওন পড়িবো।' (পৃ- ৮৫)

- লিডারগিরি- ইংরাজি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- দুটো খাতা পরীক্ষার পর দেখা গেল কামিনীর কথা ঠিক। শউক্কুর তার খাতায় টাকার সংখ্যা লিখে দিয়েছে। কিন্তু যোগফল রেখেছে কম। গঙ্গার সাহসী পদক্ষেপে শুক্কুরের সমূহ ক্ষতি হয়ে গেছে। উপস্থিত জেলেরা বুঝে গেল এতদিনে দাদনদাররা তাদের কত ক্ষতি করেছে। গঙ্গা তাদের চোখ খুলে দেয়। আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। এ প্রসঙ্গে কথাটি এসেছে।

'রাখো তোঁয়ার শরম। বউ যখন জামাইর লুঙ্গি-ধুতি-গেঞ্জি ধুই দে, তখন বউয়ের শরম
নো দে কেউ?' (পৃ- ৮৯)

- লুঙ্গি- বর্মি শব্দ।
- শরম- হিন্দি শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- জয়ন্তের কানা বৌটা ঘরে ঢুকলো। তার মুখে অনেক ক্লান্তির ছাপ। জয়ন্ত উঠে গেল তার বৌয়ের পাশে। চাল, আলু, বরবটি, মিষ্টি কুমড়ো এগুলো তুলে রাখলো। এ প্রসঙ্গে তার বৌ বলে এসব মেয়েদের কাজ। মানুষ দেখলে লজ্জা পাবে। একথায় জয়ন্ত উপরের কথাটি বলে।

‘গঙ্গা সবাইকে উদ্দেশ্য করে উত্তিজিত কণ্ঠে বলল, যার কাছেত্তোন সাহায্য পাওনর কথা। হেই চেয়ারম্যান যখন সাহায্য নো গইলো ...’ (পৃ- ১১৫)

- চেয়ারম্যান (ইংরাজি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : সামনে দিয়ে জল বোয়ায় দিলে মাছ ‘গল্লইবো’ কেমন করে তা চেয়ারম্যানকে জানাই গফুর জেলে। কিন্তু চেয়ারম্যান তার কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। তখন জলদাস পাড়ার জেলেরা সবাই মিলে জমায়েত হয় গঙ্গাপদের উঠানে।

‘হ কালিআয় তোঁয়ারারে পানির মইধ্যে চুবাই মারিবো সাবধান। (পৃ- ১১৬)

জল- পানি (হিন্দি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : শক্কুর মিয়া রাতের খাবার শেষ করে ঘুমনোর আয়োজন করছিল। সে সময় গোপাল এসে খবর দেয় জেলেরা ক্ষেপে গেছে। কাল গঙ্গইয়া বিয়াগ জালের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাল তোমাকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে মারবে। সাবধান গোপাল জানিয়ে দিল।

তথ্যসূত্র

চক্রবর্তী, বামনদেব, ‘‘উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, বর্ণপরিচয়’’ অস্থায়ী কলেজ ষ্ট্রীট পুরবাজার কে ৩/৬ মার্কস, স্কোয়ার, উদ্যান, প্রথম, প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ : ২৭০-২৭৭.

উইকিপিডিয়া , ‘বাংলা শব্দভান্ডার’, ০৩.০৪.২০১৯, *www.wikipedia.org ,* https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0, 11th April 2019.

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

ভাষার মূল কথা হল বৈচিত্র। কিভাবে ভূখন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে; বিভিন্ন জাত ও বর্ণের মধ্যে বা বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী ভাষীর মধ্যে, বিভিন্ন পরিস্থিতি বা রীতিতে ভাষার ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গ বিষয়ে ভাষা খুবই সূক্ষ্মবেদী। প্রসঙ্গ যখন বদলে যায় ভাষা ব্যবহারের হেরফের দেখা যায় একেই সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের রেজিস্টার বলা হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ভাবে কথা বলা।

মানুষ সামাজিক জীবন। সমাজের মধ্যে তাকে সবার সাথে মিলে মিশে চলতে হয়। কিন্তু সমাজের শ্রেণিগত দিক থেকে সমাজের মানুষের অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণি ও অশিক্ষিত শ্রেণি মানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তন উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থানে মানুষের মুখের ভাষা পরিবর্তন।

কারণ হিসাবে বলা যায় যেহেতু সমাজে অসমন্নায়ন রয়েছে, অর্থাৎ সমাজের সবাই শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। সেই কারনেই সামাজিক শ্রেণি বিভাজন তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তন উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থানে মানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তন।

সমাজ ভাষাবিজ্ঞান এমন একটা জিনিস যে অঞ্চলের বুলির মধ্যে একই মাত্রার তফাৎ থাকলে অন্য অঞ্চল হলে তাকে ভাষা বলে। এর কারন ভাষিক নয়। ঐতিহাসিক নয়। রাজনৈতিক তথা সামাজিক ইতিহাস ধরা যাক ক. একটি অঞ্চল যেখানে মান্য বাংলা বা শিষ্ট ভাষারূপকে ভাষা বলা হয়ে আবার খ. একটি অঞ্চল যেখানে উপভাষা রয়েছে। তাহলে ক এর সাথে খ এর তফাৎ রয়েছে। কিন্তু গ-যদি মান্যচলিত বাংলা হয় তাহলে ‘ক’ ও ‘গ’ এদে মধ্যে ভাষাগত দিক এর রাজনৈতিক সত্ত্বা আলাদা অথচ ঐতিহাসিক ভাবে তারা সম্পৃক্ত।

এখানে নির্বাচিত চারটি আঞ্চলিক উপন্যাসে সেই অঞ্চলের মানুষদের ব্যবহৃত মুখের ভাষার কীরূপ অবস্থান তা আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক-

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

‘রাসু ঝিমাইয়া পড়িতেছিল, ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, ময়নাদ্বীপে থেইক্যা আলি না রাসু?

হ

পালাইয়া আইছস?

হ বৈশাখ মাসে।

বৈশাখ মাসে? এতকাল কই ছিলি তুই

নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যুদবারে আইলাম

সুলপী। কমুনে খুড়া সগগল কমু। অখনে ক্ষুধায় মরি। - অ কুবিরদা; কিছু নি দিবার পার?’

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে দেখা যাক একই ভুখন্ডে সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার মিল থাকলেও এদের ভাষাপ্রয়োগের পার্থক্য বর্তমান অর্থাৎ সমাজের একটা স্তর তৈরি হয়েছে উঁচু শ্রেণি ও নিচু শ্রেণির একটা স্বচ্ছ ধারনা তৈরী হয়। নায়ক কুবের তার ভাষাভঙ্গিতে আঞ্চলিকতা বর্তমান থাকলেও তা অন্যের ভাষা থেকে পৃথক ভাবে অবস্থিত। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও দেখা যায় বিভাগ। রাসুও কুবেরের কথাতেই সে রূপ বর্তমান।

আবার,

‘কুবের গাহান বাইন্ধবার পার?

আমি পারতাম না আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে

মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়।

আমি বাইন্ধবার পারি।

কন কি ময়া বাই?’

...

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হোসেন শুরু করেন

‘আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা

মিয়া। কত ঘুমাইবা।’ (পৃ- ৩৮)

এখানে হোসেন মিয়ার কথাতে হিন্দি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে কুবের ও হোসেন মিয়া ভিন্ন প্রকৃতির তা কথার মাধ্যমে বোঝা যায়। হোসেন মিয়ার ভাষাতে সংযোগ ঘটেছে অন্য ভাষার। অর্থাৎ সে অঞ্চল থেকে বেরিয়ে অন্য অঞ্চলের মানুষের সাথে মেশে তাই তার ভাষাতে বাইরের মানুষের ভাষা প্রয়োগ তার মধ্যে রয়েছে।

‘আলো উলুপী, পাক করছিলি কী?

আখায় দুগা বাইগন দিছিলাম। আর ইলশার ঝোল।

কুকী! গায় কাপড় তুইলা বয় হারামজাদি!

মাইয়া য্যান সং’ (পৃ- ৪৪)

আবার হোসেন মিয়া ও কুবেরের কথাতে-

‘কুবের বলিল পুরান বাঁশ, পুরান বেড়া দিলি খরচা

কম হইত মিয়া বাই!

ক্যান? পুরান বাঁশ দিবা ক্যান? খরচার লাইগা

ভাইবো না, খরচা তো দিছি আমি। না দিই নাই?

হ, মিয়া বাই দিছেন, আপনেই দিছেন’ (পৃ- ৫৮)

কুবেরের কথার সাথে হোসেন কথার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় হোসেনের কথার ইঙ্গিতেও চালাকি ও নিজের কাজ গোছানোর ব্যপার দেখা যায়। সব কিছুর কধ্যে দিয়ে সে জেন নিজের কাজ গোছাতে চেয়েছে।

আবার কুবের ও কপিলার কথাতে-

‘মনডা কাতর বড়ো ...

চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, মন কাতর ক্যান

রে কপিলা?

কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে!

সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।

হ?’ (পৃ- ৬০)

এখানে কপিলার কথাতে তার স্বামীর প্রতি টান ও ভালোবাসা যেন আর গোপন করে রাখতে পারেনি। কপিলার মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কুবেরের কাছে। অর্থাৎ তার স্বামী তার সংসার তার অন্তরে গাঁথা আছে। স্বামীকে ছেড়ে সে দূরে থাকলেও তার প্রতি কাতর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। একজন নারীর জীবনে স্বামী ও সংসার যে সব কিছু তা কপিলার কথাতেই ধরা পড়েছে।

আবার গনেশ হঠাৎ কুবেরকে মিনতি করে বলে।

‘একখান গীত ক দেখি কুবির?

হ গীত না তর মাথা।’ (পৃ- ১০)

কুবেরের ধমক খেয়ে সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর নিজের গান ধরল। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়ে তার গানের কথাগুলো শোনে। ‘যে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না কেন’, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড়ো সহজ গান নয়।

তাহলে এখানে একই নৌকাতে অবস্থান করা সত্বেও তাদের পৃথক রূপ ধরা পড়ে অর্থাৎ তাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থান ধরা পড়ে।

আবার শেতলবাবুর সাথে কুবেরের কথাতেই দুটি স্তরের মানুষের কথার উঠে এসেছে।

‘কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া

রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল কী কন?

মাছ তো নাই শেতলবাবু।

নাই কী রে, নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা

না তর? নিয়ে আয় গা, যা, বড়ো দেইখা আনিস।

কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু।

আজানখুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না?

বাজারে কেনো গা আইজ।’ (পৃ- ১১)

কুবের চুরি করে যে মাছ দেয় বাজারে কিনতে তার তিনগুন দাম পড়ে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়তে পারে না। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় সমাজের দুটি স্তর এক শীতলবাবু সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি তার কথা শুনে চলতেই হবে। আবার কুবের দরিদ্র নীচু তলার মানুষ যে মাছ বেশি দামে বিক্রি করা যেতে পারে, তা সে চুরি করে কম দামে দিতে বাধ্য হয়।

শীতলবাবু আরো জানাই কুবেরকে -

'পয়সা কাইল দিমু
বলিয়া সে চলিয়া যায়, কিবেরও সঙ্গে সঙ্গে
পা বাড়াইয়া বলিল, রন শেতলবাবু,
অমন ত্বরা কইরা যাইয়েন না। দামটা
দ্যান দেখি।
কাইল দিমু কইলাম যে?
অঁই, তখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?
পয়সা নাই তো দিমু কী? কাল দিমু, নিয্যস দিমু' (পৃ- ১২)

কুবের তার মাছ বিক্রির টাকাটাও পায়নি, মাছ দিয়েও তাকে মিনতির সুরে টাকা চাইতে হয়েছে। আর অন্যদিকে বিনিপয়সায় মাছ নিয়েও অহংকার ও প্রতিপত্তি প্রকাশিত হয়েছে।

আবার ধনঞ্জয় যেহেতু কুবেরের নৌকাতে কাজ করে তাই ধনঞ্জয়ের প্রভাব কুবেরের কাছে কিছু মাত্র নয়। ধনঞ্জয় নৌকাতে এসে কুবেরকে জিজ্ঞাসা করল -

'কতটা মাছ হইল আজান খুড়া? চারের
কম না, এ্যাঁ?

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবঞ্জাসূচক চিহ্ন করে বলে -

'হ চাইরশ না হাজার। দুইশ সাতপঞ্চাশ খান
মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।
কুবের উঠিয়া বসিল।
ইটা কী বাও খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে
নাই কাইল না দুইশ সাতাইশটা মাছ
হইছিল?'

‘ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কইলাম

নাকি রে কুবির? জিগাইস না, গনেশ আইলে

জিগাইস।’ (পৃ- ১২)

আবার সমাজের মধ্যে বসবাস করে সমাজের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে নকুলের কথাবার্তাতে। নকুল ঘরের দাওয়ার বসেছিল কুবেরকে দেখে বলল -

‘অ কুবির শোন, শুইনা যা।

গনেশ অবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস

পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা। ইটা

হইল কিবা।

ক্যান? নয় মাসে খালাস হয় না?

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ ছাওয়াল হইছে না?

নকুল সায় দিয়া বলিল, পুরুষ ছাওয়াল হইছ

না? নকুল সায় দিয়া বলিল, হ। আমাগোর পাঁচি গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের

ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা, ওই একরাত্ত

একখান পোলা, তার চাঁদপানা মুখের কথা কী কমু। রং হইছে গোরা।’ (পৃ- ১৫)

নকুল শ্রেণির লোকের কথাতে ওই অঞ্চলের দিক ফুটে উঠেছে। সমাজে কিছু মানুষ আছে যার অন্যের দোষ, গুন ধরে বেড়াই। নকুলের কথা বার্তাতেও অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কুবের যেহেতু কালো তার পুত্র কী করে গোরা হল। এছাড়াও কুবের ঘরে থাকে না। রাতে তাদের বাড়ি মেজোবাবু আসে। অর্থাৎ তার আকার ইঙ্গিতে, কথাবার্তাতে অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

‘গোপি বলল, বাই উ ওই, বাবুগোর পোলার নাখান

ধলা হয়েছে বাবা নকুইলার মাইয়া পাঁচি কী

কইয়া গেল? শুনবো সায়েবগো এমন হয় না। না পিসি?’ (পৃ- ১৭)

গোপির কথাতেও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য যে দাম দর। অর্থাৎ পণের ব্যাপারটাও কুবেরের মধ্যে রয়েছে। এটিও একটি আঞ্চলিক সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মানুষের রীতি রেওয়াজ উঠে এসেছে।

‘কয় না? ক্যান গোপিরে নিব না?

গণেশ কয় নিব, যুগইলা কিছু কয় না।

উদিন আমারে জিগায় খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।

তুমি কী কইলা?

আমি কইলাম তুই বলদ যুগইল্যা। খোঁড়া

নি ব্যারাম যে মার থাকলি মাইয়া পাইবো?...' (পৃ- ৪১)

হোসেন মিয়ার কথাতে বিভিন্নভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। চালাক চতুর ব্যক্তি সে। টাকা পয়সা ও চালাকির দিক থেকে সে উঁচুতে অবস্থান করে। অঞ্চলের মানুষের জানে তার ছল চাতুরী বুদ্ধি কিন্তু দরকারে তার কাছে ছুটে যায়, একথা ভেবে তার চালাকির কথা সবাই আড়ালে রাখে-

'কুবের বলিল, ছলাম মিয়া বাই,

হোসেন বলিল, ছালাম, কেমন মাঝি? কহিল

মালুম হয়?

জ্বরে ভুগলাম। কইলকাতার থনে আলেন করে?

আইজ আলাম। আর গণেশ বাই খবর কী?

মেলায় যাবা না?

গনেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়া বাই, মেলাই

যামু, পোলাপানের মেলায় যাওনের লেইগা

আছে, না গেলে চলক ক্যান?' (পৃ- ২৮)

অর্থাৎ এখানে হোসেন মিয়া একটা উঁচু স্তরের মানুষ তার কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না কেউ, দরকারের সময় তার কাছে সবাই ছুটে যায়। শুধু তাই নয় এই মানুষটি কলকাতাতে যায়, ধুতি পাঞ্জাবী পড়ে, মুখে পান চিবোয়, সাম্প্রতিক আরো একটা বিবাহ করেছে। একজন উচ্চবিত্ত মানুষকে আমরা দেখতে পাই আর কুবের, গণেশ এরা নিম্নবিত্ত অবস্থানে দেখতে পাই।

আবার হোসেনের সম্পর্কে কুবেরের যে ভায়, তা প্রকাশ পায়েছে-

'তারপর একখানা খত বাহিত করিয়া বলিল। টিপ

সই দেও কুবের- একুশ টাকা দশ আনার খত

লিখছে- বাদ দিছি দুই টাহা। ...

কুবের বলিল, পুরান বাঁকা, পুরান বেডা দিলি

খরচা কম হইত মিয়া বাই!

ক্যান? পুরাণ বাঁশ দিবা ক্যান? খরচার লাইগা

ভাইবো না। খরচা তো দিছি আমি! না,

দিই নাই?' (পৃ- ৫৮)

দেখা যায় আঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে হোসেন ব্যবহার আর কুবেরের ব্যবহার উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থানে কুবের হোসেনের মুখের দিকে তাকায়। ভয় করে হোসেন মিয়াকে। সমাজে বসবাসকারি মানুষদের বিভিন্ন স্তরের বিভাজিত রূপ দেখা যায়। তা ধর্ম, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, কর্ম, শ্রেণি, শ্রতা হিসাবে আলাদা আলাদা রূপদান করেছে।

আবার কুবের ও কপিলার কথাতে-

'মনডা কাতর বড়ো ...
চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, মন কাতর ক্যান
রে কপিলা?
কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে!
সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।
হ?' (পৃ- ৬০)

এখানে কপিলার কথাতে তার স্বামীর প্রতি টান ও ভালোবাসা যেন আর গোপন করে রাখতে পারে নি। কপিলার মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কুবেরের কাছে। অর্থাৎ তার স্বামী তার সংসার তার অন্তরে গাঁথা আছে। স্বামীকে ছেড়ে সে দূরে থাকলেও তার প্রতি কাতর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। একজন নারীর জীবনে স্বামী ও সংসার যে সব কিছু তা কপিলার কথাতেই ধরা পড়েছে।

কুবের যখন মাছ ধরতে দেবিগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। মাঝরাতে খানিকটা বিশ্রাম নিয়েছে। তার সাথে রয়েছে গণেশ ও ধনঞ্জয়। এক অঞ্চলে বসবাস করলেও কুবেরের মানসিকতা ও গনেশ বা ধনঞ্জয়ের মানসিকতা আলাদা। এদের তিনজনের কথাতেও যেন উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থানকে নির্দেশ করে। গণেশ একটু বোকা স্বভাবের এবং কুবেরের অনুগত -

'কুবেরের পাশে বসিয়া গনেশ বাড়াবাড়ি রকমের
কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শিতকাল
হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি জড় কুবির' (পৃ- ৯)

কথাটা কেউ কানে না তুললে আবার সে বলে-

'জানস কুবির, আইজকার জারে কাঁইপা মরলাম।' (পৃ- ৯)

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সমাজে অবস্থিত মানুষের মুখের কথাতে সামাজিক কথোপকথনে উঠে এসেছে সেখানকার মানুষের মুখের ভাষার ও পৃথক পৃথক ভাষারূপ, একই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান হয়েছে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। আঞ্চলিকতা সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক।

সামাজিক অবস্থানে দরিদ্রতা চিত্র ফুটে উঠেছে করমালী ও বন্দেআলী মিয়ার কথাতে -

করমালী বলে, 'বন্দালী ভাই, কইছ কথা মিছেনা। তোমার আমার ঘরের মানুষ! তোমার আমার ঘরই নাই তার আবার মানুষ! দয়া কইরা রাইতে থাকতে দেয়- থাকি; ফজরে উইঠ্যা মুনিবের বাড়ি গিয়া ঘুমের আলস ভাঙ্গি। ঘরের সাথে এইত সম্বন্ধ। কি খায়, কি পিন্ধে কোনোদিন নি খোজ রাখতে পারছি?

বন্দেআলী খানিক ভাবিয়া নিয়া বলে, বেবাকই বুঝি করমালী ভাই। তবু মুণিবের ঘরে পঞ্চ সামগ্রী দিয়া খাইবার সময় ঘরের কথা মনে হয়। গলাই ভাত আইটকা যায়। আর খাইতে পারি না।' (পৃ- ২১)

করমালী ও বন্দেআলী দুজনেই কাজের জন্য বাইরে থাকে দীর্ঘ খাটুনির পর যখন খেতে বসে তখন তাদের বাড়িতে স্ত্রী কথা মনে পড়ে। আবার বাড়ি যখন ফেরে তখন তার স্ত্রী কাঁথা সেলাই করতে যায় রাতে তাই তার স্ত্রীকে পায় না। এর মধ্যে চরম দারিদ্রতার কথা ফুটে ওঠে। করমালীর স্ত্রীর ধনে ভাঙতে ভাঙতে হাতে কড়া পড়ে যায় তার চিত্র করমালীর বর্ণনাতে ফুটে ওঠে।

আবার বাসন্তীর জন্য তার মা কিশোরকে বেছে নেই

কিশোরের সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় -

'না সুবলা ডরাইসনা। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে
না গাঙের বিপদ পারের কাছে। বার গাঙে মা
গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে' (পৃ- ৩২)

অর্থাৎ দেখা যায় সেখানে সমাজে প্রচলিত রীতি, বিশ্বাস রয়েছে কিশোরের কথাতে রয়েছে।

ভৈরবের মালোদের কথা বলতে গিয়ে সুবল বলে-

'ভৈরবের মালোরা কি কান্ড করে জান নি? তারা
জামা জুতো ভাড়া কইরা রেলকোম্পাণির বাবুরার
বাসার কাছ দিয়ে বেড়ায় আর বাবুরা মালো
পাড়ার বইয়া তামুক টানে আর কয়, পোলাপান
ইস্কুলে দেও- শিক্ষিৎ হও, শিক্ষিত হও।'

একথায় তিলক ক্ষেপে উঠে বলে -

'হ শিক্ষিৎ হইলে শাদি- সম্বন্ধ করব
কি না। আরে সুবলা তুই বুঝবি কি! তারা

মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া লোকের
উপর।

একথাতে কিশোর হেসে বলে -

'না তিলকচাঁদ, না। চোখ রাখে বড় মাছের পর।
যা শোনা যায় তা না। তা হইলে কি জাইন্যাশুইন্যা
নগরবাসী এই গাঁও- এ সম্বন্ধ ঠিক করত।'

এই তিনজনের কথা থেকে ফুটে ওঠে ভৈরবের মালোদের সমাজ। সুবলের কথা তারা ইস্কুলে পড়াতে বলে ছেলে মেয়েকে, তিলক সেকথায় বলে তারা শুধু মুখে মিষ্টি দেখায়, আর কিশোর বলে তারা মাছের ওপর চোখ রাখে। অর্থাৎ তাদের কথাতে ধরা পড়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

মেঘনার বিশালতা যেখানে কমে গেছে সি স্থানে কিশোরের ঘুম ভাঙে অবাক হয়ে হে -

'তিলক, ইটা কোন গাঙ?
কোন গাঙ আবার। যে গাঙ দিবা আসা অইছ
ইখানে মেঘনা অতি ছোট।
আরো কত উজানে যাইতে হইবে। উজানিনগরের
খলা আর কতদূর ...' (পৃ - ৩৭)

কোনো এলাকা উঠে এসেছে তাদের কথাতে। এবং সেখানকার পরিবেশের বর্ণনা রয়েছে।
আবার মোড়লের প্রতিপত্তি উচ্চবিত্ত অবস্থানকে নির্দেশ করেছে। মোড়লের বাড়িতে চারটি ভিটেতে চারটে খড়ের ঘর। তারই

একটা বারান্দাতে বসে সে এক বাক্স রূপার টাকা গুনছে। কিশোর তাকে দেখে মনে মনে বলে-

'তোমার মত মুনিসের পঁচিশটায় শ'। তোমার চরণে দন্ডবৎ।'

মড়োল তখন তাদের অভর্থনা করে বলল-

'নাম ত জানলাম কিশোর, পিতার নাম ত জানলাম না।
পিতার নাম রামকেশব
হ' চিনতে পারছি। তোমরা ক'ভাই?
ছোটো এক ভাই আছিল মারা গেছে। তখন আমি

একলা

পুত্রসন্তান কি?

আমার পুত্রসন্তান আমিই

হ বুঝলাম, বিয়া করস কই ?' (পৃ- ৩৮)

আবার নৌকা চালাতে চালাতে তারা মাঝ নদীতে এলে কিশোর জাল ফেলে আঁজলা জল মুখে পুরে 'বুলানি' দিল। অর্থাৎ আঞ্চলের সীমাবদ্ধ। মানুষের কথাতেও সামাজিক রীতিনীতে ও এর স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে।

সুবল যখন বলে তোমার বাসন্তীর মতো মেয়ে শুকদেব পুরে কোথাও দেখলাম না একথাতে কিশোর বলে -

'আমার বাসন্তী? তুই কি কইলি সুরলা?

তোমার সঙ্গে বিয়া হইব। এই ক্ষেপের টাকা

লইয়া দেশে গেলেই তোমার সঙ্গে বিয়া

হইব। তোমার বাসন্তী কমু না, তবে

কি আমার বাসন্তী কমু?

কিশোর হাসিল : নারে সুবলা, না, ঠিমারার কথা না!

বাসন্তীরে আমার তোর লগেই সাতপাক ঘুরাইয়া দেমু।'

কিশোর আরো বলে -

'নারে সুবলা, আমার মন যেমন কয়, কথাখান

ঠিক না। যারে লেংটা থাইক্যা দেখতেছি

ছোটোকালে যারে কোলে পিঠে লইছি

হাসাইছি তারে কি বিয়া করন যায়, বিয়া

করন যায় তারে, যার লগে কোনোকালে

দেখাসাক্ষাৎ নাই ...' (পৃ- ৪৬)

অর্থাৎ কিশোর চায় না যাকে সে ছোটো বেলাতে ল্যাংটা অবস্থায় দেখেছে, খেলেছে বেরিয়েছে তাকে বিয়ে করতে। সুবল ও কিশোরের কথাতে তাদের মনের অবস্থানকে নির্দেশ করেছে। তাদের ইচ্ছাচিন্তাকে প্রকাশ করেছে।

'কি দেখছ মা, অপাক হইয়া? আমি খুব বেশি

বটপাতা খাই? না? আমি আর কত খাই?

আমার শাশুড়ি এ বটপাতা খাইত!

বটপাতা? অনন্তের মা বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল।

সে নারী সঙ্গিনীর দিকে ইঙ্গিত করাতে কথাটা সে বুঝাইয়া
দিল, তাইনের শ্বশুরের নাম পান্ডব। পান কইতে
পারে না। পানেরে কয় বটপাতা।' (পৃ- ৭৬)

এখানে সমাজের রীতি নীতি দুজনের কথাতে ফুটে উঠেছে।

সুবলের বউকে পেয়ে অনন্তের মা মনের আবেগ চেলে দেয়

'তুমি না কইছিলা ভইন আমার একজন পুরুষ চাই। হ
চাইইত পুরুষ ছাড়া নারীর জীবনে কানাকড়ি দাম নাই।
পুরুষ একটা ধরনা।
কই পাই।
পাগলারে ধর।
ধরতে গেছিলাম। ধরা দিল না।
ঠিসারা কইর না দিদি
আমি ভইন ঠিসারা করি না। সত্য কথাই কই। পাগলা
যদি আমারে হাতে ধইরা টান দেয়, আমি গিয়া তার
ঘরের ঘরণী হই।' (পৃ- ১২৭)

আবার দেখা যায় মাছ বেপারীর কথা প্রসঙ্গে কাদির বলে-

'বেপার আমার বংশের কেউ করে নাই বাবা।
চরের জমিতে আলু করছি। শনিবারে শনিবারে
হাটে গিয়া বেচি। বেপারীর কাছে বেচিনা। বড়
দরদরি করে আর বাকি নিলে পয়সা দেয় না।
মাছ বেপারীরাও এই রকম। জল্লার সাথে মুলামুলি
কইরা দর দেয় টেকায় জায়গায় সিকা। শহরে
নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।' (পৃ- ১৩৮)

কাদির শহরে চল দেখে অবাক হয়। তার সমাজ উঠে এসেছে তার কথার মধ্যে দিয়ে। কাদিরের সাথে বনমালীর সমাজগত দূরত্ব দুজনের সাথে কোথাও মিল নেই। কাদির বনমালীর দিকে তাকিয়ে তাকে ছেলেকে লক্ষ করে বলে -

'বড় অভাগ্য এরা। কেউর মা নাই। কেউর বাপ আছে
মা নাই। লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই,
ভাই বনের পশু।

তামাক জ্বালাইয়া আনিয়াছিল। টিকায় ফু দিতে
দিতে বনমালী বলিল, একজনের যে মা মরছে,
চোখের সামনে দেখতাছি।' (পৃ- ১৪২)

এখানে এই দুজনের কথাতে সামাজিক অবস্থানগত রূপ আমরা দেখতে পাই।

আবার দেখা যায় -

'ছাদির উঠানে স্ত্রীর নিকট এক ঝুড়ি ধান
নামাইয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বা'জি
আমারে ডাকছ?
হ এক বিপদের কথা কই! উজানচরের মাগন
সরকার মিছা মামলা লাগাইছে।
মামলা লাগাইছে?
হ মিছা মামলা। বাপ-দাদার আমলের জমিজিরাত ...' (পৃ- ১৯৮)

এদের পরিবারে কেউ কোনো দিন মামলা করেনি তাই বিষাদের ছায়া পড়ল কাদির মিয়ার কথা শুনে থাকতে পারেনি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের সাহায্যের জন্য এক আত্মগোপনকারি অতিথি -

'কোন তারিখে, কার কোর্টে নালিশ লাগাইয়াছে
কও!
কাদির চমকাইয় উঠিল, 'কেডা তুমি'?
আমি নিজ্যামত মুহুরী, বেয়াই
বেয়াই! আমি মনে করেছিলাম, বুঝি বউরূপী
...
বেয়াই তোমার কোনো ডর নাই। দেখ আমি
কি করতে পারি। একবার দেখ- মিছা মামলা
লাগাইছে, আমিও মিছা সাক্ষী লাগামু।' (পৃ- ১৯৯)

রামুর মার রাগ হইল যত দোষ বুঝি আমার বাপের।
আমার বাপ ঘুষ খায়, আমার বাপ চুরি করে; আমার
বাপ ফলনা করে তস্কা করে - কি যে না করে।

রামুর ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে বাপ আর ছেলের কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। ছাদির বলে তাকে বই হাতে করে স্কুলে পাঠাব। না

রে গোরুর জন্য পাচন হাতে দিয়ে মাঠে পাঠাব। মাঠে পাঠালে সে আমার মতোই মূর্খ চাষি হয়ে থাকবে। দুনিয়ার হাল অবস্থা কিছু জানতে পারবে না। আর শাশুড়ীর বিছানাতে বউকে ও বউয়ের বিছানাতে শাশুড়ীকে শুয়ে দিতে ঘুষের পয়সা গুনতে পারবে। কাজ নেই অমন লেখাপাড়াই। এখানে সমাজে-র বাহ্যিক অবস্থাকে নির্দেশ করেছে।

উদয়তারা ও অনন্তবালার কথাতেও সমাজের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। উদয়তারা বলে -

'... জলের তবু অন্ত আছে। লও ভইন ডুব দেই।
কেন গো দিদি। আমরা কি বাজারের গামছা না সাবান যে
ডুইব্যা তলায় পইড়া ক্ষয় হমু। তোমার যদি
জ্বালা হইয়া থাকে। জুড়াইতে চাও, তবে তুমি ডোব।
আমার ত ভইন কেশটি পড়িল দন্তটি পড়িল যৈবনে পড়িল
ভাটি। আমার আবার জ্বালা কি।'

আবার উদয়তারাকে তার স্বামী বাড়ি ফিরিয়ে নিতে এলে উদয়তারা বনমালীর গলা জড়িয়ে কাঁদিতে থাকে। বনমালী বলে -

'পাগলামি করিসনা। কথা রাখ। অখন বুঝি তার কান্দাবার
বয়স আছে।'

উদয়তারা বলে -

'দাদা, তোমার মাথায় বুঝি আর শোলার মুকুট উঠল না।'

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

সমাজে ভাষাভাষি মানুষের কথা বলার মাধ্যমে সে অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে তেমনি আঞ্চলিক ভাষাভাষি মানুষদের মুখের কথা এবং বাইরে থেকে আগত মানুষদের কথাতে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাক।

নাউছার আবার বলে ওঠে -

'আর ঐঠে কী লেখা মন্ত্রীমশাই, ঐ যে মানষিটার
পিঠত?'

যোগানন্দ বলে -

'কালি থিকা ত এইঠে হলকা ক্যাম্প বসিবে -
'ও'- নাউছার বুঝে যায়। একটু চুপ করে থাকে,
তারপর আপন মনেই বলে 'হলকা ক্যাম্পত
জমি দিবে আর পশুহাসপাতাল বলদ দিবে, তবেত
মোর এইঠে সংসার হবা ধরিবা।' (পৃ- ১৬)

প্রিয়নাথ হাটে যে ছেলেটি টিকিট বিক্রি করছিল তাকে গিয়ে জানাই মাইকে একটু বলতে যে হলকা ক্যাম্প বসবে। হল্কা ক্যাম্প কথায় ছেলেটি বলে -

'মানে কোনো কালচার ফাংশন হবে?

কী? ফাংশন

হ্যাঁ, মানে কোনো আর্টিস্ট আসবে?

আরে না না, এ ত সরকারের ব্যাপার ফাংশন না।

তাহলে সবাইকে বলতে বলছেন যে?

বললাম ত জমিজমি মাপামাপি হবে, রেকর্ড হবে,

অপারেশন বর্গা।' (পৃ- ২১)

অর্থাৎ প্রিয়নাথের কথাতে ছেলেটি ভেবেছিল কোনো আর্টিস্ট আসবে তাই তার আগ্রহ বেশ ছিল। কিন্তু সরকারের কাজকর্ম একথা শুনে তার আগ্রহে বেশ ভাটা পড়ে। এখানে সমাজের শ্রেণিগত দিকটি ফুটে উঠেছে।

আবার বাইরে থেকে আগত সুহাসের সাথে গ্রামের লোকের একটা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি তৈরী করেছে -

'এ হাটটা বেশ বড় হাট, না? সহাস জিজ্ঞাস

করে হ্যাঁ স্যার, এদিকের সবচেয়ে বড় হাট'

...

সাহেবকে নিয়ে প্রিয়নাথ আরো একটু উত্তরে যায়।

'নাচটা এখনো চলছে? ওরা কতক্ষণ নাচবে?

নাচছে স্যার।

কারা?

এই চা বাগানের কুলি মজুর ...' (পৃ- ২৪)

প্রিয়নাথ আবার বলে ওঠে -

'স্যার চলুন না সামনে, নাচ দেখবেন। চেয়ার নিয়ে আসি।

সুহাস প্রায় শিউরে উঠে বলে, না না, চলুন হাটে

যাই -

সুহাস আবার চলতে শুরু করে ...' (পৃ- ২৫)

এখানে দুজন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সুহাস হাটের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতুহলী হলেও নাচ দেখার কথা বলতেই নিজের গা বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত সংস্পর্শকে বাঁচিয়ে চলার।

আবার চায়ের দোকানের লোকটি সুহাসকে মিষ্টি দিতে এলে সুহাস খেতে চায় না -

'এ স্যার কি হয়। আপনাকে হাতে দিব?
আমার ত হাতে খেতেই ভাল লাগবে- সুহাস মনে
মনে চটে। হঠাৎ মনে হয় দোকান ছেড়ে বেড়িয়ে
যায়।
বোধ হয় তার মুখ দেখে দোকানার কিছু আঁচ
করেছে। সে সবচেয়ে তলা থেকে লম্বা গোল সাইজের
সবচেয়ে বড় মিষ্টিটা বের করে। ...' (পৃ- ৩২)

'সুহাসের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে বলল
আর আলু?
সে ত এই বছরই একখান ঠান্ডা ঘর চালু হবা
ধরিছে ওদলাবাড়িত্।
ওদলাবাড়িতে ত এখানে কী?
সে তো ঠিক বলিবার পারিমনা। এইঠেও বুঝি
একটা গুদাম থাকিবার পারে

লোকটি সুহাসকে জানাই তাদের কথা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে নিম্নশ্রেণির লোকের কাকুতি মিনতি সারাজীবন দেখা যায়।

রাতের বেলা সুহাসের নিজের কাছেই নিজেই দ্বিচারণ বোধ ধরা দেয়। তার কোনো ক্ষমতা নেই। সমাধান সম্ভব নয় জেনেও সে নিজেকে তৈরী করে যদি কিছু করা যায়। সবকিছু সরকার সংগঠনের আইনে জেনেও সে মেনে নিতে পারে না।

বাঘারুর কথা আর বাইরে থেকে আগত সাহেবদের কথা একেবারেই ভিন্ন।

'হুজুর। দেখি নিছেন ত মোক? ভাল করি
দেখি নিছেন ত? মোর নামখানা মোনে
রাখিবেন হুজুর ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন ...' (পৃ- ৩২)

আবার বাঘারুর কথার সাথে গয়ানাথ বা আসিন্দির পার্থক্য দেখা যায় -

'গয়ানাথ সব শিখি চাছে, কহে, হে
ফরেস্টার, মোক হালুয়াগিরি খান শিখি দে।

বাপ পিতামহের কামটামুই ভুলি গেছু।'

বাঘারু বলে

'ত মুই নিচয় শিখিদিম, হজুর কালি আমি গয়ানাথক সব শিখাই দিম।
ক্যানং করি হাল দিবার নাগে। ...' (পৃ-৩৯)

আবার-

'বাঘারু কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, হুজুর একখান
সিগেরেট খায়্যা যাছু।' (পৃ- ৪০)

আসিন্দির বলে -

'তোমরালা কাম কি ঐ মাঠে যাওয়ার? ছাড়িদেন।
উকিলবাবু পাঠি দেন। ঐঠে আমিন
আছে, যা করিবার উমরায় করিবেন তোমরালা
এ্যালায় হাল ঠেলিবার ধরিছেন।' (পৃ- ৪৩)

এই তিনজনের কথার মধ্যে বাঘারুর সাথে গয়ানাথ ও অসিন্দির কথাতে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একই অঞ্চলের সীমাবদ্ধ থেকেও তাদের কথাতে পার্থক্য দেখা যায়।

বাইরে থেকে আসা 'সাহেবদের ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ দেখা গেছে আঞ্চলিক মানুষজনের কথাতে-

'গয়ানাথ বলে হা বাপা, তোমার
সার্ভে পার্টি ত যাছে সার্ভের জায়গাত্'

আবার

'স্যার একটা কথা ছিল স্যার, কথা না হয়, অনুরোধ,
অনুরোধ ছিল স্যার- সেই ভদ্রলোক।
এই স্যার, জরিপ মানে সার্ভে ত আপনার স্যার
রোজই হওয়া লাগিবে। অনেক টাইম ত লাগিবেই
স্যার কিন্তুক এই রোজ রোজ কি এই টেবিল
আর খাতাপত্র স্যার আপনাদের পক্ষে, আপনার না
স্যার, কিন্তু উনাদের পক্ষেও টানাটুনি
করা উচিত স্যার?
সে আর কী করা যাবে, সার্ভে করতে হলে ত
এ সব লাগেই।' (পৃ- ৫১)

গোটা উপন্যাসে দেখা যায় দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে উচ্চবিত্ত শ্রেণি ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি। এবং অঞ্চলের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্যেও এই ভাগ রয়েছে তাদের মধ্যে বর্তমান।

'সুহাস মুখ তুলে তাকায় না। সে একটা পেন্সিল
দিয়ে তিস্তার পাড়টার যে অংশটুকু আজকের ব্যাপার তাকে চিহ্নিত করে।
স্যার, এই স্থানে আমাদের একটা সুনাম-খ্যাতি
আছে, হাকিম- অফিসারে- নেতাগণকে
আমরা সেবা করিয়া থাকি। স্যালায়
আপোনাকে এই নিবেদন।' (পৃ- ৩২)

গয়ানাথ বাইরে থেকে আগত সাহেবদের কাছে নিজেদের সুনামের কতা জানাই এবং তাদের চাওয়াকে গুরুত্ব দিতে নিবেদন করে আবার গয়ানাথ বলে -

'কিন্তু স্যার, নদী মানেই ত ভাঙাভাঙি। যার পার
ভাঙে আর নতুন পাড় হয়, সেইটা হয় নদী ...
কিন্তু আপলচাঁদের যত ভাঙিছে, ততখানই
আবার গড়িবার ধরিছে।' (পৃ- ৫৩)

আবার কৃষক সমিতির প্রোগ্রামে বক্তৃতায় রাধাবল্লভ বলে-

'... সরকারে নিয়ম যে পঞ্চাশ বছর ধরি চর যদি
চর না থাকে তাহা হইলে কায়েম
বলিয়া ডিক্লয়ার হইবে না। সেই সুযোগে
আমাদের পূর্ববঙ্গের হিন্দুভাইগণ আসিয়া
এই তামান তামান চর জমি চাষ করিবার
ধরিছেন ...' (পৃ- ৭২)

আলবজিশ বলে 'আর ব্যাস, লাগ যাবে দেশিয়া আর মাদেশিয়ার ফাইট, পুলিশ আয়গা ব্যাস- ফটাফট দুই দলের কমরেডমন এ্যারেস্ট'
ফাগু উদ্যোগ ছাড়ে না। সে বীরেণ বাবুকে বলে 'আপনি ঐসব আলগা বাত করবেন না। ই ত রাধা কমরেডনে বোলা, হামরা লেবাররভি বলব, খাশ জমিথে কৃষক লোগকো হটানা নাহি চোলেগা।'
রাধাবল্লভ বলে 'ঠক ত হ্যায় কিন্তু বোলেগাটা কি।'
আলবিশ বলে 'হাঁ আ গোলো, কিয়া তোঁহার মতলব গোলা' (পৃ- ৭৮)

অর্থাৎ এখানে দেখা যায় কৃষকরা তাদের জমি ছাড়তে রাজি নয়। এবং বাইরে থেকে আসা লোকেরা গ্রামে কৃষকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এখানে নিম্ন শ্রেণির কৃষকদের উপর উচ্চশ্রেণির লোকেদের প্রবল অত্যাচার দেখা যায়।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে দুটো শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায় একটা নিম্নবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত, একটা কৃষকবিত্তি আর একটা সাহেব সুবোদের দল। আবার আঞ্চলিক ভুখন্ডের সীমাবদ্ধ মানুষদের ক্ষেত্রেও এই নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের অবস্থান দেখা যায়। যেমন বাঘারুর সাথে গয়ানাথ বা আসিন্দির চরিত্রে। যেমন -

‘না হয় তা বাঘারুকে দেখি এ্যানাং ভোকিবার ধরিবে কেনে? (পৃ- ১৪৬)

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

‘চন্দ্রমণি আইজো নো আইয়ে বউ? শ্বশুরের প্রশ্নে বাস্তবজগতে ফিরে আসে ভুবনেশ্বরী। বলে, ‘নো আইয়ে।’ (পৃ- ৮) ভুবনেশ্বরীর স্বামী চন্দ্রমণি। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই উথালপাথাল বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে কারন তার স্বামী গত রাতে আকাশ যখন আলকাতরার মতো মেঘে ঢাকা, বাতাস যখন উত্তেজিত তখন সে সঙ্গীদের সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে গভীর সমুদ্রে। এবং সে যখন ফিরে আসার কথা তখন সে ফিরে আসে নি। পরের দিনের সন্ধেবেলাতেও নয়। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে জেলে জীবনের একটি দরিদ্র পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তাদের বৃত্তিমূলক কাজ জেলে জীবনের কথা উঠে এসেছে।

‘খা, অপুত খা। তোর জেডি বংশীর মা আজিয়া মাছ ইউন দিয়ে দে।’ ভুবনেশ্বরীর মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে ওঠে।’ (পৃ- ২১)

‘আঁরার হঙ্গিয়াঅল পত্তিদিন নানা রইম্যা মাছ দি ভাত খা, আঁরা পত্তিদিন মাছ দি ভাত খাইন্যুপারি। তুঁই শুধু ডাইল আর শাক রাঁধো। অভিযোগের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গঙ্গা।’ (পৃ- ২১)

চন্দ্রমণি ফিরে না আসার পর ভুবনের সংসার চালানোর দায়িত্ব তার উপরই পরে কিন্তু তার ছেলে গঙ্গাপদকে সুখে রাখার জন্য সে সর্বচেষ্টা করে চলে। এমনকি তার জেঠির থেকে মাছ নিয়ে তার ছেলেকে খেতে দেয়। কিন্তু গঙ্গাপদ তার মাকে অভিযোগের সুরে জানায় তার বাড়িতে শুধু ডাল আর শাক র ঁাধা হয় কিন্তু মাছ রাঁধা হয় না। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে মাছ খাওয়ার যে ব্যপার জেলেদের জীবনে, সেটা কোনোদিন তাদের হয়ে ওঠে না। গঙ্গাপদ এবং ভুবনের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের যে প্রভাব সেই ছবি উঠে এসেছে।

বংশীর মা বলল ‘তুঁই মাছবিয়ারির কামত লাগি যাও গই। আঁই জানি, বিয়ারিকাম তোঁয়ারলাই নো।’ (পৃ- ২২)

ভুবনময়ী দিনের খাওয়ার মুঠো চাল দিয়ে কোনো রকমে সামলে নিলেও রাতের খাবার যোগাড় করতে পারে না। জল খেয়ে তারা রাত কাটায়। বংশীর মা ভুবনকে নির্দেশ দেয় সেও যেন কোনো কাজে লেগে যায়। অর্থাৎ এখানে জেলে সমাজের নিম্নবিত্তের যে অবস্থান উঠে এসেছে ভুবনের জীবনের মধ্যে দিয়ে।

সাধু দুহাত তুলে বললেন 'প্রণাম মা জননী। তুঁই কেএন আছ? তোঁয়ার পোয়া লেয়াপড়া গরের নি?'

'ভুবন বলল, তোঁয়ার আশিব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যে। তুঁই ইক্কিনি আঁর পোয়ারে পরানখুলি আশিব্বাদ গইজ্যো। যেএন লেয়াপড়া গরিত পারে। আঁর কষ্টগান ভুলাই দিত পারে।'
সাধু বললেন 'তোঁয়ার পোয়া অবশ্যই লেয়াপড়া গরিবো। এই জাইল্যাপাড়ার পইল্যা মেট্রিক পাশ যাইল্যা হইবো। ...' (পৃ- ২৭)
ভুবন দরিদ্র হলেও তার স্বামী চন্দ্রমণির মতো তার ছেলেও যেন সমুদ্রে মাছ ধরতে যাতে না যায়, সে জন্য তার ছেলেকে সে পড়াশুনো করিয়ে শিক্ষিত করতে চায়। এর মধ্যে দিয়ে সমাজের একটা উচ্চ শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা ভুবনের মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ তার জেলে জীবনের দুঃখ যাতে তার ছেলের জীবনে না আসে, এখানে নিম্নবিত্তের অবস্থানে উচ্চবিত্তের একটা দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

ভুবন বলল 'খুউব কষ্টরে বদ্দি, খুউব কষ্ট। সংসার আর চালাইত নো পারির। দুইবেলা ঠিকমতো রাঁধিত নো পারির। পোয়ার পরীক্ষার ফিস দিত নো পারির। পোয়ার পড়ালেয়া বুঝি আর চালাইত নো পাইজ্যম।' (পৃ- ৩০)

জেলেজীবনের সংসারযাত্রায় দরিদ্রতার চিত্র অর্থাৎ নিম্নবিত্তের অবস্থান উঠে এসেছে।

ভুবন তার শ্বশুরের উদ্দেশ্যে বলে 'বাআজি, তোঁয়ারে এক্কান কথা কইতাম।'
'কি কইবা, কওনা' হরিবন্ধু বলল।
'আঁর ভইনর মাইয়া কুসুমির বিয়া হইয়ে দে আজিয়া পেরাই ছ'য় মাস বিয়াত যাইত নো পারি মাইয়াউয়ারে যদি হিতির হউরো বাড়িত্তোন নাইয়র আনিত পাইত্তাম বলল ভুবন'
'আঁই কি তোঁয়ারে বাধা দিয়্যম না? ...' (পৃ- ৩১)

ভুবন তার সংসারের রীতিরেওয়াজ মেনেই তার ভাইয়ের মেয়ে কুসুমকে তার নিজের বাড়িতে আনতে চেয়েছিল, একথা সে শ্বশুরকে জানায়। এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক অবস্থানকে আমরা দেখতে পাই। অর্থাৎ দরিদ্র হলেও ভুবনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার কথা দেখা যায়।

'পূর্ণ বলল, গত কালিয়া তোঁয়াত্তোন মাছ কেএন পইজ্যে ধনবাইশ্যার বাপ?'
'কালিয়া জালের কাম গরিত নো পারে। পোয়াঅল যাইতে যাইতে হোঁতর টানে জাল পানি নিয়ে গেইল গই। হেতল্যাই আজিয়া আঁই যাইদ্দে হিতারার লগে। উঁচুগলায় কথাগুলো বলল গোলকবিহারী।'
'আজিয়া দইজ্যার অবস্থা দেইখ্যনি? তুয়ানর মতিগতি বঅর বেদিশা লাআর। চিন্তিতকণ্ঠে বলে পূর্ণচন্দ্র।'
'তঅত যাওন পড়িবো। নো গেইলে পেট চলিবো কেএন গরি। দুই এক জোআর মাছ অঁত্তর অই গেলে মাছঅ পঁচিবো জালও ফাড়িবো'- বলল গোলক। (পৃ- ৪৭)

এখানে জেলে জীবনের নিম্নবিত্ত সমাজ এবং তাদের কাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তাদের জাল বোনার কথা , তাদের দিন যাপনের কথা, মাছ ধরতে না গেলে তাদের পেট না চলার কথা এগুলো তাদের মুখে উঠে এসেছে।

বংশী বলল, 'মা, আজিয়া ইলিশমাছ হিবা নো বেইচ্যো। ইবা আঁরা খাইয়্যম। বউত দিন ইলিশমাছ নো খাই।'
বংশীর মা বলল, 'ইলিশমাছ ইবা আজিয়া বেইচতাম নো। আঁর পোয়া খাইতো চাইয়ে। হিবা আঁরা খাইয়্যম।'
'কী কইলি অডি? আঁর খাওনোত্তোনো তোর পোয়ার খাওন বাইজ্যেদে না? পরে খাওয়াইচ।' বলে সে ঘাটার দিকে হাঁটা দিল।
'মাছ হিবা রাখি যাও। মাছ হিবা বেইচতাম নো।' সরোষে বলল বংশী।
কী কইলি চোদানির পোয়া, আঁর জাগার উঅদ্দি মাছ ধরতি যাস্ ডোমর পোয়া, আর আঁরে মাছ নো দিবি?' লাঠি উঁচিয়ে জোনাব আলীর বাপ এগিয়ে এলো বংশির দিকে। (পৃ- ৫৫)

বংশীর মা গোকবিহারীর কাছ থেকে একটা মাছ কেনে। সেখানে ইলিশমাছ ও ছিল। বংশী জানায় সে ইলিশমাছ অনেকদিন খায় নি। ইলিশমাছ দেখে জনইপ্যার বাপের চোখ চকচক রে ওঠে এবং সে এক পয়সা দিয়ে ইলিশ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বংশীর মা জানায় মাছ সে বেচবে না। নিম্নবিত্তের অবস্থান এখানে দেখানো হয়েছে।

'কই গঙ্গাপদর মা কড়ে, কিঅল্যাই সালিশ ডাইক্যো সভার মইধ্যানদি আইয়েরে কও।'

বাআজি অল, আঁই অসহায় উগ্‌গা মাইয়াপোয়া। তোঁয়ারা জান স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়াগ্‌গুনরে হারাই আঁই আজিয়া মাথাত মাছর খাড়াং লই পথে পথে ঘুরির। পোয়াউয়ারে মানুষ গরিবাল্যাই আঁই কষ্টরে কষ্ট মনে নো গরির। জীবনর বিয়াগ্‌ কিছু তেয়াগ গরিয়েরে আজিয়া আঁই ...'

'তোঁয়ার কষ্টর কথা আঁরা বিয়াগ্‌গুনে জানি, তুঁই আজিয়া কিঅল্যাই সালিশ ডাইক্যা হিয়ান কও।' মমতা মাখানো সুরে কামিনী সর্দার বলল। (পৃ- ৫৮)

চারজন সর্দার ও গ্রামের লোকেদের মধ্যে একটি সভা হয়। সামনের শ্রেণিতে সদ্দার ও বহদ্দাররা, মধ্যম শ্রেণিতে জেলেরা আর নিঃস্ব দরিদ্র জলপুত্ররা এদের কাছ থেকে অনেক দূরত্ব বজায় রাখে তাই তারা একটা কোনে বসে আছে। সেই সভায় ভুবন তার দরিদ্র সংগ্রাম জীবনের কথা তুলে ধরেছে। অর্থাৎ এই সমাজে দেখা যায় শ্রেণি সমাজের বিভিন্ন স্তর। উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্তের অবস্থানে ভুবনের স্বপ্ন।

স্যাকরা ঠাট্টাচ্ছলে বলল, 'কি বহদ্দার, বউ তো তোমার একটা, নাকও বোধহয় একটা। দুটো নোলক কার জন্যে? অ্যা?'
বিজন একটু উত্তপ্তস্বরে বলল, 'তাতে তোঁয়ার কি? তোঁয়ারে বানাইতাম দি বানাইবা, নো পাইল্যে কও? অন্য বাইন্যার কাছে যাই। উগ্‌গা আর দুউয়া!'
'এ্যাতো প্যাঁচাইন্যা কথা নো বুঝি, কঁঅত্তে দিবা কও?' বিজনের কণ্ঠ থেকে রাগের ঝাঁঝ তখনো যায়নি। (পৃ- ৬৩)

সমাজের রঙ্গরসিকতার মধ্যে দিয়েও স্যাকরা চরিত্রটি বেশ বলবান। বিজন বহদ্দার তার বউ ছাড়াও আরো একজন তার জীবনে ছিল। তা বোঝা যায় স্যাকরার ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ বিজন স্যাকরার কাছে দুটো নোলক গড়নের কথা বলেছিল। এখানে শিক্ষিত লোকের প্রসঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ শিক্ষিত লোকেরা খাদ নিয়ে বড্ড বেশি প্রশ্ন তোলে কিন্তু সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা এসব নিয়ে প্রশ্নই তোলে না, আর তাও যদি হয় বহদ্দারের মতো লোক।

'ওই ডু-নি হারামজাদি। খাড়াইতাম কইদ্যে নো ফুনঅর'
ঐদিন মাছ চাইলাম দে তুরতুরালি, আজিয়া এই লাংঅর জাগার উঅদ্দি হাঁডি যাওন পড়িবো, হিয়ান মনত নো আছিল?'
'ধুত্তোর মুখ খারাপর মারে চুদি, মুখ খারাপ মারাঅদ্যে না, ...'
বংশীর মা অসহায় দৃষ্টিতে জনইপ্যার বাপের দিকে তাকিয়ে রইল। (পৃ- ৬৪)

সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকেদের মুখে গালাগালি যে ভাষা সেটা উঠে এসেছে এর মধ্যে দিয়ে।

আগামী সাতদিন চোগে চোগে রাইখ্যো। সাতদিন টিগিলে বাঁচি যাইবো গই, যা কিছু হওনর সাতদিনের মধ্যেই অইবো। কালিয়া বিয়ানে যাই আঁত্তুন ঔষধ লই আইস্যো।'

'আঁরে কসাই ভাইব্যো যে না? বিধবাত্তুন এই বিপদত টিয়া লইতাম? আঁর ব্যাগগান্ পৌঁছাই দত্তনর ব্যবস্থা গর।'

জয়ন্ত এগিয়ে এসে ব্যাগ হাতে নিল। বলল, 'ডাক্তাররে আঁই পৌঁছাইদি আই মামী।' (পৃ- ৬৬)

গঙ্গার অসুস্থতার কথায় ডাক্তার জানায় যে সাতদিন তাকে চোখে চোখে রাখতে। আর ভুবন তাকে পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলে রসমোহন ডাক্তার ঝাঁঝিয়ে বলে তাকে যেন কেউ কসাই না ভাবে। কারণ সে বিপদের সে টাকা নেয় না। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে দরিদ্রের প্রতি তার যে সহানুভূতি ও মমতা বোধ দুটোই দেখা যায়। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির মানুষ হয়েও নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি তার যে সহানুভূতি সেটা দেখা যায়।

সব শুনে সাধু বললেন, 'উগ্গা তাজা ফুল ঝরি গেল গই। উগ্গা মার স্বপ্ন ভাঙি গেল গই। তোঁয়ার পোয়ার পড়া ছাড়ি দত্তনর সংবাদে আঁই বড়ই দুঃখ পাইলাম মা, বড়ই কষ্ট পাইলাম।'

জল খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সাধু। উপর দিকে ডান হাতটা তুলে গৌরাঙ্গ সাধু বললেন, 'তোঁয়ার মঙ্গল হোক জননী, ঠাকুর তোঁয়ার মনর কষ্ট দূর গরুক। আঁই যাই মা, বউত কাম। জাইল্যাঅলরে জাগান পড়িবো, অশিক্ষার ঘুমঅত্তোন জাগান পড়িবো। (পৃ- ৭২)

সাধু ভুবনের সংবাদ নিতে আসলে তার দুঃখের সব কথা জানতে পরে বড়োই কষ্ট পায়। সে বলে অশিক্ষায় ঘুমিয়ে থাকা লোকেদের জাগাতে হবে। অর্থাৎ তার চিন্তা, চেতনা ও মানষিকতার মধ্যে উচ্চবিত্তের অবস্থান ফুটে ওঠে। কারণ গঙ্গাপদকে সে পড়াশোনা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিল কিন্তু তা পূরণ হয় নি। কারণ গঙ্গাপদ সংসার চালানোর জন্য কাজে যোগ দিয়েছিল।

'তোরে কানে বান্দি ডাইক্যে? আঁই তো নিজেরে বান্দি কইদে।' দৃঢ়স্বরে বলল ক্ষীরবালা।

'শাক দি মাছ নো ঢাইক্যো। আঁই নিজের কানে হুইন্লাম। তুঁই আঁরে বান্দি ডাকিলা। আঁই বান্দির মাইয়াপোয়া নো? আঁর বাবে বহদ্দার। দুই-দশ গেরামর মাইন্ষে চিনে আঁর বাপেরে। কনে বান্দির মাইয়া হিসাব গরি চাও গই।

'তুই আঁরে এত তুড়িপাড়ি কথা কওদ্দে কিঅল্যাই। ছোড ছোড অই থাআবি।'

কণ্ঠ একটু উঁচুতে তুলে সুরভিবালা বলল, 'আঁই কাইত অই ফুইত্তম না চিৎ অই ফুইত্তম, হিয়ান কি কাত্তুন জিজ্ঞাই ফুতন পড়িবো নাকি? কন বেডির ভাত খাইর না? আঁর জামাই নো কামার?'

অ ভাইশ্যালাইন, হতিনর ঝিঅর কথাগিন কি রইম্যা হুইনতা লাইগ্য না? আঁইঅ কি কার লাঙঅর ভাত খাইর না? আঁর নেগে হাত-দইজ্যা হেঁচি কামাই আনের দেই খাইদ্যে।' (পৃ- ৮১)

নারীদের কথোপকথনে সমাজে নিচু শ্রেণির অশ্লীলতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

সে কামিনীর উদ্দেশে বলল, 'বহদ্দার, তোঁয়ার ঋণ আর মাছর দাম সমান সমান। আঁই তোঁয়াত্তোন কোনো টিয়া পাইতাম নো, তুঁইও আঁত্তোন কোনো টিয়া নো পাইবা।'

'পাইয়্যম, টিয়া পাইয়্যম আঁই তোঁয়াত্তোন।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কামিনী। 'তোঁয়ার হিসাবত গন্ডগোল আছে।'

আঁই ভুল কইত পারি, আঁর খাতা কি মিছা কথা কইবো না?' বলতে বলতে শুক্কুর মিয়া খাতাটি এগিয়ে দিল কামিনীর দিকে।

'ভুল নাই। আঁইও হিসাব গরি চাই। তোঁয়াত্তোন আরও এক হাজার পাঁচশ টিয়া পাইবো।' দোকানের বাইরে দাঁড়ানো গঙ্গাপদ বলে উঠল।

'তোরা কন্, তোরা কন্রে?' চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে উঠল শুক্কুর।

গঙ্গা ঠান্ডা গলায় বলল, 'আঁরার পরিচয় পরে লইও। আগে নিজের হিসাব দও। বহুত দিন চইবই খাইও। এখন হদর কথা কও।' (পৃ- ৮৫)

কামিনী মাছ বিক্রির কথা প্রসঙ্গে বলে শুক্কুর মিয়া মাছ নিয়ে টাকা না দিয়ে খাতায় লিখে রাখত। শুক্কুর মিয়া খাতায় ভুল হিসাব লিখে রাখত তা গঙ্গাপদ বলে ওঠে। অর্থাৎ এখানে নিচু শ্রেণির লোকেদের ঠকানোর যে প্রবৃত্তি তা কিছু মানুষদের মধ্যে দেখা গেছে। তার মধ্যে শুক্কুর মিয়া মাছ খেয়েও টাকার হিসাব না দিতে দেখে বোঝা যায় সেও এই শ্রেণির মানুষ।

'তুঁই কি ভাইবতা লাইগ্যো? যা হওনর অই গেইয়ে গই। মরাপোয়া লই কাঁদি লাভ নাই।' গোলকের মনের কথাগুলো ধরতে পেরেই বলল সুধারাণী।

'তোঁয়ার লগে আজিয়া দুই কুড়ি বছর ঘর গরির। তোঁয়ার মনর কথা বুইঝতে আঁর কি ভুল অইবো না?'

সংসারগান কি রইম্যা ভাঙি গেল গই।'

তোঁয়ারে কনে কঅর সংসার ভাইঙ্গে। ...

'হিতারাও দে আঁরার মাথাত মুতি নো দি যাইবো গই, তার কোনো গেরান্টি আছে নি?' সরোষে বলল গোলক।

‘যেঁত্তের কথা হেঁএত্তে দেখা যাইব। তুঁই ইক্কিনি উড ত, এদ্দুর দুইজ্যো অই গেইয়ে গই। সিয়ান গরি আইয়ো। ভাত খাওনর সময় অইএ।’ সুধারানী স্বামীকে তাগাদা দেয়। (পৃ- ৮৬)

গোলকবিহারীর কথায় তার ছেলে উঠতো বসতো। কিন্তু সে সন্তান বউয়ের হাত ধরে শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। সুধারনী তাকে জানায় তার ছেলের জন্য যেন সে না কাঁদে এবং সে জানায় তার আরো দুটো ছেলে আছে সে যেন তাদের দিকে তাকায়। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় সমাজের একটা বিশেষ প্রভেদ বা শ্রেণিবৈষম্য।

তথ্যসূত্র

শ্ব, রমেশ্বর, ‘‘সাধারণ ভাষা-বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা কলকাতা, পুস্তক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ, প্রথমখন্ড ফাল্গুন ১৩৯০। পৃ : ৬৯৬-৭১৯

বিশ্বাস, সুখেন, ‘প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা, প্রত্যয় প্রকাশনী, ৬১, মহাত্মাগান্ধি রোড, প্রথম প্রকাশ। পৃ : ১৬৪-১৭৪.

নাথ, মৃণাল, ‘‘ভাষা ও সমাজ’’, কলকাতা নয়া উদ্যোগ, পৃ : ৬০, ৬৬, ১৫১, ১৬৯

সপ্তম অধ্যায়

উপন্যাসগুলিতে সংলাপে লোকসংস্কৃতির উপাদান

লোকসংস্কৃতি লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার, আচরণ, জীবনযাপন প্রণালী ও চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি। এটা সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি তাদের প্রাকৃত পরিচয় বহন করে।

কোনো দেশের জাতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রধানত দুটি নগরসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি। গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিজস্ব জীবনপ্রণালীর মাধ্যমে শতকের পর শতক ধরে যে বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তাই বাংলার লোকসংস্কৃতি নামে অভিহিত।

নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির যে সব উপাদান রয়েছে অর্থাৎ লোককথা, গান, প্রবাদপ্রবোচন, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কতটা প্রভাব রয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক -

‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৪-১৯৩৫) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

‘বিহানের ঘরে ফির‍্যা শমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত’ (পৃ- ২১)

ঘরে চাল নেই এই কথাটি নাকি বলতে নেই। তাই প্রচলিত প্রবাদ মুখে মুখে ফেরে ‘চাল বাড়ন্ত’, পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে তেমনি গনেশের ঘরে না থাকলে গণেশ একথা কুবেরকে জানাই।

হোসেন মিয়া সুর করে একটি গান আরম্ভ করে, এই গানের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিকতা ধরা পরেছে -

‘আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোউ
বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে দিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।’ (পৃ- ৩৮)

এখানে লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক গানগুলো উঠে এসেছে।

‘পোলা বিয়নের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস- রাও করস কে রে?’

আমাদের সমাজে একটা প্রবাদ আছে, প্রায় স্ত্রীলোকের জন্মই হয়েছে পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। উপন্যাসে এই আঞ্চলিক রীতি কথা উঠে এসেছে।

‘অলক্ষ্মীর মরন নাই।’ (পৃ- ৪৭)

সমাজে প্রচলিত আছে যে সংসারে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী একত্রে অবস্থান করে। মনে করা হয় অলক্ষ্মী বিদায় করলেই লক্ষ্মীলাভ হবে। সে প্রসঙ্গে অঞ্চলে এই রীতি মানার প্রসঙ্গে কথাটি উঠে এসেছে।

গণেশের মুখে আঞ্চলিক যে গান উঠে এসেছে তাতে প্রেমবিরহের চিত্র ফুটে উঠেছে।

‘পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!

আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ !

আ লো সই!’ (পৃ- ৭৯)

এখানে দেখা যায় গণেশের মুখে বারবারই এই প্রেম বিরহের চিত্র গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। আবার ঢেঁকির কথাও উল্লেখ রয়েছে। ঢেঁকি হল গ্রাম সমাজে ব্যবহৃত চাল কোটানোর যন্ত্র বিশেষ।

কপিলা কে দেখা যায় যখন হোসেন মিয়ার নৌকোতে কুবের ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে পারি দিচ্ছিল তখন কপিলা বলে ‘আমারে রং দিলা না মাঝি?’

পাঁক দিমু কপিলা? রং তো নাই!’ (পৃ- ১১১)

এখানে রঙের পরিবর্তে কুবের পাঁকের কথা বলেছে। এর মধ্যে দিয়ে দরিদ্রতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদান মিশে রয়েছে। প্রথমেই দেখা যায় মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়েছে। এটি কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘ-মন্ডলের ব্রত। ব্রত সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান এই ব্রতে দেখা যায়। ছোটো ছোটো বালিকারা যখন খেলার খেয়ালে থাকে তখনই ঢোল সানাই বাজিয়ে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তবু এ বিবাহের জন্য তারা দলে দলে এই মাঘ-মন্ডলের পুজো করে। এই উপন্যাসেও বাসন্তীকেও এই ব্রত করতে দেখা যায়।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাসন্তী আলপনা দেয় যেখানে হাতি ঘোড়া আঁকে। তারপর বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়ে আলপনার মাঝখানে একখানা চৌকিতে বসে আর ছাতাখানা সে ঘোরাতে থাকে আর তার মা ছাতার ওপর খই আর নাড়ু ঢালতে থাকে। আর হরির লুটের মতো ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে নাড়ু ধরতে লাগে। এই ব্রতর এই রেওয়াজ। তখন নারীরা গান গেয়ে ওঠে-

‘সখি ঐত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো।’ (পৃ- ২৫)

আবার দেখা যায় কিশোরের গানে ফুটে উঠেছে সুন্দর গ্রাম বাংলার চিত্র-

'উত্তরের জমিনেরে, সোনা-বন্ধু হাল চষে,
লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে খুয়া।
দক্ষিণে মলরায় রায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
কারঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।' (পৃ- ৩২)

এই গানের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিকতা ফুটে উঠেছে।

'বাসন্তী যে তোমার হাঁড়িতে চাউল দিয়া রাখছে- তুমি ত কম জান না।' (পৃ- ৪৫)

হাঁড়িতে চাল দেওয়া এই প্রবাদটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো জিনিস বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিশোর যখন একটি মেয়েকে তাকিয়ে দেখছিল তখন সুবল তাকে জানায় যে বাসন্তীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাই সুবল কিশোরকে বলল হাঁড়িতে চাউল দিয়েই রেখেছে।

'খাল-বওয়া' আঞ্চলিক ভাষা ও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই কথার অর্থ হল মেয়েরা বঁটি নিয়ে কাতারে কাতারে বসে যায়। পরুষরা মাছের ঝুঁড়ি ধরাধরি করে এনে তাদের পাশে স্তুপ করতে থাকে। মেয়েদের হাত চলে পলকের মতো। পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়ে ঘারের উপর ছুঁড়ে মারে। সে মাছ যথাস্থানে জড়ো হয়। আর একদল পুরুষ সেখান থেকে নিয়ে ডাঙ্গিতে তোলে শুকানোর জন্য। দিনের পর দিন এইভাবে তিনমাস কাজ চলে। ছয় মাসের প্রবাস সেরে তারা দেশে পাড়ি জমায়। একে বলা হয় খাল দেওয়া।

গানের আসরে পুরুষেরা শ্রান্ত দেহে চাটাইয়ের উপর বসেছিল। আর একদিকে মেয়েদের রঙ মাখামাখি চলছিল। এদিকে পুরুষদের হোলি-গান শুরু হল। তিলকের হোলির রাজা হওয়ার ইচ্ছা ছিল। সে ভাবল গানের সময় যখন চরবে ঝুমুরের তাল যখন উঠবে তখন সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচবে। গায়কেরা দু দলে বিভক্ত হয়ে গান শুরু করল। রাধার দল আর কৃষ্ণের দল-

'সুখ বসন্তকালে, ডেকোনারে
আরে কোকিল বলি তুমারে।।
বিরহিনীর বিনে কান্ত হৃদাগ্নি হয় জ্বলন্ত,
জলে গেলে দ্বিগুণ জলে হয় নারে শান্ত।
সে-যে 'ত্যজে' আলি কুসুম- কলি রইল কি ভুলে।।' (পৃ- ৫২)

বাংলাদেশে পূর্বাঞ্চলের নদীবিহারীদের কতগুলো নিজস্ব সম্পদ আছে। এমনিতেই তারা শুয়ে পড়ে না। তারা জীবনকে উপভোগ করতে জানে। ভোগ করে তবেই তারা নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়। কোনো নৌকায় মুর্শিদা বাউল গান শোনা যায়-

‘এলাহির দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নাই ডুবলো ভেলা।
জলের আসন জলের বসন দেইখ্যা সরাসরি
বালুচরে নাও টেকাইয়া পলাইল বেপারী।’ (পৃ- ৬৩)

আবার কোনো নৌকায় বারোমাসি গান শোনা যায়-

‘ত্রহী ত আষাঢ় মাসে বরিষা গম্ভীর,
আজ রাত্রি হবে চুরি লীলার মন্দির।’ (পৃ- ৬৪)

কোন কোন নৌকায় টিমটিমে কেরোসিনের আলোর কাছে এগিয়ে জরাজীর্ণ একখানা পুঁথি সুর করে পড়ে-

‘হাস্মক রাজার দেশেরে-
উত্তরিল শেষেরে।’

কোন নৌকায় কেচ্ছা হচ্ছিল, কথার ফাঁকে ফাঁকে গান ভেসে আসছিল-

‘আরদিন উঠেরে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে।
আকোজা উঠ্‌ছেরে চন্দ্রশানের বান্ধান ঘাটে।’ (পৃ- ৬৪)

এখানে দেখা যায় আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতির চিত্র বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে গানে ও পুঁথি পড়ার মধ্য দিয়ে।

‘কাউয়ারী দাদী মরল, কুলা দিয়ে ঢাকল, দুর হ কাউয়াদূর।’ (পৃ- ৭৮)

ছোট ছোট টুকরিতে মুরি নিয়ে বুড়িড়া কোলঘেঁসে কেউ বসে কেউ দাঁড়ায় এবং বুড়িরা ছড়া কাটে। অর্থাৎ এই উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার দেখা যায়।

‘উদারচন’ কথাটি উদঘাটন থেকে এসেছে। আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগে লোকমুখে এই পরিবর্তন হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় স্থানের নামগুলো এক একটা বস্তু বা ব্যক্তির নাম অনুযায়ী হয়েছে। যেমন কুড়ুলিয়া খাল কোনো মঠের নাম। আবার কোনো খালের ঐপারের নাম যাত্রাবাড়ি।

‘ভুচনি’ কথাটি উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। ভুচনি বলতে মালো সমাজের হাতে বোনা কোনো কাজ। আবার দেখা যায় মালোপাড়ার সমাজে ধান ক্ষেতে ধান ওঠানোর সময় জারি গান গাওয়ার জন্য তারা লোক ডেকে আনত। এমনকি কালী পূজোর সময় আটপালার গান হতো।

আবার দেখা যায় বেপারীর বিয়ে প্রসঙ্গে গুরুদয়াল বলেছিল -

‘হ। কইছ কথা মিছা না। শেষ কাটালে ইস্তিরি কাছে না থাকলে মরণ-কালে মুখে একটু জল দিবে কেডায়? পুত ত কুত্তার মত।’ (পৃ- ১০২)

এখানে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কালোর ভাই বলে -

‘তুমি যেমুন আঁটকুড়ার রাজা, কথাটাখানাও কইছ সেইরকম।’ (পৃ- ১০২)

আঁটকুড়ার রাজা বলতে নিঃসন্তানকে বোঝানো হয়েছে।

আবার গুরুদয়াল বলে -

‘দূর হ শ্যাওড়াগাছের কাওয়া, এর লাগি ঐ তোর চুল পাকছে, দাড়ি, তবু শোলার মুকুট মাথাই উঠল না।’ (পৃ- ১০২)

এখানে প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায় শ্যাওড়াগাছের কাওয়া এবং শোলার মুকুর।

আবার দেখা যায় বেপারীর বিবাহের শেষে মধুর চিহ্ন রূপে নাপিতভাই গুরুবচন বলছে-

‘শুনশুন সভাজন শুন দিয়া মন,
শিবের বিবাহ কথা অপূর্ব কথন।
কৈলাসে শিখরে শিব ধ্যানেতে আছিল,
উমার সহিতে বিয়া নারদে ঘটাইল।’ (পৃ- ১০৪)

এখানে দেখা যায় বিয়ে প্রসঙ্গে ছড়ার উল্লেখ রয়েছে যা সংস্কৃতির একটি উপাদান।

‘ছোট ঘরে বসত করে বড় গুণবতী। .....

এখানে বিপিন সারাদিন কাজের পর তার গ্রামে কে আসলো কে গেল তার কোনো খোঁজ নিতে পারে না। তাই সে জানে না অনন্তর বিধমা মা তার নামেই বসত স্থাপন করেছে। এখানে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার হয়েছে।

‘লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বোনের পশু।’ (পৃ- ১৪২)

লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি ও কুসংস্কারের প্রভাব দেখা যায়।

আবার দেখা যায় উদয়তারা তার বাপের বাড়িতে গেলে একদলা কাই হাতের তালুতে দলতে দলতে বলে -

‘হিজল গাছে বিজল ধরে সন্ধে হইলে ভাইঙ্গা পড়ে’ (পৃ- ১৭৬)

একথার মানে হাট।

‘পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে’ (পৃ- ১৭৬)

এর মানে কুয়াশা।

‘আদা চাক্‌চাক্‌ বর্ণ, এ শিলোক না ভঙ্গাইলে বৃথা জন্ম।’ (পৃ- ১৭৬)

একথার মানে টাকা।

এখানে নারীদের কথোপকথনে কতগুলি ধাঁধার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

ভোরের আঁধার ফিকে হয়ে এলে অনন্তের ঘুম ভাঙলে সে শোনে মন্দিরা বাজিয়ে কে গান গেয়ে চলেছে -

‘রায় জাগো গো, আমার ধনী জাগো গো,

বৃন্দাবন তিলাসিনী, রাই জাগো গো।’ (পৃ- ১৭৭)

তাছাড়াও দেখা যায় বনমালীর গলা সকলের উপরে, সে লাচারীতেও গান তোলে -

বনমালী ডান হাতে ডান গাল চেপে বাঁহাত সামনে উঁচু করে মেলে কাকস্বরে চিতান ধরে-

‘মা যে মতি চায় সে মতি কর, কে তোমায় দোষে,

বল মা কোথায় যাই দাঁড়াইবার স্থান নাই ...’ (পৃ- ১৭৯)

এছাড়াও হরিবংশ গান, ভাইটাশুরের গান, নতুন বংশের লোকেরা গাইতে পারে না। কিছু গ্রামের পুরাতন গায়করা এ গান করে। বনমালী লাচারী তোলে-

‘সোনার বরণ দুইটি শিশু ঝলমল ঝলমল করে গো, আমি দেইখে এলাম ভরতের বাজারে।’

(পৃ- ১৮০)

চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কথা প্রসঙ্গে বনমালী একটু ভেবে বলে-

‘সাত পাঁচ পুত্র যার ভাগ্যবতী মা;

আমি অতি অভাগিনী একামাত্র নীলমণি,

মথুরার মোকামে গেলা, আর তো আইলা না।’ (পৃ- ১৮০)

আবার মেয়েদের গানে দেখা যায় -

‘জামাই খাইতে জানে, নিতে জানে, দিতে জানে না, তারে তোমরা ভদ্র বইলো না ....’

অনন্তের যখন মনে পড়ে তার মাসির কথা তখন মেয়েটি ছড়া কেটে বলে -

‘মাসি আছে তোমার, তবু ভালো। মানুষে কয়, তীর্থের মধ্যে কাশী, ইস্টির মধ্যে মাসী,

ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা।’ (পৃ- ১৮৮)

তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি অর্থাৎ লোককথা, গান, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা প্রচুর

পরিমানে ব্যবহার করা হয়েছে। আরো দেখা যায় -

'বা'জি তোমার হাতে কী?' (পৃ- ১৯৮)

'হাতে খাইয়া- নাচুনী' (পৃ- ১৯৮)

আবার -'পুঁটিমাছের পরাণ' বলতে অল্পতেই কাত এই প্রবাদের ব্যবহার রয়েছে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন দিক যেমন প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়-

যেমন- 'তোর বাপ কইসে কোটত স্যাই শেয়াল খাগের ব্যটা।

শালো ছাগির ছোয়া' (পৃ- ৪৫)

এখানে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়।

হৃষীকেশ বলে- 'ও-ও রে চরুয়া- হালুয়া রে-এ তোর প্যাটের তলায় প্যাট ডঙাছে

খাঁড়া কিছুই নাই।' (পৃ- ৭৫)

তারপর আবার সে চিৎকার করে গানটা করে -

'আ-আ মুই একি করলি রে

মোর চারুয়া-হালুয়া ভাই।' (পৃ- ৭৪)

এখানে হৃষীকেশের মুখ দিয়ে ঐ অঞ্চলের ভাষায় গান উঠে এসেছে যা লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান হিসাবে ধরা হয়।

হৃষীকেশ হুঙ্কার দিয়ে বলে 'খবরদার লেকচার থামানো চালবে না'। বুদ্ধিমানের সামনে এসে পড়ে- 'শালা বুদ্ধিমান পাল্টা আক্রমণে প্রায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'শা-লা' বলে।

উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পালাগানের যে পর্ব সেটাও এই উপন্যাসে দেখা গিয়েছে। বাইরে থেকে আসে এম.এল.এ সাহেবকে অঞ্চলের মানুষেরা 'পালাটিয়া গান' এর কথা বলেছে। আবার কনট্রাকটারেরা কাজে ফাঁকি দেবে বা চুরি করবে এনিয়ে মণি খুব হেসে বলে -

'ঠিকাদার আর ইনজিনিয়ার

দ্যাশখান কইরল ছারখার' (পৃ- ১২৩)

লোককথাতে সেখানকার মানুষদের কথা এবং তাদের কাজের বর্ণনা উঠে এসেছে। আবার দেখা যায় 'শাদা চাঁদে'র প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সুভ্রতার প্রতীক হিসাবে চাঁদকে শাদা অর্থে প্রয়োগ করে তার প্রতি অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

আবার বাঘারু নিপুছাপুরের দিকে চলতে শুরু করলে তার মুখে গুনগুন করে ওঠে-

'উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিকচিক্যানি দিয়্যা

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর আগুন-টকটক দিয়্যা' (পৃ- ১২৯)

... আবার সে দুলতে দুলতে বলে -

'বেলা ঠাকুরের মাই গে

সিন্দুর ফেল্যান কেনে, সিন্দুর ফেল্যান কেনে?' (পৃ- ১২৯)

আকাশ লাল দেখে তার মনে হয় সিঁদুর কৌটো কেউ উল্টে দিয়েছে-

'বেলা ঠাকুরের মাই গে

জল ঢালিছেন কেনে, জল ঢালিছেন কেনে?' (পৃ- ১২৯)

আবার বলে সূর্য ঠাকুরের মা, এত জল ঢালেন কেন? সে জানায় ঢালি নি তার ছেলেরা স্নান করে গেছে তাই মাটি ভেজা।

'বেলা ঠাকুরের মাই গে

ঝাঁটা ঝাড়িছেন কেনে, ঝাঁটা ছাড়িছেন কেনে ?' (পৃ- ১২৯)

সূর্য ঠাকুরের মা হিমের এত হিমের বাতাস দাও কেন? সে জানায় ছেলের গায়ের জল শুকোই।

'বেলা ঠাকুরের মাই গে

ঘর ধোয়া কইচছিস কেনে, ঘর ধোয়া কইচছিস কেনে?' (পৃ- ১২৯)

সূর্য ঠাকুরের ঘরদোর এত ধোয়া-মোছা করেন কেন, সে জানায় ছেলেকে ছেড়ে দেব বলে-

'বেলা ঠাকুরের মাই গে

ছোয়াক ছাড়েন কেনে, ছোয়াক ছাড়েন কেনে ?' (পৃ- ১২৯)

সূর্য ঠাকুরের মা ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছেন কেন? সে জানায় ছেলের ছ্যাঁকা খেয়ে তোর ছেলে উঠবে, তাই-

'হেই গে মোর বেটাখান

হেই গে মোর ছোয়াখান' (পৃ- ১২৮)

লোকসংস্কৃতিতে আরো দেখা যায় , মেয়েদের সারি পরস্পরের কোমরে হাত দিয়ে নাচের তালে তালে পা ফেলে দেয়। আপন মনেই খিল খিল করে হেসে দেয় -

'আরে ও রাখোয়াল, তাড়াতাড়ি এসো,

পাহাড় থেকে এক বুনো ভালুক নেমে এসে

আমাদের নাচের সারি ভেঙে দিল' (পৃ- ১৩৪)

এখানেও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগীতে উঠে এসেছে গানে ।

বাঘারু কণ্ঠে আবার গান শোনা যায় সেই গানে অবিচ্ছন্নতার তাতে বিরহের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়-

‘বাথান বাথান করিসেন মইষাল রে-এ-এ

(অ তোর) বাথান করিলেন ঘর’ (পৃ- ১৬৭)

বিরহের গানে বিরহিণির নায়িকার গান তার গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। বাঘারু তখন না বাজানো দোতারার ঝোঁকে ঝোঁকে গাইছে-

‘বাথানে বারোশ মইষ

ও মোর মইষাল এ্যাকেলা ঘুরেন,’ (পৃ- ১৬৭)

এখানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন গান উঠে এসেছে বাঘারুর মুখে, এছাড়াও ‘পতিঘাতিনী সতী’ পালা শোনা যায় যা রেডিওর মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া পালার নাম। আবার কথাপ্রসঙ্গে উঠে এসেছে লোককথাতে ‘কুলটার কুল’, ‘প্রমোদতরণী’তে নায়ক নায়িকার সঙ্গে এই কথাটি যুক্ত রয়েছে তা এই উপন্যাসে উঠে এসেছে।

আবার সমাজের হিন্দু বর্ণ প্রতি আনুগত্যের সংস্কারে বক্তৃতার মাধ্যমে গীতার উদ্ধৃতি উঠে এসেছে-

‘হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং

জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।’ (পৃ- ৩৮৭)

আবার ছোটবেলা থেকেই বাঘারু বিভিন্ন গানের সঙ্গে পরিচিত যেগুলো অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই গানগুলি শুনতে সে না চাইলেও শোনা হয়ে যায়-

‘সগ্‌গ হতে নামিল্ তিস্তাবুড়ি

মনচে দিয়া পাও’ (পৃ- ৪২৫)

রাজবংশী মেয়েরা যখন বাসে যায় তখন গুনগুন করে গানের শব্দ ভেসে আসে এবং গানগুলি একসঙ্গে সুরে জরো হয়। মাথা নিচু করে ঘোমটা দেওয়া ভিড়ের থেকে গানটা যেন উপরে উঠে আসে-

‘মাসি, তুই আর ভাল কম্বল খুঁজিস না,

সব কম্বলে একই লোম।’ (পৃ- ৪৭৪)

ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গানের শুরগুলো কেঁপে কেঁপে যায়। এর সঙ্গে কান্নার সুরের পার্থক্য খুবই কম। তারা কখনো দেবপারা চা বাগানের এইসব মেয়ের একে অন্যের ঘারে মাথা হেলিয়ে ট্রাকের উপর দুলতে দুলতে কান্নার সুরে গানগি গেয়ে ওঠে-

‘আকাশ ত পরিস্কার হয়ে গেল,

কাল মুগিটা শাদা হয়ে গেল’ (পৃ- ৪৭৫)

‘জলপুত্র’ (২০১২) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

জলপুত্র উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি জেলে সমাজের গান কথকথা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির হদিশ আমরা দেখতে পাই। প্রথমেই দেখি মধুরামের বাড়িতে মনসা পুঁথিপাঠ চলছে। পুঁথিপাঠের সঙ্গে কাহিনী এগোচ্ছে। পুঁথিপাঠের

আসরের প্রধান আকর্ষন নাট্যদলের ছেলেরা। শ্রাবণ মাসের জন্য এদের ভাড়া করে আনা হয়। এরা বন্দর, গরুমচলা করল, কোলা এসব গ্রাম থেকে আনা হয়। মেয়েদের পোশাক পড়ে মুখে পাউডার লাগিয়ে আসরে ঘুরে ঘুরে নাচে। আসরে ঘুকে তাকে নাচতে শুরু করে এবং বন্দনা গীতি শুরু কতে-

'শত নমস্কার আমার শত নমস্কার, অধীনে গান করি সবার মাঝার,
আমার শত নমস্কার।' (পৃ- ১০)

প্রেমদাস এই গান শেষ হতেই বৃত্তের ভেতর একবার নেচে এল। এবার আনন্দমোহন গান ধরল-

'এ সংসারে থাকা যাবে না।
আজ নহে কাল যেতে হবে চিন্তা করে দেখ না।
সংসারে করিলে গমন অবশ্য হইবে মরণ,
চিরজীবী নয়রে কখন কর না ভুল ধারণা।' (পৃ- ১০)

আবার ভোর সকালে ভোলানাথ ঘুমন্ত অর্ধজাগ্রত মানুষদের কৃষ্ণের অষ্টতর শতনাম করে শোনান-

'শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন,
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন।' (পৃ- ২০)

'নারীর রূপ নারিকেলের মালার মতো, কখনো আধখানা বই, পুরা দেখা যায় না।' (পৃ- ৩৪)

এখানে নারীর রূপকে নারিকেলের মালার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

উপন্যাসে চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখের পাশাপাশি মুসলমানদের ঈদ বর্ণ হিন্দুদের দূর্গাপুজোর মতো জলপুত্রদের কাছে গঙ্গাপুজো, মনসা পুজো ও চৈত্রসংক্রান্তি সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির ছয় ছাইবিচি এবং সিদ্ধচাল লাগে এবং এর সাথে পাঁচ রকমের তরিতরকারি এর সঙ্গে আয়োজন করে। এছাড়াও চৈত্রের শেষ দিনে জেলেপাড়ার প্রত্যেক পরিবারের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে যাকের উপকরণ সংগ্রহে নেমে পড়ে। বেতগাছের আগা, বটগাছের পাতা, পাতাসুদ্ধ আমের ছোটো ডাল, কেয়ার ঝোপ, নিমপাতা, থানকুনি পাতা, বাসক পাতা, কাঁচা বাশপাতা ইত্যাদি উঠানের মাঝখানে জরো করা হয়। এইদিন ভোর সকালে প্রত্যেক সন্তানবতী জেলেনি তাদের সন্তানদের মঙ্গলকামনায় পূর্বমুখী হয়ে ভক্তিভরে স্তূপীকৃত সংগ্রহে আগুন দেয়। একে বলা হয় 'যাক' দেয়া। সকালে উঠেই নারীরা প্রথমে স্নান সেরে নেয়। এরপর সন্তানদেরকে বিছানা থেকে তুলে সেই জাঁকের পাশে এমনভাবে দাঁড় করায় যাতে যাকের ধোঁয়া তাদের নাকেমুখে লাগে। লোকসংস্কৃতি অনুযায়ী তারা এটি মেনে চলে। এই ধোঁয়া সন্তানদের গায়ে লাগলে সমস্ত বিপদ আপদ দূরীভূত হয়। এটা জেলে নারীদের চিরন্তন বিশ্বাস। সেইরকমভাবে ভুবন উচ্চস্বরে ছড়া কাটে -

‘যাকরে যাক, যত আপদ বালাই আছে,
বিয়াগ্নিন হাত দইজ্যা পারই যাক।’ (পৃ- ৩৮)

সমুদ্রপাড়ে গঙ্গাপুজোর আয়োজন করে তারা। পুজোর কাজে পাড়ার কয়েকজন এয়োতিরা সাহায্য করে। উত্তরমুখো করে মাটির একটি বেদি তৈরী করা হয়, সেই বেদির উপরে একটা বাচ্ছা কলাগাছ স্থাপন করা হয়। সাগু, কলা , আম, কাঠাল, কমলা, আপেল, আখ কলাপাতার উপর পুজো সাজানো হয়। কলাগাছের সামনে আর একটা ছোট্ট বেদির উপর জলভর্তি মাটির কলসি রাখা হয়। কলসি মুখে আমের শাখা দিয়েছেন ব্রাহ্মন। তার উপরে রেখেছেন একটা ঝুনো নারকল। আচার সংস্কারের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির একটি রূপ জেলে সমাজের মধ্যে দেখা গেছে।

দীনদয়াল তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গিয়ে নামতা শেখায় আবার কারোর পাশে গিয়ে গুনগুনিয়ে মুখস্থ করায় -
‘দুষ্টমতি লঙ্কাপতি হরে নিল সীতা সতী।
রামচন্দ্র গুনাধার ত্বরা গিয়ে সিন্ধুপার।।’ (পৃ- ৫৩)
আবার সকলের পড়া শেষ হলে সবাইকে পূর্বমুখী করে দাঁড় করায় দীনদয়াল, হাত জোর করে বলে-
‘সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে ...’ (পৃ- ৫৩)

বিকেলে উত্তরপাড়ায় বায়স্কোপ দেখানোর লোক এসেছে, খাল অতিক্রম করে এপাড়ে তাদের আওয়াজ ভেসে আসে -
‘আকার দ্যাখো বাহার দ্যাখো
লাভলু মিয়ার বায়স্কোপ দ্যাখো।’ (পৃ- ৬৫)
এখানে বায়স্কোপে লোকমুখে প্রচলিত লোকগান যা শুধুমাত্র সেই দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তার একটি রূপ এখানে ফুটে উঠেছে।

আবার দেখা যায় ভুবন তার মনে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে-
‘বড় দুঃখের কথা সুবল আজি,
প্রান খুলে তুই তোমার কাছে’ (পৃ- ৬৬)

আবার জয়ন্তের মুখেও গুনগুন করে গান শোনা যায়। সে জাল বাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং বিচ্ছেদের গান করে-
‘অতিজন্তের শুয়া পাখি গেল আমাই ছাড়ি,
পাখির বিরহ জালা সহিতে না পারি।’ (পৃ- ৬৭)
জয়ন্ত তার বউকে খুব ভালোবাসতো, তার কথা ভেবেই জয়ন্ত এই গান বিরবির করে ওঠে।

‘শাক দি মাছ ন ঢাইক্যো’ - কথাটির অর্থ হলো শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না।

এখানে প্রবাদ প্রবচন ব্যহার করা হয়েছে।

আবার গোলকবিহারীর ছোটভাই বলে-

‘বদ্দা আঁরার সোনার সংসারগিণ নো ভাইঙ্গো।’ (পৃ- ৮২)

এখানে প্রবাদবাক্যের ব্যবহার হয়েছে।

তথ্যসূত্র

পাল, অনিমেষকান্তি, লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রামনাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, পৃ : ১, ৪, ৪০, ৫৭.

অষ্টম অধ্যায় : সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

সামগ্রিক আলোচনা :

যা কাজ করার চেষ্টা করছি তার হয়তো অনেকটাই দেখাতে পারলাম না, এক সময়ের অভাবে আর যথেষ্ট বইপত্রের সংস্থান না থাকায়। তাই সুযোগ পেলে পরে এ বিষয়ে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকল। যা দেখাতে চেষ্টা করেছি যা দেখানো গেল না তা একটু আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক। যা দেখাতে চাইলাম কিন্তু দেখতে পারলাম না তা নিয়ে পরে সুযোগ পেলে চেষ্টা করা যাবে। যা দেখাতে চেষ্টা করলাম এবং যা দেখানো গেল না তা আলোচনা করে দেখা যাক। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হল অপ্রমিত শব্দের বিচার, সংজ্ঞা, পরিসর নির্ণয় এবং আঞ্চলিক ধারনা।

প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হল অপ্রমিত শব্দের বিচার, সংজ্ঞা, পরিসর নির্ণয় এবং আঞ্চলিক ধারনা । অপ্রমিত ভাষা কী? এখানে আলোচনার আগে প্রমিত ভাষা কী তা একটু বলে নেওয়া দরকার। শিষ্ট চলিত ভাষা বা মান্য ভাষা বা প্রমিত বাংলা। এটি মূলত শিক্ষিত জনের মৌখিকভাষা। সামাজিক ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের জন্য শিক্ষিতজনেরা ভাষার এই রূপটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রমিত ভাষা হল যে কোনো ভাষার মধ্যে সর্বজনীন ও সর্বজন ব্যবহৃত রূপ। প্রধনত সংবাদপত্র প্রচারে, পাঠ্যবই, গল্প, উপন্যাস, দলিল ইত্যাদি লিখিত রূপের ক্ষেত্রে প্রমিতের ব্যবহার করা হয়। প্রমিতের আরো একটি মৌখিক রূপ রয়েছে। সেটা নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে। মানুষ যখন সমাজের মধ্যে অবস্থান করে ভাই-বোন বাবা-মা ছেলে-মেয়েদের সাথে কথা বলে তখন ভিন্নরূপে বলে আরো মার্জিত ভাবে। প্রমিত অপ্রমিতের বিষয়টাও ঠিক এররকম। প্রমিত- অপ্রমিতের বিষয়টাও ঠিক এরকম। প্রমিত ভাষা সামাজিক ও সবার বোধগম্য ভাষা প্রমিতের সার্বজনীন রূপ আছে, নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে, অপ্রমিতের তা নেই। তবে অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক মানুষের মুখের ভাষা প্রমিতের ব্যবহার দেখা যায় না সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের চেনা জানা পরিবেশের মধ্যে খাপ খাইয়েই কথা বলে। তখন অপ্রমিতের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়।

বাংলা উপন্যাসে ভাষার মাধ্যম এই পর্বে তিনটি ভাগ দেখা গেল প্রথম পর্বে সাধুভাষা সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করা হল। প্রথমপর্বে উপন্যাসে সাধুভাষার প্রয়োগ সবচেয়ে বিশি হত। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের দুএকটি উপন্যাস আলোচনা করে কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করা হল। সাধুভাষা হল বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দবহুল, সুষ্ঠ সর্বজনবোধ্য অথচ নিয়মবদ্ধ ও কৃত্রিম ভাষারূপ হল সাধুভাষা। সাধারন ভাবে বলা যেতে পারে সংস্কৃতানুসারী যে লেখ্য বাংলা ভাষা উনিশ শতকের শুরুর দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচনার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল, সেই ভাষাকে বলে সাধুভাষা।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছিল যেটি সাধুভাষা নামেই পরিচিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) উপন্যাসগুলিতেও সাধুগদ্যের ব্যবহার রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে দেখানোর চেষ্টা করা হল শিষ্ট চলিত ভাষা বা মান্য চলিত। প্রমিত মৌখিক ভাষারূপের নাম বাংলায় একসময় শিষ্ট সাহিত্য ছিল। 'শিষ্ট' কথাটির অর্থ শান্ত, পরে শিষ্ট কথাটি বর্জন করে মান্য চলিত বাংলা নাম দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সেটাই চলিত ভাষা নামে প্রচলিত বলা যায়। যে কোনো শিষ্ট সাহিত্যের বা প্রমিতে ভাষারূপের একটি মৌখিক ও লিখতরূপ আছে। শিষ্ট সাহিত্য সাধারণ শিক্ষাদান, বিধানসভা, সংসদ, শিক্ষালয় এবং অন্যত্র নানা আচারিক বক্তৃতায়, সংবাদ মাধ্যমে, সংবাদপ্রচারে, ঘোষণা ও নানারূপ কথপোকথন। বাংলার এক প্রান্তের মানুষের সাথে অন্যপ্রান্তের মানুষের কথাবার্তায় নানা উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। আর লিখিত শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা, দলিলপত্রে, পাঠ্যবইয়া সাহিত্যের নানা অংশে বিশেষ করে আলোচনাত্মক রচনাতে ব্যবহৃত হয়।

১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সবুজ পত্রকে অবলম্বন করে চলিত ভাষাকেই সাহিত্য ও মাননের ভাষা হিসাবে মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। উনিশ শতকে সাধুভাষাকেই প্রমিত বাংলা হিসাবে ধরে নেওয়ার ফলে একটা শব্দরুচি ও বাক্যগঠণ বাঙালি লেখক ও পাঠকদের ক্ষতিকারক অভ্যাসে এসে গিয়েছিল। পরে যখন চলিত ভাষায় রচনার প্রধান ভাষা হিসাবে আভাস এল এখনো কিন্তু এই জন্মদোষ কাটল না। ক্রিয়াপদের স্বল্পতা বাক্যকে সবসময় ক্রিয়া নির্ভর করে তোলে।

বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার জন্য ভাগিরথী, হুগলী নদীর তীরবর্তী নবদ্বীপ শান্তিপুর এবং কলকাতায় প্রচলিত ভাষাকে নেওয়া হয়েছিল। এরই নাম শিষ্ট চলিত ভাষা এখন শিষ্ট চলিত ভাষায় বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনা করা হয়।

তবে একটু বলাবাহুল্য যে এখন শিষ্ট ভাষাতে কথা বলাকে তাদের কাছে মনে হয় হাস্যকর, লজ্জাকর, অপ্রয়োজনীয়, আঞ্চলিক উচ্চারণকে যতটা সম্ভব বিকৃত করে চমকসৃষ্টিকরী অর্থহীন শব্দকে নানারকম খিচুরী মার্কা কথায় বলা এ প্রজন্মের লক্ষণ। তাছাড়া অশুদ্ধ ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ, ইংরাজী উচ্চারণ বাংলিশ ধরনের অদ্ভুদ ভাষারীতি।

তৃতীয় পর্বে দেখানোর চেষ্টা করা হল শিষ্ট চলিত ভাষার লিখিত উপন্যাসের মধ্যে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ। এই রকম শিষ্ট চলিত ভাষার লিখিত উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। এই আঞ্চলিক উপন্যাস বা তথা অপ্রমিত শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় তার মধ্যে থেকে চারটি উপন্যাসকে নির্বাচিত করে এই গবেষণা সৌন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হচ্ছে। উপন্যাসগুলি হল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৪-১৯৩৫) অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬) দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) এবং হরিশঙ্কর জলদাসের 'জলপুত্র'(২০১২) । এক্ষেত্রে দেখানো যাক চারটি উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ কিভাবে হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে-

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে দেখানোর চেষ্টা করা হল উপন্যাসের মধ্যে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ। নির্দিষ্ট

আঞ্চলিক ও ভৌগলিক সীমাখন্ডে রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে জেলে জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে তাদের মুখ দিয়ে বলা আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ। বর্ষার মাঝামাঝি পদ্মায় ইলিশ ধরার মরশুনে দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে কুবের মাঝি মাছ ধরছিল। তার সাথে থাকে ধনঞ্জয় ও গনেশ। কুবের একটু জিরাতে গেলে আজান খুঁড়া বলে -

'জিরানের লাইগ্যা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়াল।' (পৃ- ৯)

- লেগে- লাইগা
- মর- মরস
- কেন- ক্যান
- বল দেখি- ক দেহি
- সারাটা- সারাডা (এখানে 'ট'-র পরিবর্তে 'ড'এসেছে আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগে)
- বাড়ি- বাড়িত্ (ত্-এর আগম ঘটেছে)
- দিয়ে নে- দিয়াল

'কুবের হাঁকিয়া বলে যদু হে এএএ- মাছ কিবা।' (পৃ- ৮)

- হে এএএ- প্লুতস্বরের ব্যবহার রয়েছে।
- কত - কিবা (আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ)

'গনেশ হঠাৎ মিনতি করে বলিল, একখান গীত ক দেখি কুবির হ, গীত না তর মাথা' (পৃ- ৯)

- কুবের- কুবির (আঞ্চলিক ভাষাপ্রয়োগ)
- তোর- তর।

'শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির, কুবের আবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা ইটা হইল কিবা? ক্যান? নয় মাস খালাস হয় না?' (পৃ- ১৫)

- শেষ- শ্যাষ,
- রাতে- রাইতে,

- গিয়ে- পুইরা,
- ইটা- এটা,
- কী করে- কিবা,
- কেন- ক্যান,

কুবেরের স্তিমিত চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠল। নকুল শয়তানি হাসি পরিহাস করে বলে-

'তুই দেখি কালাকুষ্টি কুবের, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইক্যা? ঘরে তো থাকস না রাইতে কিছু কত্তন যায় না বাপু।' (পৃ- ১৫)

- এল- আইল,
- কোথা থেকে- কোয়ান থেইক্যা।

শেষে বিরক্ত হয়ে কুবের বলল-

'চুপ যা গনেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা।' (পৃ- ১৫)

- করব- করুম,
- খাওয়া- খাওন,
- নিজের- নিজেগোর।

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করা হল।

'না না আমরা নওই রান্ধুম, তুমি খাও গিয়া। রাইতের জালে যাও বুঝি ইখানে রাইতের জল বাত্তন লাগেনা। বেহানে কটা বিকালে কটা খেই দিলেই হয়। অদৈন্য মাছ। কত মাছ ধরবায় তুমি।' (পৃ- ৩৪)

- রাঁধব- রান্ধুম,
- বওয়া- বাত্তন।

'কইরে সুবলা কি করবে কর। নাও ভাসাইয়া দিমু।'(পৃ- ৩৫)

- কোথায় রে- কইরে,
- দেব- দিমু।

‘তিনি লীলা বৃন্দাবনে আইসা সুবলাদি সখা আর ললিতা দি সখীসহ আদ্যশক্তি শ্রীমতী রধিকারে লইয়া লীলা কইরা গেছেন।’ (পৃ- ৩৫)

- এসে- আইসা,
- করে- কইরা।

‘কিশোর হাসিল : নারে সুবলা, না ঠিসারার কথা না! বাসন্তীরে আমার, তোর লগেই সাতপাক ঘুরাইয়া দেমু।’ (পৃ- ৪৫)

- ঘুরে- ঘুরাইয়া,
- সাথে- লগে।
- দেব- দেমু।

‘নারে সুবলা আমার মন যেমন কয় কথা খানা ঠিক না। যাবে লেংটা থাইক্যা দেখতেছি- ছোটোকালে যাবে কোলে পিঠ লইছি হাসাইছি কাঁদাইছি ডর দেখাহছি ভেউরা বানাইয়া দিছি- তারে কিবিয়া করন যায়; বিয়া করন যায় তারে যার লগে কোনো কালে দেখা সাক্ষাৎ নাই।’ (পৃ- ৪৬)

- থেকে- থাইক্যা,
- দেখেছি- দেখতেছি,
- নিয়েছি- লইছি,
- হাসিয়েছি- হাসাইছি,
- কাঁদিয়েছি- কাঁদাইছি,
- ভেরা- ভাউরা,
- বানিয়েছি- বানাইয়া,
- দিয়েছি- দিছি,
- জন্য- লগে।

‘কিশোর ডরার দিকে চাহিয়া বলিল ‘কি জাললা মাছ না নাই, চাইর পয়সার মাছ দাও।’ (পৃ- ৪৭)

- চার- চাইর।

‘রাগের ধারধারি না। মনের মানুষ থুইয়া যাই, শেষ বুক ধাপড়ইয়া কান্দি। অতঠকাঠকির বেসতি আমি করিনা।’

- থুয়ে- থুইয়া,
- থাপড়ে- ধাপড়ইয়া,
- কাঁদি- কান্দি,

‘কি তোমার আছে গো ব্যাদানি, বান্ধবা কি দিয়া।’ (পৃ- ৪৮)

- বাঁধবা- বান্ধবা (নাসিক্যিভবনের প্রয়োগ ঘটেছে)
- দিয়ে- দিয়া।

দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করা হল।

‘দে-খ্ দেখ্, ভাইমন অউর বহিমন, দেখো হাম খাড়া উঠলেক হো-খা-আ-আ-ড়া।’ (পৃ- ৩০)
ভাইগন- ভাইমন,

- আর- অউর,
- বোনগন- বহিমন ।

‘কুন কহথে মায় মাত্গোলক? কাভি মাতোয়ালা হনে নাহি শেকথে। এই দেখ। পাক্কা দেখ। হামারাই মাথাঠে খাড়া হায়। তব্ভি হাম মাতোয়াল? কাভি নেহি? এই দেখ্ হাম্ পারিড্ করেগা।’ (পৃ- ৩১)

- মেতেগেল- মাত্গোলক,
- মাতাল- মাতোয়ালা,
- আমরাই- হামারাই,
- মাথায়- মাথাঠে,
- হয়- হায়,
- করব- করেগা।

'দেখ হাম পারেড ভি করলেক, আভি হামকো অউর এক গ্লাশ দে। হামতো মাতোয়াল নাহি হোলক্ ...' (পৃ- ৩১)

- করব- করলেক,
- হল- হোলক্।

'নারায়ণ প্রসাদ বছর তিন আগে এইখানে একখান চা-বাগান কিনি নিসে। থ বাগান মাস ছয় পর হয়্যা গেইল বন্ধ। নারায়ণপ্রসাদ তর বাগান মাস ছয় পর হয়্যা গেইল বন্ধ। নারায়ণপ্রসাদ তর বাগানের গোডাউনটাক বানাইল শুকনো লঙ্কার গোড়াউন। ব্যাস সেই থেকে আসাম আর তমান-তামন জায়গায় সব পাইকারি কোকেনা হবার ধরিছে এই ক্রান্তি হাটত। স্যালায় ত ক্রান্তি হাটার ক্রানং নামডাক।'

(পৃ- ৩০)

- নিয়েছে- নিসে,
- হয়ে গেল- হয়্যা গেইল,
- গোডাউন টাকে- গোডাউনটাক,
- বান্যাল- বানাইল,
- ধরেছে- ধরিছে,
- সেখানে- স্যাল্যায়,
- এমন- ক্রানং।

'সে ত বছর খানেক আগে খুলি গেইছে। ত ফ্যাকটরি ত আর চলে না। গ্রিনটি বেচা হয়্যা যায়। গোডাউনটা শুকনো লকারই আছে।' (পৃ- ৩৩)

- খুলে- খুলি,
- গেয়েছে- গেইছে,
- হয়ে- হয়্যা।

হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাসে সংলাপের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করা হল।

'মা, ঘরত্ যাইতা নো?' (পৃ- ৭)

- ঘর- ঘরত্,

- যেও না- যাইতা নো।

'চন্দ্রমণি আইজো নো আইয়ে বউ? শ্বশুরের প্রশ্নে বাস্তবজগতে ফিরে আসে ভুবনেশ্বরী। বলে 'নো আইয়ে'। (পৃ- ৮)

- আজও- আইজো,
- না- নো,
- এসেছে- আইয়ে।

'অন্নচরণ বললো, গত পাঁচ বছরত প্রেমদাইশ্যার মত নাউট্যাপোয়া এই গোরামত্ নো আইয়্যে।' (পৃ- ১১)

- প্রেমের- প্রেমদাইশ্যার,
- নাট্যদলের ছেলে- নাউট্যাপোয়া,
- গ্রাম- গেরামত্,
- এলো- আইয়্যে।

'পানতাবুড়ি বলে উঠল 'কী সোন্দর নাচ্রে বাপ পোয়া ইবার। নাচ্ দেই এই বয়সতও বুকগান কালি খালি লা আর।' (পৃ- ১১)

- সুন্দর- সোন্দর,
- হয়েছে- ইবার,
- বুকখানা- বুকগান,
- লাগে- লা আর।

'অপুত, উঠ, নাচ শেষ অই যারগই। তুই নো কঅলি নাচ চাবি? ভুবনেশ্বরী, গঙ্গাপদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে।' (পৃ- ১১)

- পুত্র- অপুত,
- ওঠ- উঠ,

- হয়ে গেছে- যারগই,
- বললি- কঅলি।

'সুবলা বলেছে, আজিয়া আঁর লগে নাউট্যাপোয়া রাইত কাডাইব।' (পৃ- ১২)

- আজ- আজিয়া,
- সাথে- লগে,
- রাত- রাইত,
- কাটাব- কাডাইব।

'বিজন বহদ্দার আজিয়া লাল অই গেইয়ে গই।' (পৃ- ১৬)

- আজকে- আজিয়া,
- গেছে- গেইয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত উপন্যাসগুলির কাহিনী দেখানোর চেষ্টা করা হল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হল উপন্যাসের কাহিনীগুলো সংক্ষেপে, যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মানদীকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষদের জীবন ও জীবিকা। ঠিক তেমনিভাবেই আরো বাকই তিনটি উপন্যাসে আঞ্চলিক মানুষের জীবনযাত্রা ও তাদের মুখে অপ্রমিতের অবস্থান নির্দেশ করা হল এই অধ্যায়ে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর গ্রাম এবং তার আশেপাশের পদ্মার তীর সংলগ্ন কেতুপুর গ্রাম এবং তার আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মাঝি ও জেলেদের বাস্তব জীবনালেখ্যই যেন অঙ্কিত হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝি ও জেলেদের দরিদ্রের পদ্মার মাঝিদের জীবন সংগ্রামই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে লেখনি দিয়ে। তাদের প্রতিটি দিন কাটে দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা-দারিদ্রের সাথে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাটাই যেন তাদের জীবনের পরম আরাধ্য। এটুকু পেলেই তারা সুখী। কুবেরের পদ্মানদীর অসহায় দরিদ্রের মাঝি প্রতি নিয়ত অভাব অনটনের সাথে লড়াই করে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। মূলত কুবের কে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ধরে বাকি চরিত্র গুলির চিত্রন সম্পন্ন করেছেন উপন্যাসিক। উপন্যাসের নায়িকা কপিলা যদিও কুবের বিবাহিত এবং তার স্ত্রী জীবিত এবং তাদের সন্তান সন্ততি আছে। তবে কুবেরের স্ত্রী

মালা জন্ম থেকেই পঙ্গু। উপন্যাসে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হোসেন মিয়া। সে পদ্মার তীর সংলগ্ন মাঝিপ্রধান গ্রামগুলোর অসহায় মাঝিদের মাঝে প্রায় সেবকরূপেই আবির্ভূত। তবে আপাত দৃষ্টিতে তাকে সবার সেবক বলে মনে হলেও সেই সেবা কর্মের পিছনে রয়েছে এক দূরভিসন্ধি সে বহুদূরে একটা নির্জন দ্বীপের পত্তন করেছে। সে দ্বীপ নির্জন শ্বাপদসসংকুল। অথচ সেই নির্জন দ্বীপেই সে একের পর এক পাঠাতো পদ্মা নদীর অসহায় মাঝিদের, তাদের মুখোমুখি হতে হত, অস্তিত্ব রক্ষার কঠিণ সংগ্রাম। এখাবেই চলে অসহায় দ্বীপহীন পদ্মানদীর মাঝির জীবন। চিরটাকাল তারা কাটিয়ে দেয় এক অজ্ঞানতার ধোঁয়াশায় ভিতরে, এক গোলকধাঁধায় তাদের জীবন বন্দী, এ গোলাকধাঁধা, থেকে বের হওয়ার রাস্তা তাদের হইত জানা নেই কিংবা কেউ সাহস করে তা থেকে বের হতেও চায় না। এভাবেই কাটে পদ্মানদীর মাঝির প্রতিটা দিন-রাত আর কেটে যায় সারাটা জীবন। সেই জীবনের গল্পই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

তিতাসের তীরে গড়ে উঠেছে সৃষ্টিশীল জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা যে আন্তরিক মমতায় অদ্বৈত মল্লবর্মন তুলে এসেছেন তার উপন্যাসে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এক উপেক্ষিত সমাজের জীবন সংগ্রামের কাহিনী দিয়েছেন অবিনশ্বরতা।

চার খন্ডে ও দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এ উপন্যাসে তিতাস একটি নদীর নাম পর্বে তিতাস নদীর বৈশিষ্ট্য ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে তিতাস পাড়ের মালোদের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আছে গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ নামে দুই মালোর জীবন সংগ্রামের কাহিনী। এরাই অনন্তের মাকে নিয়ে যায় গোকর্ণ ঘাটে। গৌরাঙ্গ মালোর জীবন দরিদ্রে পিষ্ট এবং তার দিন আর চলে না। গৌরাঙ্গের জীবনচিত্র দেখে সহজেই বোঝা যায় তিতাসের জলের সাথে তাদের জীবন বাঁধা। তিতাস যখন জল কম থাকে, তখন মালোদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে বাঘারুর কাছে প্রকৃতি আনন্দভূমি নয়। প্রকৃতি তার কাছে জীবনের আশ্রমভূমি। বাঘারুর ভাষা, হৃদয় শরীর প্রকৃতির সাথে নিবেদিত প্রাণ, কখনোই আলাদা করা যায় না, উপন্যাসের ‘বনপর্বে’ দেখা যায় বাঘারু আর আকাশের চাঁদ একে অপরের দোসর হয়ে উঠেছে। এখানে বাঘারু কখনো আপনি খেয়ালেই প্রকৃতি হয়ে পড়েছে আবার প্রকৃতির চাঁদ কখনো মানবিক হয়ে উঠেছে। বাঘারু একটা ঢেলা কুড়ায়। বাঘারু একটা ঢেলা কুড়ায়। ঢেলাটা ছুড়ে বাঘারু দাড়িয়ে পড়ে। চাঁদটাও থেকে যায়। একটু দুরে ঢেলাটা পড়ে যাওয়ার ধুপ আওয়াজ হয়। চাঁদটার দিকে একটু ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকিয়ে বাঘারু আবার হাঁটতে শুরু করে হাঁসখালির বাঁধের দিকে। চাঁদও গড়াতে থাকে আপলচাঁদের দিকে। এখন বাঘারুকে একটু একটু করে উঁচুতে উঠতে হচ্ছে- কড়াইয়ের গা বেয়ে। চাঁদটাও একটু একটু করে ওপরে উঠে যেতে থাকে- আরো উত্তরে।

এই উপন্যাসের নায়ক বাঘারু। এই অনালোকিত, অনালোচিত, আত্মপরিচয়হীন, ভাষাহীন বাঘারুকে দেবেশ রায়

প্রকৃতির রংতুলি দিয়ে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যে বাঘারু প্রকৃতির সন্তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাঘারুকে উপন্যাসের প্রথম থেকেই পাওয়া যায় গাজোল ডোবার জোতদার গয়ানাথের ভৃত্য বা চাকর হিসাবে, তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেয়। কুকুরের সাথে বাঘারুর যে একত্মতা তা অসাধারণ।

'চর পর্বে' লেখক উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তাকে এমন ভাবে উপন্যাসের প্রতিবেদনে তুলে ধরলেন যেন তিস্তানদী আর নদী না থেকে হয়ে ওঠে প্রকৃতির আশ্রয়ভূমি। শুধু প্রকৃতিরই আশ্রয়ভূমি নয়। মানব জীবনের আশ্রয়ভূমি শীতকালে এই ভূখন্ডের মধ্যে দিয়ে পাথরের টিলা জেগে ওঠে, তাকে ঘিরে ভেজা বালিতে সেই টিলার জীবন্ত ছায়া সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘুরে যায়। এই ভূখন্ডের নতুন অংশ জুড়ে কোনো অরন্য জেগে ওঠে। যে নদী এমন ঘন ঘন বদলায়, যে নদীকে নদী হিসাবে চিনতে চিনতেই ভাঙা হয়ে যায়। নদীর ভেতর চলে যায় সে নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে নদীকে ব্যবহার করত। ব্যবহার বলতে যে শোষণ বোঝায়, তেমন ব্যবহার নয়। এ যেন মনে হয়, এ নিসর্গকে দেখতে পারে, পাহাড়, বন, নদী দিয়ে ঘিরে রাখা পাহাড় থেকে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছে এই নদী বন, পাহাড় এই সীমার দক্ষিনে কোনো পাহাড় নেই।

'মিছিল' পর্বে শেষ অধ্যায়ে বাঘারুর জন্মভূমি আপলচাঁদ এবং বাঘারু একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। আপলচাঁদ শুধু বাঘারুর জন্মভূমিই নয়, আপলচাঁদ তার কাছে একটা গোটা দেশ একটা গোটা পৃথিবী। ফলে বাঘারুর কাছে আপলচাঁদের সমস্ত দৃশ্যই তার চেনা এমনকি অপলচাঁদও তাকে নিজের অংশ ভেবে গ্রহন করেছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিজস্ব প্রবাহমান গতি আজ আধুনিকতার দাপটে ধ্বংসের দিকে চলেছে, প্রতিনিয়ত তার অবক্ষয় ঘটেছে। আবহমানের প্রকৃতি এখন মানুষের নির্দেশেই চলমান, সমাজ ও মানুষের সাথে প্রকৃতির সহাবস্থানের ইতিহাস এখন অতীত।

প্রকৃত পক্ষে বাঘারু মহাপ্রকৃতিরই সন্তান। তাই তিস্তার নদী বন্ধন, তিস্তার ব্যারেজ, তিস্তা পারের অর্থনৈতিক উন্নায়ন-এর কোনোটায় তার দিন যাপনের সাথে জড়িত নয়। ফলে তিস্তাপারের প্রগতির পথকে অস্বীকার করে বাঘারু মহাপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আত্মসমর্পন করে প্রকৃতির আরেক সন্তান মাদারি ও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে কারনে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে- সেই কারনে বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে কারনে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক সাপ খোপ চলে যাবে সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফেরস্টে বাঁচবে না। এই নদী বন্ধ ও ব্যারেজ দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়বে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে। এই অর্থনীতি ও উন্নয়নকে প্রত্যাখান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।

সে এখন সারারাত ধরে এই ফরেস্ট পেরবে- যেখানে সে জন্মেছিল। দুটো একটা রাস্তাও পেরবে। কাল সকালে আবার ফেরস্ট পেরবে। দুটো একটা হাটগঞ্জও পেরবে। কখনো মাদারির ঘুম পাবে। বাঘারু মাদারিকে বুকে তুলে নেবে।

উপন্যাসে আর এক প্রকৃতি মানুষের চরিত্র হল মাদারি ও মাদারির মা। যারা সামাজিক জীব হয়েও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। যাদের শুধু উত্তরবাসর বিস্তৃর্ণ লোকালয়ে নয় বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও আর্শয় নেই মাদারি ও মাদারির মা তাদের প্রতিনিধি। যাদের খাদ্য তালিকাতে আছে পশুখাদ্য তবু তারা বেঁচে থাকবে।

জলপুত্র শুরু হয়েছে ভুবনেশ্বরীকে নিয়ে যে কিনা অপেক্ষায় আছে পূর্বরাতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া তার স্বামী চন্দ্রমণির। উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরীর যে অপেক্ষা যেন শেষ হওয়ার নয়। আর তাই বোধ হয় দেখা যায় উপন্যাসের শেষেও ভুবন অপেক্ষায়মান। নিহত একমাত্র পুত্র গঙ্গাপদর লাশের সামনে বসে সে অপেক্ষা করছে গঙ্গার স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য। সে সন্তানের নাম গঙ্গা আগেই ঠিক করে রেখেছিল ‘বনমালী’ কেননা গঙ্গার প্রিয় মানুষ সমাজপ্রিয় জন জয়ন্ত তো গানের কলিতেই উচ্চরণ করেছিল ‘বনমালী তুমি পর জনমে হইও রাধা’। যে বণমালীকে নিয়ে গঙ্গা বা ভুবন এবং গঙ্গার যৌথ স্বপ্ন ‘আর বড় আশা আছিল আঁর বংশের কেউ বিদ্বান আইবো’। জেলেপাড়ার মানুষে বলতে চন্দ্রমণির বাড়িতে ব্যারিস্টার এসেছে।

জেলে পল্লীর মানুষ যে শিক্ষিত হবার নয় ব্যারিস্টার হবার নয় সে সত্য গঙ্গা উপলব্ধি করেছে তার শৈশব থেকেই। বাবা চন্দ্রমণি প্রকৃতির আঘার সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু গঙ্গা পেরেছে। বারবার পেরেছে। প্রকৃতির পর তার প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সমাজের মানুষ। নিজ সম্প্রদায়ের সকলকে সুসংগঠিত করে নায্য হিস্যা আদায়ের ব্যাপারে ঐক্যমত তৈরি করার সফলতার কারনেই সামাজিক সে শত্রুর বিষানল গঙ্গাকে বারবার আক্রমন করেছে। ধনবাঁশি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, শক্কুর আলী গভীর রাতে লোক দিয়ে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে দিয়েছে তাকে। সম্পদ আগ্রাসন এবং মুনাফা নিশ্চিত করার এই দুই প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল গঙ্গা। সরচ স্বপ্নচারীকে মাকে সাহস জাগিয়েছে এই বলে যে মা তুমি ভয় পেও না।

উত্তর পতেঙ্গার ভদ্রপল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন যে জেলে পাড়ার মানুষ এই গঙ্গা তার পাড়াটি আসলে কেমন? পাড়ার মানুষেরা কেমন? বলা যায় প্রায় মাইল দেড়েক দুয়েক দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে পাড়াটি শুয়ে আছে। হিন্দু ও মুসলমান পাড়াগুলো এই জেলে পাড়াটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই অবস্থান করছে সেখানে তাদের জীবন চলছে সংস্কৃতির পরিমন্ডলে। জেলেপাড়ার জীবন গাবের রসে চুবানো। এখানে প্রাণ আছে কিন্তু প্রাণবান পরিবেশ নেই। জীবন আছে কিন্তু জীবনের সুস্থির বাতাবরণ নেই। এদের জীবনরস ফুরিয়ে যায় পারস্পরিক গুঁতোগুতিতে, হিংসা, কুৎসা, গালিগালাজ, ছোটোখাট মারামারি এই পাড়াটিকে ভ্যাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ। আর আছে জেলেপাড়ার গায়ে শত শত শতাব্দীর দারিদ্রের গভীর চিহ্ন।

এই জেলে সমাজের ভেতর থেকে জেগে ওঠা মানুষ গঙ্গা, যে জেলেরা বুঝেছিল শক্কুর বা শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নিলেও সুদ থেকে নিজেদের মাছ রক্ষণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ প্রয়োজন। এক্যবদ্ধতা এবং শিক্ষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আসতে পারে মুক্তি। শিক্ষিত রামগোলাম ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সে প্রচেষ্টাতে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

কিন্তু সমাজ তো নীতি দিয়ে চলে না। আর চলবে না বলেই জেলেপাড়ার সকল মানুষ সবসময় একইভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকে না। বারবার ভাঙচুরের ভেতর দিয়ে সে ঐক্যকে ধরে রাখার প্রয়াস, গঙ্গার নিজের পরিবারের মানুষদের কাছ থেকেও সে আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে গঙ্গা আর ওর মা ভুবনেশ্বরীর সহায়সম্পদ। পাড়ার মানুষদের সামাজিক প্রচেষ্টায় রক্ষা পায় তারা, শশিভূষণ- শক্কুরের যে ষড়যন্ত্রে গঙ্গাপদকে হত্যা করার কথা চিন্তা করা হয় সেখানে কিন্তু হাজির জেলে প্রতিনিধি গোপাল ও গোপাল যে মিরজাফর তা সকলেই জানে, সে নিজেও কম জানে না। গোপালই বিভীষনের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার কর্মকান্ডের বিবরণ দেয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করা হল এবং নির্বাচিত চারটি উপন্যাস আলোচনার মাধ্যমে তা দেখা যাক।

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?’ (পৃ- ১৭)

- আমাকে- আমারে (সর্বনাম)

‘নাই কী রে, নাই? রোজ আমাদের মাছ দেওনের কথা না তর?’ (পৃ- ১১)

- তোর- তর (সর্বনাম)

‘গোপি মুখ ভার করিয়া বলিল, বতান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যে মুখে লয় কয় না?’ (পৃ- ১৭)

- বজ্জাতটা- সর্বনাম,
- আমারে- সর্বনাম।

‘জিরানের লাইগা মরস ক্যন ক দেহি? বাড়িত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়াল।’ (পৃ- ৯)

- লেগে- লাইগা,
- কেন- ক্যান,
- দেখি- দেহি,
- দিয়েনে- দিয়াল।

‘রাগ করিয়া বলিল কী কন!’ (পৃ- ১১)

- কী বলেন- কী কন।

‘নিয়া আয় গা, যা। বড়ো দেইখা আনিস।’ (পৃ- ১১)

- নিয়ে- নিয়া।

‘সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশি লইস, আঁই।’ (পৃ- ১১)

- কর কেন- করস ক্যন,
- কটা- কয়ডা।

‘কাল দিমু নিয্যস দিম।’ (পৃ- ১২)

- নিশ্চয়- নিয্যস।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘বাবা সুবলা তোর একটি ঘোড়া, আর কয়ডা পক্ষী আইক্যা দেও।’ (পৃ- ২৪)

- তোর- সর্বনাম।

‘না না আমরা নাওই রান্ধুম’ (পৃ- ৩৪)

- আমরা- সর্বনাম।

‘সে কথা কইনা জাল্লা, আমি।’ (পৃ- ৪০)

- সে- সর্বনাম।

‘তুই কেমনে জানবি এজনা আমার কি?’

- আমরা- সর্বনাম।

‘সুবলা তিরস্কার করিল ‘দাদা তোমারে কি মধ্যে ভূতে অমল করেছ।’

- তোমাকে- তোমারে (সর্বনাম)

‘একজনের কথা যে কইলা, সে মাইয়া কে?’

- সে- সর্বনাম।

অব্যয়

‘ভাঙা বেড়ার ফাঁকে দিয়া বোশনি ঢুকে, কেডায় যামুন ফক ফক কইরা হাসে।’ (পৃ- ২২)

- অব্যয়- ফকফক।

‘বুড়ারে দাঁড় টানতে দিয়া জোয়ান বেটা রইছে, আবার রস কেমুন পরাণ পিরীতি মধুলাগে।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- কেমুন- কেমন।

‘উঠান মাটি ঠনঠন পিড়া নিল সোতে, গঙ্গা মইল জল তিরাসে ব্রহ্ম মাইলে শীতে ‘ঘ অড়ইঠ অইঙলা সাধুর নির্বন্ধ তিশয্যে সুবল গানটি গাহিল।’ (পৃ- ৩৬)

- অব্যয়- ঠনঠন,
- ঘ অড়ইঠ,
- ঘ অইঙলা।

'ছোট জাল্লা, তোমার ত খুবই সাইৎ। চল, মাছ ডাঙ্গিতে লইয়া জায়।' (পৃ- ৪৪)

- অব্যয়- সাইৎ।

'খাড়, হেইশালা গুরুদাওয়াল, অখনই বাপের বিয়া মার সভা দেখাইয়া দেই।' (পৃ- ১০২)

- অব্যয়- অখনই- এখনই।

'অন্যমনস্ক অনন্তের মার দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া অন্য একজন বলিল। কাকের মুখে সিন্দুরাই আম লো মা।'

- অব্যয়- লো মা।

'অনন্তের মার মন উদ্দাম হইয়া উঠিল, কওনা গো ভইন তোমার কথাখান বিস্তারিৎ কইরা, শুনি, পুরাণ সার্থক করি।' (পৃ- ১১৭)

- অব্যয়- কওনা গো।

'বলিল যালা সুবলার বউ অনন্তের পাশে গিয়া শুইয়া।'

- অব্যয়- যা লা,

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

'মোর নামখানা ফোমে রাখিবেন হুজুর ফরেস্টচন্দ্র বাঘারুবর্মন।' (পৃ- ৩৯)

- আমরা- মোর (সর্বনাম)

‘গয়ানাথ সব শিখিবার চাছে, হে ফরেস্টার, মোক হালুয়াগিরি খান শিখি দে।’ (পৃ- ৩৯)

- আমার- মোক (সর্বনাম)

‘যা করিবার উমরায় করিবেন তোমরালা এ্যালায় হাল ঠেলিবার ধরিছেন।’ (পৃ- ৪৩)

- তোমরা- তোমরালা (সর্বনাম)

‘মুই হাল দিছু আর তুই বেটার ঘর ভটভটাছিস, শালা।’ (পৃ- ৪৫)

- আমি- মুই (সর্বনাম)

‘মোক ঐঠে যাবানাগিবে।’ (পৃ- ৫৯)

- আমার- মোক (সর্বনাম)

‘বীরেনবাবুর কথা শেষ হলে সে বলে বসে, হে এ বাবুসন (বাবুরা) তঁয় কহথে কি হামনিমন (আমরা) সব জমি ছেড়ে হ অউর বাগানিয়া লোক সব জমি দখল লে লিবে? ত হামনিমন কাঁহা যাবে।’

- তারা- তয় (সর্বনাম)
- আমরা- হামনিমন (সর্বনাম)

অব্যয়

‘তু বল না কঠো?

তু বল্ মাইকে মদেশিয়া মেয়ের রিনরিন গলা। (পৃ- ২২)

- লে লে শুন। তু আঁখ বুজা কর।’
- অব্যয়- কঠো, লে লে।

‘দে-খ্ দে-খ্, ভাইমন অউর বহিমন, দেখো হাম খাড়া উঠলেক হো-খা-আ-আ-ড়া।’ (পৃ- ৩০)

- অব্যয়- দে-খ্ দে-খ্ ,অউর।

‘হু-জু-উ-র মুই ফরেস্টার চন্দ্র আসি গেইছু।’ (পৃ- ৩৮)

- অব্যয়- হু-জু-উ-র,

‘আসিন্দির জোড় হাতে চিৎকার করে ‘হে বাপা, মোক ক্ষেমা দাও।’ (পৃ- ৪৫)

- অব্যয়- হে বাপা।

‘একেবারে পাবণ থাকিবে, নড়চড় না হবে।’ (পৃ- ৫৪)

- অব্যয়- নড়চড়

‘এইঠে ও ত স্যারের কাছে মোর কথাটা কহা যায়’ (পৃ- ৫৮)

- অব্যয়- এইঠে ও ত- এখানেও,
- কহা- বলা।

‘হয় হয় রওনা দিছে হে’।

- অব্যয়- হয় হয়, হে।

‘শালা কার কথা, কী কথা কিছু শুনবেক নাহ, চিল্লাখেত চিল্লাখে’। (পৃ- ৭৩)

- অব্যয়- চিল্লাখে।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রয়োগ

সর্বনাম

‘খেতে খেতে গঙ্গা মুখ তুলে বলেছে, মা আজিয়া তোয়ার মাছ বাঁধা খুব হোয়াইদ্যা অইয়ে।’ (পৃ- ২২)

- তোমার- তোয়ার (সর্বনাম)

‘গাঁজার কল্কিও নো লঅর।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- ল অর।

‘অ বদ্দা, অ জেডা, অ মামা আঁরে দুয়া মাছ দাও না।’

- অব্যয়- অ বদ্দা, অ জেডা, অ মামা।

‘আঁই ভুবনেশ্বরী মামীর ভাইনা। তাঁই আঁরে কুসুমিরে নাইয়র লই যাইবার লাই ডিডায়েদে।’ (পৃ- ৬৩)

- তাকে- আঁরে (সর্বনাম)

‘বাধা আইয়েন আজিয়া তোঁয়ারে কইদ্যে।’ (পৃ- ৬৮)

- তোমাকে- তোঁয়ারে (সর্বনাম)

‘মঙ্গলী বলে উঠেছিল, অ ছেয়ার, কীত্তা লাইগ্যা।’ (পৃ- ৮৩)

- ছোয়ার- ছেলের (সর্বনাম)

‘আঁই ভুল কইত পারি, আঁর খাতা কি মিছা কথা কইব না?।’ (পৃ- ৮৪)

- আমি- আঁই (সর্বনাম)

‘তোঁয়ার লগে আজিয়া দুই কড়ি বছর ঘর গরিব।’

- তোমার- তোঁয়ার (সর্বনাম)

‘ঠিক আছে আঁরা রাজি।’ (পৃ- ৯১)

- আমরা- আঁরা (সর্বনাম)

‘অ পুত, আর ইক্কিনি থক্কা। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগারের দিকে চোখ রেখে বলে ভুবনেশ্বরী।’ (পৃ- ৮)

- অব্যয়- অ পুত।

‘কইমপতি বলছে, বেচারির দেইলে কইলজা ফাডি যা গই। কিরইম্যা সোনার অঙ্গ কালা অই জারগই।’

- অব্যয়- কইলজা, ফাডি যা গই।

‘ঘা, অপুত খা। তোর জেডি বংশীর মা আজিয়া মাছ ইউন দিয়ে দে, ভুবনেশ্বরীর মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে ওঠে।’ (পৃ- ২১)

- অব্যয়- ইউন, দিয়ে দে, অপুত খা।

‘বকুলি বলে ‘তুঁই এরইম্যা গরি টিয়া দি দি আঁরে ত ঋণী গরি ফেলিলা বহদ্দর।’

- অব্যয়- এরইম্যা, দি দি, আঁরে।

‘আঁই কি তোঁয়ারে বাঁধা দিয়্যম না? কোনোদিন বাধা দি না? কঁত্তে আনিবার?’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- আঁই, তোঁয়ারে (তোমারে), কঁত্তে (করতে)।

‘ব্রজেন্দ্র মাগইন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘অই হালার পোয়া কী অনয়ে তোর আঁইস্যচ্ পর্যন্ত কিছু নো কঅর। গাঁজার কল্কিও নো লঅর।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- ক অর, ল অর।

‘মাগইন্যা ধীরে ধীরে বলল। আজিয়া দুইজ্যা আঁর মামী আঁরে খুব অপমান গইজ্যে।’ (পৃ- ৩২)

- অব্যয়- আঁর, গইজ্যে।

‘অ বউ কন্ আইস্যে চাও। তোঁয়ার বদ্দা লাগে বলে, তোঁয়ারে নাইয়র নিত আইস্যে।’

- অব্যয়- অ বউ।

‘মামী আঁরারলাই অপেক্ষা গরি থাইবো। আঁরা নো পৌঁছন পর্যন্ত ধরফরাইবো। নদীর পথ। যাইতে বউত সময় লাগিবো।’ (পৃ- ৩৪)

- অব্যয়- আঁরারলাই, আঁরা নো।

চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত অপ্রমিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার দেখানোর চেষ্টা করা হল। অপ্রমিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করতে গিয়ে, নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’(১৯৩৪-১৯৩৫), অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’(১৯৫৬), দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’(১৯৮৮) এবং হরিশঙ্কর জলদাসের ‘জলপুত্র’(২০১২) এই উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ অপ্রমিতের ব্যবহারে কতদূর সার্থকতা পেয়েছে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে। ধ্বনি অর্থাৎ sound। ব্যাপক অর্থে পাখির কলধ্বনি, হাততালির শব্দ সব sound বা ধ্বনি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এগুলি আলোচ্য নয়। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে phone বলা হয়, বাংলাতে বাগধ্বনি বা phone এই ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হল বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ। বিশেষ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট নাম কে বোঝায় সেই বিশেষ্য বা নামের পরিবর্তে যা বসে তা বিশেষণ আর কোনো কাজ বোঝালে ক্রিয়াপদ। নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করা হল-

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য, বিশেষণ

‘ধনঞ্জয় বলে সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।’

- সাঁঝের দর- সন্ধ্যাবেলার দাম,
- বিশেষণ- সাঁঝের,
- বিশেষণ- দর

‘রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদল পাঁক দিমুনে ছুঁইড়া মুখের মধ্যে।’

- একদল পাক- একদলা পাক
- বিশেষণ- একদল
- বিশেষ্য- পাক।

‘গণেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়াবই মেলায় যামু।’

- ঢোঁক গিলিয়া- ঢোঁক গিলে
- বিশেষণ- গিলিয়া
- বিশেষ্য- ঢোঁক।

‘নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে, আমি আলাম গো কুবির দা।’

- গদগদ কণ্ঠে
- বিশেষ্য- কণ্ঠ
- বিশেষণ- গদগদ।

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : ক্রিয়াপদ

‘ধনঞ্জয় বলে সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।’

- জিজ্ঞাসা করা- জিগা (ক্রিয়াপদ)

‘নাই কিরে নাই রোজ আমাদের মাছ দেওনের কথা না তর? আয় গা, যা। বড়ো দেইখ্যা আনিস।’

- দেওয়ার- দেওনের (ক্রিয়াপদ)
- দেখে- দেইখ্যা (ক্রিয়াপদ)
- আনিস- আনিস (ক্রিয়াপদ)

‘কুবের মাথা নাড়িল আইজ পারুম না শেতলবাবু, আজানখুড়া সিধা মোর দিকে চাইয়া রয়েছে, দেখ না?’

- পারব না- পারুম না (ক্রিয়াপদ)
- চেয়ে- পাইয়া (ক্রিয়াপদ)

‘ধনঞ্জয় তৎক্ষনাৎ রাগ করিয়া বলিল মিছা কইলাম নাকিরে কুবির? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।’

- বললাম- কইলাম (ক্রিয়াপদ)
- জিজ্ঞেস- জিগাইস (ক্রিয়াপদ)

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য বিশেষণ

‘দাড়া ফুলেরে আগে দেইখ্যা লই। বড় রঙ্গিলা ফুল। কিন্তু চিনতে পারলামনা। এই মাইয়ারে জিগা ইটা কি ফুল কইয়্যা যাক।’ (পৃ- ৪৫)

রাঙা/লাল ফুল- রঙ্গিলা ফুল

- রঙ্গিলা- বিশেষণ
- ফুল- বিশেষ্য।

‘নইদার পুতে কি কয়! আমার মাথায় শোলার মুটুক উঠল না, আর লাগি কি তোর মাথা নুয়ান লাগছে দশজনের বৈঠকে?’

শোলার মুটুক-

- বিশেষণ- শোলা
- বিশেষ্য- মুকুট।

‘তার অন্যমকস্কতাকে নির্মমভাবে আঘাত দিল মঙ্গলার বউকি গ বিন্দাবনের নারী, কোন কালো চোরা লড়দা গেছে মাইরা বাঁশের বাড়ি।’

- বিশেষণ- বাঁশের,
- বিশেষ্য- বাড়ি

‘কি খামু তবে’(পৃ : ১৩)

- খাওয়া- খামু (ক্রিয়াপদ)

‘করমালী বলে, বন্দালী ভাই, কইছ কথা মিছে না। তোমার আমার ঘরের মানুষ ... ফজরে উইঠা মুনিবের বাড়ি গিয়া ঘুমের অলস ভাঙ্গি।’(পৃ: ২১)

- বলা- কইছ (ক্রিয়াপদ)
- উঠে- উইঠা (ক্রিয়াপদ)
- ভেঙে- ভাঙ্গি (ক্রিয়াপদ)

‘সে তখন পরের বাড়ি কাঁথা সিলাই করে, আর সেই সূচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে।’ (পৃ: ২২)

- সেলাই- সিলাই (ক্রিয়াপদ)
- এসে- আইয়া (ক্রিয়াপদ)
- বেঁধে- বিন্ধে (ক্রিয়াপদ)

‘বাসন্তী তার মা বলল উঠানজোড়া আলিপনা আকুম; অ বাবা কিশোর, বাবা সুবল; তোর একটা ঘোড়া, আর কয়টা পক্ষী আইক্যা দেও।’ (পৃ: ২৮)

- আঁকা- আকুম (ক্রিয়াপদ)
- এঁকে- আইক্যা (ক্রিয়াপদ)
- দাও- দেও (ক্রিয়াপদ)

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য বিশেষণ

‘তোর বাপ কইসে। কোটত শেয়াল খাগের বেটা। শালো ছাগির ছোয়া।’(পৃ- ৪৫)

শোয়ালখাগের বেটা - শেয়াল খেগোর বেটা

- বিশেষ্য- বেটা
- বিশেষণ- শেয়ালখাগের

‘গয়ানাথ পেছন থেকে বনমোরগের চিৎকার করে ওঠে ‘শালো মুই হাল দিছু, আর তুই বেটার-ঘর ভটভটাছিস, শালো,’ (পৃ- ৪৫)

- বিশেষ্য- বেটার ঘর
- বিশেষণ- ভটভটাছিস

‘শালো ছাগির বেটা, যা কেনে তুই হালার ধর মুই না যাও জরিপের পাখে,’ (পৃ- ৪৫)

- ছাগির বেটা- ছাগলের বেটা
- বিশেষ্য- বেটা
- বিশেষণ- ছাগির

‘মুই না চাও পালটিয়া গান। নামের পালাটিয়াখান ঢলঢলাছে খলখলাছে। মোক একখান মানষির নাম দেন।’

- বিশেষণ- ঢলঢলাছে, খলখলাছে।

‘মুইত কহিছু বাপবক, তোমার কি এ্যালায় লুকি থাকিবার বয়স।’ (পৃ- ৩৬২)

- বলছ- কহিছু (ক্রিয়াপদ)
- লুকিয়ে- লুকি
- থাকবার- থাকিবার।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : ক্রিয়াপদ

‘লে লে তু আঁখ বুজা কর।’

- বন্ধ কর- বুজা কর (ক্রিয়াপদ)

‘হুজুর মুই ফরেস্টচন্দ্র আসি গেইছি।’

- এসে- আসি (ক্রিয়াপদ)
- গেছি- গেইছি (ক্রিয়াপদ)

‘নো নো কাঠ ভাসি যাছে, কাঠখানা ভাসি গেলাক আর তঁয় কইয়ে ভাসি আইলক।’

- ভেসে যাচ্ছে- ভাসি যাচ্ছে (ক্রিয়াপদ)
- এল- আইলক (ক্রিয়াপদ)

‘সে জোতদার টোতদার নিয্যা যা কওয়ার বাও।’

- নিয়ে- নিয্যা (ক্রিয়াপদ)
- বলার- কওয়ার (ক্রিয়াপদ)
- বল- কও (ক্রিয়াপদ)

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে অপ্রমিত শব্দ : বিশেষ্য, বিশেষণ

পানতাবুড়ি বলে উঠল কী সোন্দর নাচ্‌রে বাপ পোয়া ইবার।’ (পৃ-৯)

- সুন্দর নাচ- সোন্দর নাচ
- বিশেষ্য- নাচ,
- বিশেষণ- সোন্দর।

‘ভুবনেশ্বরী, গঙ্গাপদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে।’ (পৃ- ১১)

- ফিসফিস- বিশেষণ।

‘হরিবন্ধু দেখল তার পুত্রবধূরে চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।’ (পৃ- ২৯)

- চোখ- বিশেষ্য,
- আগুন- বিশেষণ।

‘নদীর দিকে তাকিয়ে মাগইন্যা ভাবতে লাগল- নারীর রূপ নারিকেলের মালার মত।’ (পৃ- ৩৪)

- বিশেষ্য- নারীর রূপ,
- বিশেষণ- নারিকেলের মালার মত।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসের অপ্রমিত শব্দ : ক্রিয়াপদ

‘মা ঘরত যাইতো নো।’ (পৃ- ৭)

- যেতো- যাইতো (ক্রিয়াপদ)

‘চন্দ্রমণি আইজা নো আইয়ে বউ’ (পৃ-৮)

- আসেনি- নো আইয়ে (ক্রিয়াপদ)

‘পানতাবুড়ি বলে উঠল ‘কী সোন্দর নচরে বাপ পোয়া ইবার নাচ দেই এই বয়সতও বুকগান খালি খালি লা আর।’ (পৃ- ১১)

- এবার- ইবার (ক্রিয়াপদ)
- নাচরে (ক্রিয়াপদ)

‘বহদ্দারকে জিজ্ঞাস করল; এই মাছ উনর দাম কত দত্তন পড়িবো বহদ্দার (পৃ- ১৭)

- দাও- দাওন (ক্রিয়াপদ)

‘তোঁয়াত্তোন এই টিয়া ফেরত দত্তন পাইতো না। শুধু আর মিক্কে ইক্কিনি চাইবা, লোভী চোখ কথাগুলো বলে বিজ।’ (পৃ- ১৮)

- পারতনা- পইত্তোনা (ক্রিয়াপদ)
- চাইব- চাইবা (ক্রিয়াপদ)

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হল সংলাপে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ তার তালিকা ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ। মূল গবেষণার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ''বাংলা কথাসাহিত্যে অপ্রমিত শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগকৌশল নির্বাচিত : নির্বাচিত চারটি উপন্যাস'' এর মধ্যে আমার আলোচ্য বিষয় আটটি অধ্যয়ের মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়টি। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ : তার তালিকা প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ'। এঅধ্যায়ে দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৪-১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৮), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) ও হরিশঙ্কর জলদাসের 'জলপুত্র' (২০১২) এই চারটি উপন্যাসে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ ও প্রাসঙ্গিকতা।

বাংলা শব্দভান্ডার হল বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার যার মূল এবং আদি উৎস পালি এবং প্রাকৃত ভাষা দ্বারা, বাংলা ভাষাতে পরের কালে ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দরূপ ও পুনঃঋণশব্দ গ্রহণ করা হয়েছে, বিভিন্ন ভাষার সংপর্শে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে থেকে তাই বাংলার শব্দভান্ডার বর্তমানে অসংখ্য শব্দসম্বৃদ্ধ ও বিচিত্র। বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ও নানান ভাষার সংস্পর্শে এর শব্দভান্ডার বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলমান শাসন পত্তনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এল ইংরেজি। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বহুশব্দ বাংলা ভাষাতে প্রবেশ লাভ করে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

'গণেশ ক্ষুন্ন হইয়া বলিল, তুই নি গোসা করস কুবির করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?'

- গোসা- রাগ অর্থে। এটি আরবী শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : নকুল, কুবেরকে জানাই তার স্ত্রীর মালার রাজপুত্তের মতো ছেলে হয়েছে। গোরা, উজ্জল বর্ণ। কুবেরের চোখ দুটো একথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নকুল শয়তানির হাসি হেসে কুবেরকে বলে গোরাচাঁদ এল কোথা থেকে। ঘরে তো থাক না কুবের কিছু বলা যায় না। ছেলে হয়েছে একথা শুনে গণেশ খুব খুশি হলেও কুবের তাকে চুপ করিয়ে দেয়। বলে ছেলে দিয়ে করব কী? নিজের খাওয়া জোটে না। একথা প্রসঙ্গে গোসা শব্দটি গণেশের সংলাপে উঠে এসেছে।

'হ, বউ তো গোরাই, হ?' (পৃ- ১৫)

- গোরা- হিন্দি শব্দ

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : নকুল কুবের কে জানাই যে, তার ছেলে হয়েছে এবং রাজপুত্তুরের মতো উজ্জ্বল চাঁদবর্ণ তার রূপ, নকুল শয়তানির হাসি হেসে জানাই তুই তো কালাকুষ্ঠি কুবের গোরাচাঁদ এল কোথা থেকে? ঘরে তো রাতে থাকিস না। কিছু বলা যায় না, নকুলের একথা শুনে গনেশ জানাই 'বউ গোরা না নকুলদা'।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

'সুবলাকেও সাহস দিল 'না সুবলা ডরাইস্না।' (পৃ- ৩২)

- ডরাইস্না- ভয় পাস না। (হিন্দি শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : তিলকচাঁদ নৌকার দাঁড় টানছিল সে সময় কেউ একজন কিশোর আঘাত পায়। সুবল দাঁড় টানছিল। পার পারছিল না তার কিছুতেই। বৈঠার আওয়াজ বেসুরো ঠেকলে কিশোর মনকে প্রবোধ দিয়ে একথা বলে সুবলকে।

'খেলাতে দোলপূর্ণিমায় খুব আরব্বা হয়। মাইয়া লোক করতাল বাজাইয়া যা নাচে। নাচত না।
যেন পরীর মত নিত্য করে।' (পৃ- ৪৭)

- পরী- শব্দটি ফারসি শব্দ। যার অর্থ সুন্দরী পাখাওয়ালা নারী।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : চৈত্রের মাঝামাঝি। বসন্তের তখন পুরো যোবন। তখন দোল পূর্ণিমা। মানুষ নিজেকে জিনে রাঙায় তাতে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। তখন তার আত্মপর বিচার না করে সকলকে রাঙিয়ে আপন করে তোলে। তেমনি রাঙানোর ধুম পড়ে গেল শুকদেবপুরের খলাতে। তারা ঘটা করে দোল খেলবে। মোড়ল গায়ের রায়ত হিসাবে কিশোরও নিমন্ত্রিত হল। সেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোলি গানবাজনা রঙখেলা, খাওয়াদাওয়া হবে। উপরের কথাটি তিলক তাদের বলে এবং তিলকের কথা শুনে লোভ হয়। তিলকের কথাতে 'পরী' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

'তুবল্ মাইকে মদেশিয়া মেয়ের রিনরিন গলা।
লে লে শুন। তু আঁখ বুজা কর। উসকো বাদ ই টিকিটপর।
হাতে লাগা দে উঠবেক উ আমি কিন লিব।' (পৃ- ২২)

- তু বল- তুই বল (হিন্দি শব্দ)

- শুন- শোন(হিন্দি শব্দ)
- আঁখ বুজা কর- চোখ বন্ধ কর (হিন্দি শব্দ)
- উসকো- ওকে (হিন্দি শব্দ)
- টিকিট (ইংরাজী শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হাটে একটি ছেলে 'পশ্চিমি লটারি বিক্রি করছে, প্রিয়নাথ সেখানে গিয়ে জানাই 'হলকা ক্যম্প' বসবে তাই মাইকে কিছু বলতে পারবে না। প্রিয়নাথ হাট কমিটির দিকে যায়। আর মেইকে রিনরিনে গলাতে শুনতে পাই টিকিট বিক্রির বিভিন্ন কথা।

'ধূপগুড়ি হাট ত পাইকারি হাট' (পৃ- ৩২)

- পাইকারি- ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : হাটের রাস্তার দুদিকে হ্যাজাক বাতি, ডান হাতিতে একটু দূরে ইন্টার প্রভিলিয়াল ট্রাক দাঁড়ানো। সুহাস যেন হাটের ম্যাপটা আরো একবার ছেকে নিতে চাই। চায়ের দোকানের লোকটা অর্থাৎ মালিকটা, সুহাস যখন চা খাচ্ছিল তখন তার কাছে এক ডিশ মিষ্টি এনে বলে নিন স্যার কলকাতার মিষ্টি, তখন সেখানে হাট কমিটির বয়স্ক লোকটি এসে বসে এবং ধুপগুড়ির হাটের কথা বলেন পাইকারি হাট ওটি। এপ্রসঙ্গে পাইকারি কথাটি এসেছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে সংলাপে অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের মিশ্রণ

'ভুবন বলল 'তোঁয়ার আশিব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যো।' (পৃ- ২৭)

- কেলাস ফোরত- ক্লাস ফোর (ইংরাজী শব্দ)

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ : গৌরাঙ্গ সাধুর প্রতি ভুবনেশ্বরীর অগাদ ভক্তি। কারন সাধুত্বের জন্য যেমন তেমনি জেলেপাড়ার বিদ্যার গুরুত্ব উপস্থাপনের জন্য তেমনি। ভুবনের প্রনামের জগতে সাধু দুহাত তুলে বলেন। প্রণাম মা জননী, তোমার ছেলে লেখাপড়া করে নি? তখন ভুবন তার ছেলে গঙ্গাপদের সম্বন্ধে জানাই যে। গঙ্গাপদ ক্লাস ফোরে উঠেছে। সাধু জানাই পড়াশোনা করলেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা।

'বলল হালার পোয়াত্তোন কোনো শরমভরম নাই। হুদি বউ লই ফুতনর চিন্তা।' (পৃ- ৪২)

- শরমভরম- ফারসি ভাষা।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- পূর্ণচন্দ্র গত মাসে ছেলের বিবাহ দিয়েছিল। আশা ছিল বড়ো ছেলে রামপদ পমিৎকর্মা হয়ে উঠবে। কিন্তু আদতে তা হচ্ছে না। সকাল সন্ধা ঘরের ভিতর থাকে বউয়ের চারপাশ ঘুরঘুর করে। এ প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র কথাটি বলে ওঠে।

'বাআজি অল, আঁই অসহায় উগ্‌গা মাইয়াপোয়া। তোঁয়ারা জান স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি বিয়াগগুনের মানুষ গরিবাল্যাই আঁই কষ্ট মনে নো গরিব। (পৃ- ৫৮)

- মনে- আরবী শব্দ।

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ- ভুবন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সভার কাছাকাছি এগিয়ে এলো, উপস্থিত মানুষগুলো তাকে পথ করে দিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভুবন সভার ভিতরে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম বললো মাথাই মাছের চুপড়ি নিয়ে পথে পথে ঘুরি। এ কথা প্রসঙ্গে উপরের প্রসঙ্গটি এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে নির্বাচিত চারটি উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান। ভাষার মূল কথা হল বৈচিত্র। কিভাবে ভূখন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে; বিভিন্ন জাত ও বর্ণের মধ্যে বা বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী ভাষীর মধ্যে, বিভিন্ন পরিস্থিতি বা রীতিতে ভাষার ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গ বিষয়ে ভাষা খুবই সূক্ষ্মবেদী। প্রসঙ্গ যখন বদলে যায় ভাষা ব্যবহারের হেরফের দেখা যায় একেই সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের রেজিস্টার বলা হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ভাবে কথা বলা।

মানুষ সামাজিক জীবন। সমাজের মধ্যে তাকে সবার সাথে মিলে মিশে চলতে হয়। কিন্তু সমাজের শ্রেণিগত দিক থেকে সমাজের মানুষের অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণি ও অশিক্ষিত শ্রেণি মানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তন উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থানে মানুষের মুখের ভাষা পরিবর্তন।

সমাজ ভাষাবিজ্ঞান এমন একটা জিনিস যে অঞ্চলের বুলির মধ্যে একই মাত্রার তফাৎ থাকলে অন্য অঞ্চল হলে তাকে ভাষা বলে। এর কারন ভাষিক নয়। ঐতিহাসিক নয়। রাজনৈতিক তথা সামাজিক ইতিহাস ধরা যাক ক. একটি অঞ্চল যেখানে মান্য বাংলা বা শিষ্ট ভাষারূপকে ভাষা বলা হয়ে আবার খ. একটি অঞ্চল যেখানে উপভাষা রয়েছে। তাহলে ক এর সাথে খ এর তফাৎ রয়েছে। কিন্তু গ-যদি মান্যচলিত বাংলা হয় তাহলে 'ক' ও 'গ' এদে মধ্যে ভাষাগত দিক এর রাজনৈতিক সত্ত্বা আলাদা অথচ ঐতিহাসিক ভাবে তারা সম্পৃক্ত।

এখানে নির্বাচিত চারটি আঞ্চলিক উপন্যাসে সেই অঞ্চলের মানুষদের ব্যবহৃত মুখের ভাষার কীরূপ অবস্থান তা আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক-

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

‘রাসু ঝিমাইয়া পড়িতেছিল, ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, ময়নাদ্বীপে থেইক্যা আলি না রাসু?

হ

পালাইয়া আইছস?

হ বৈশাখ মাসে।

বৈশাখ মাসে? এতকাল কই ছিলি তুই

নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যুদবারে আইলাম

সুলপী। কমুনে খুড়া সগগল কমু। অখনে ক্ষুধায় মরি। - অ কুবিরদা; কিছু নি দিবার পার?’

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে দেখা যাক একই ভুখন্ডে সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার মিল থাকলেও এদের ভাষাপ্রয়োগের পার্থক্য বর্তমান অর্থাৎ সমাজের একটা স্তর তৈরি হয়েছে উঁচু শ্রেণি ও নিচু শ্রেণির একটা স্বচ্ছ ধারনা তৈরী হয়। নায়ক কুবের তার ভাষাভঙ্গিতে আঞ্চলিকতা বর্তমান থাকলেও তা অন্যের ভাষা থেকে পৃথক ভাবে অবস্থিত। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও দেখা যায় বিভাগ। রাসুও কুবেরের কথাতেই সে রূপ বর্তমান।

কুবের ও কপিলার কথাতে-

‘মনডা কাতর বড়ো ...

চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, মন কাতর ক্যান

রে কপিলা?

কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে!

সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।

হ?’ (পৃ- ৬০)

এখানে কপিলার কথাতে তার স্বামীর প্রতি টান ও ভালোবাসা যেন আর গোপন করে রাখতে পারেনি। কপিলার মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কুবেরের কাছে। অর্থাৎ তার স্বামী তার সংসার তার অন্তরে গাঁথা আছে। স্বামীকে ছেড়ে সে দূরে থাকলেও তার প্রতি কাতর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। একজন নারীর জীবনে স্বামী ও সংসার যে সব কিছু তা কপিলার কথাতেই ধরা পড়েছে।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সমাজে অবস্থিত মানুষের মুখের কথাতে সামাজিক কথোপকথনে উঠে এসেছে সেখানকার মানুষের মুখের ভাষার ও পৃথক পৃথক ভাষারূপ, একই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান হয়েছে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। আঞ্চলিকতা সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যাক।

সামাজিক অবস্থানে দরিদ্রতা চিত্র ফুটে উঠেছে করমালী ও বন্দেআলী মিয়ার কথাতে -

করমালী বলে, ‘বন্দালী ভাই, কইছ কথা মিছেনা। তোমার আমার ঘরের মানুষ! তোমার আমার ঘরই নাই তার আবার মানুষ! দয়া কইরা রাইতে থাকতে দেয়- থাকি; ফজরে উইঠ্যা মুনিবের বাড়ি গিয়া ঘুমের আলস ভাঙ্গি। ঘরের সাথে এইত সম্বন্ধ। কি খায়, কি পিন্ধে কোনোদিন নি খোজ রাখতে পারছি?

বন্দেআলী খানিক ভাবিয়া নিয়া বলে, বেবাকই বুঝি করমালী ভাই। তবু মুণিবের ঘরে পঞ্চ সামগ্রী দিয়া খাইবার সময় ঘরের কথা মনে হয়। গলাই ভাত আইটকা যায়। আর খাইতে পারি না।’ (পৃ- ২১)

করমালী ও বন্দেআলী দুজনেই কাজের জন্য বাইরে থাকে দীর্ঘ খাটুনির পর যখন খেতে বসে তখন তাদের বাড়িতে স্ত্রী কথা মনে পড়ে। আবার বাড়ি যখন ফেরে তখন তার স্ত্রী কাঁথা সেলাই করতে যায় রাতে তাই তার স্ত্রীকে পায় না। এর মধ্যে চরম দারিদ্রতার কথা ফুটে ওঠে। করমালীর স্ত্রীর ধনে ভাঙতে ভাঙতে হাতে কড়া পড়ে যায় তার চিত্র করমালীর বর্ণনাতে ফুটে ওঠে।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

সমাজে ভাষাভাষি মানুষের কথা বলার মাধ্যমে সে অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে তেমনি আঞ্চলিক ভাষাভাষি মানুষদের মুখের কথা এবং বাইরে থেকে আগত মানুষদের কথাতে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাক।

নাউছার আবার বলে ওঠে -

‘আর ঐঠে কী লেখা মন্ত্রীমশাই, ঐ যে মানষিটার

পিঠত?’

যোগানন্দ বলে -

‘কালি থিকা ত এইঠে হলকা ক্যাম্প বসিবে -

‘ও’- নাউছার বুঝে যায়। একটু চুপ করে থাকে,

তারপর আপন মনেই বলে ‘হলকা ক্যাম্পত

জমি দিবে আর পশুহাসপাতাল বলদ দিবে, তবেত

মোর এইঠে সংসার হবা ধরিবা।’ (পৃ- ১৬)

প্রিয়নাথ হাটে যে ছেলেটি টিকিট বিক্রি করছিল তাকে গিয়ে জানাই মাইকে একটু বলতে যে হলকা ক্যাম্প বসবে। হল্কা ক্যাম্প কথায় ছেলেটি বলে -

‘মানে কোনো কালচার ফাংশন হবে?

কী? ফাংশন

হ্যাঁ, মানে কোনো আর্টিস্ট আসবে?

আরে না না, এ ত সরকারের ব্যাপার ফাংশন না।

তাহলে সবাইকে বলতে বলছেন যে?

বললাম ত জমিজমি মাপামাপি হবে, রেকর্ড হবে,

অপারেশন বর্গা।’ (পৃ- ২১)

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে সমাজভাষাবিজ্ঞান

‘চন্দ্রমণি আইজো নো আইয়ে বউ? শ্বশুরের প্রশ্নে বাস্তবজগতে ফিরে আসে ভুবনেশ্বরী। বলে, ‘নো আইয়ে।’ (পৃ- ৮) ভুবনেশ্বরীর স্বামী চন্দ্রমণি। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই উথালপাথাল বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে কারন তার স্বামী গত রাতে আকাশ যখন আলকাতরার মতো মেঘে ঢাকা, বাতাস যখন উত্তেজিত তখন সে সঙ্গীদের সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে গভীর সমুদ্রে। এবং সে যখন ফিরে আসার কথা তখন সে ফিরে আসে নি। পরের দিনের সন্ধেবেলাতেও নয়। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে জেলে জীবনের একটি দরিদ্র পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তাদের বৃত্তিমূলক কাজ জেলে জীবনের কথা উঠে এসেছে।

‘খা, অপুত খা। তোর জেডি বংশীর মা আজিয়া মাছ ইউন দিয়ে দে।’ ভুবনেশ্বরীর মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে ওঠে।’ (পৃ- ২১)

‘আঁরার হঙ্গিয়াঅল পত্তিদিন নানা রইম্যা মাছ দি ভাত খা, আঁরা পত্তিদিন মাছ দি ভাত খাইন্যুপারি। তুঁই শুধু ডাইল আর শাক রাঁধো। অভিযোগের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গঙ্গা।’ (পৃ- ২১)

চন্দ্রমণি ফিরে না আসার পর ভুবনের সংসার চালানোর দায়িত্ব তার উপরই পরে কিন্তু তার ছেলে গঙ্গাপদকে সুখে রাখার জন্য সে সর্বচেষ্টা করে চলে। এমনকি তার জেঠির থেকে মাছ নিয়ে তার ছেলেকে খেতে দেয়। কিন্তু গঙ্গাপদ তার মাকে অভিযোগের সুরে জানায় তার বাড়িতে শুধু ডাল আর শাক র ঁাধা হয় কিন্তু মাছ রাঁধা হয় না। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে মাছ খাওয়ার যে ব্যপার জেলেদের জীবনে, সেটা কোনোদিন তাদের হয়ে ওঠে না। গঙ্গাপদ এবং ভুবনের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের যে প্রভাব সেই ছবি উঠে এসেছে।

সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হল নির্বাচিত উপন্যাস গুলিতে সংলাপে লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নির্বাচিত চারটি উপন্যাস গুলিতে সংলাপে লোকসংস্কৃতির উপাদান। প্রথমেই জানা যাক লোকসংস্কৃতির উপাদান কী? কোনো অঞ্চলের মানুষের মুখে প্রবাদ প্রচলন ও সংস্কৃতিমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে যা উঠে আসে তা লোকসংস্কৃতির উপাদান বলি। এখন দেখানো যাক লোকসংস্কৃতি যে চারটি উপন্যাসকে বেছে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক উপভাষা বা অপ্রমিতের অবস্থানকে সমাজে লোকসংস্কৃতিতে কতটা প্রাধান্যলাভ করেছে তা দেখা যাক -

‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৪-১৯৩৫) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

‘বিহানের ঘরে ফির‍্যা শমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত’ (পৃ- ২১)

ঘরে চাল নেই এই কথাটি নাকি বলতে নেই। তাই প্রচলিত প্রবাদ মুখে মুখে ফেরে ‘চাল বাড়ন্ত’, পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে তেমনি গনেশের ঘরে না থাকলে গণেশ একথা কুবেরকে জানাই।

হোসেন মিয়া সুর করে একটি গান আরম্ভ করে, এই গানের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিকতা ধরা পরেছে -

‘আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোউ
বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে দিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।’ (পৃ- ৩৮)

এখানে লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক গানগুলো উঠে এসেছে।

‘অলক্ষ্মীর মরন নাই।’ (পৃ- ৪৭)

সমাজে প্রচলিত আছে যে সংসারে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী একত্রে অবস্থান করে। মনে করা হয় অলক্ষ্মী বিদায় করলেই লক্ষ্মীলাভ হবে। সে প্রসঙ্গে অঞ্চলে এই রীতি মানার প্রসঙ্গে কথাটি উঠে এসেছে।

গণেশের মুখে আঞ্চলিক যে গান উঠে এসেছে তাতে প্রেমবিরহের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!

আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ !

আ লো সই!' (পৃ- ৭৯)

এখানে দেখা যায় গণেশের মুখে বারবারই এই প্রেম বিরহের চিত্র গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। আবার ঢেঁকির কথাও উল্লেখ রয়েছে। ঢেঁকি হল গ্রাম সমাজে ব্যবহৃত চাল কোটানোর যন্ত্র বিশেষ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদান মিশে রয়েছে। প্রথমেই দেখা যায় মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়েছে। এটি কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘ-মন্ডলের ব্রত। ব্রত সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান এই ব্রতে দেখা যায়। ছোটো ছোটো বালিকারা যখন খেলার খেয়ালে থাকে তখনই ঢোল সানাই বাজিয়ে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তবু এ বিবাহের জন্য তারা দলে দলে এই মাঘ-মন্ডলের পুজো করে। এই উপন্যাসেও বাসন্তীকেও এই ব্রত করতে দেখা যায়।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাসন্তী আলপনা দেয় যেখানে হাতি ঘোড়া আঁকে। তারপর বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়ে আলপনার মাঝখানে একখানা চৌকিতে বসে আর ছাতাখানা সে ঘোরাতে থাকে আর তার মা ছাতার ওপর খই আর নাড়ু ঢালতে থাকে। আর হরির লুটের মতো ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে নাড়ু ধরতে লাগে। এই ব্রতর এই রেওয়াজ। তখন নারীরা গান গেয়ে ওঠে-

'সখি ঐত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো।' (পৃ- ২৫)

আবার দেখা যায় কিশোরের গানে ফুটে উঠেছে সুন্দর গ্রাম বাংলার চিত্র-

'উত্তরের জমিনেরে, সোনা-বন্ধু হাল চষে,

লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে খুয়া।

দক্ষিণে মলরায় রায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়

কারঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।' (পৃ- ৩২)

এই গানের মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিকতা ফুটে উঠেছে।

'বাসন্তী যে তোমার হাঁড়িতে চাউল দিয়া রাখছে- তুমি ত কম জান না।' (পৃ- ৪৫)

হাঁড়িতে চাল দেওয়া এই প্রবাদটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো জিনিস বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিশোর যখন একটি মেয়েকে তাকিয়ে দেখছিল তখন সুবল তাকে জানায় যে বাসন্তীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাই সুবল কিশোরকে বলল হাঁড়িতে চাউল দিয়েই রেখেছে।

'খাল-বওয়া' আঞ্চলিক ভাষা ও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই কথার অর্থ হল মেয়েরা বঁটি নিয়ে কাতারে কাতারে বসে যায়। পরুষরা মাছের ঝুঁড়ি ধরাধরি করে এনে তাদের পাশে স্তুপ করতে থাকে। মেয়েদের হাত চলে পলকের মতো। পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়ে ঘারের উপর ছুঁড়ে মারে। সে মাছ যথাস্থানে জড়ো হয়। আর একদল পুরুষ সেখান থেকে নিয়ে ডাঙ্গিতে তোলে শুকানোর জন্য। দিনের পর দিন এইভাবে তিনমাস কাজ চলে। ছয় মাসের প্রবাস সেরে তারা দেশে পাড়ি জমায়। একে বলা হয় খাল দেওয়া।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন দিক যেমন প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়-

যেমন- 'তোর বাপ কইসে কোটত স্যাই শেয়াল খাগের ব্যটা।

শালো ছাগির ছোয়া' (পৃ- ৪৫)

এখানে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়।

হৃষীকেশ বলে- 'ও-ও রে চরুয়া- হালুয়া রে-এ তোর প্যাটের তলায় প্যাট ডঙাছে

খাঁড়া কিছুই নাই।' (পৃ- ৭৫)

তারপর আবার সে চিৎকার করে গানটা করে -

'আ-আ মুই একি করলি রে

মোর চারুয়া-হালুয়া ভাই।' (পৃ- ৭৪)

এখানে হৃষীকেশের মুখ দিয়ে ঐ অঞ্চলের ভাষায় গান উঠে এসেছে যা লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান হিসাবে ধরা হয়।

হৃষীকেশ হুঙ্কার দিয়ে বলে 'খবরদার লেকচার থামানো চালবে না'। বুদ্ধিমানের সামনে এসে পড়ে- 'শালা বুদ্ধিমান পাল্টা আক্রমণে প্রায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'শা-লা' বলে।

উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পালাগানের যে পর্ব সেটাও এই উপন্যাসে দেখা গিয়েছে। বাইরে থেকে আসে এম.এল.এ সাহেবকে অঞ্চলের মানুষেরা 'পালাটিয়া গান' এর কথা বলেছে। আবার কনট্রাকটারেরা কাজে ফাঁকি দেবে বা চুরি করবে এনিয়ে মণি খুব হেসে বলে -

'ঠিকাদার আর ইনজিনিয়ার

দ্যাশখান কইরল ছারখার' (পৃ- ১২৩)

লোককথাতে সেখানকার মানুষদের কথা এবং তাদের কাজের বর্ণনা উঠে এসেছে। আবার দেখা যায় 'শাদা চাঁদে'র প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সুভ্রতার প্রতীক হিসাবে চাঁদকে শাদা অর্থে প্রয়োগ করে তার প্রতি অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

জলপুত্র উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি জেলে সমাজের গান কথকথা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির হদিশ আমরা দেখতে পাই। প্রথমেই দেখি মধুরামের বাড়িতে মনসা পুঁথিপাঠ চলছে। পুঁথিপাঠের সঙ্গে কাহিনী এগোচ্ছে। পুঁথিপাঠের আসরের প্রধান আকর্ষন নাট্যদলের ছেলেরা। শ্রাবণ মাসের জন্য এদের ভাড়া করে আনা হয়। এরা বন্দর, গরুমচলা করল, কোলা এসব গ্রাম থেকে আনা হয়। মেয়েদের পোশাক পড়ে মুখে পাউডার লাগিয়ে আসরে ঘুরে ঘুরে নাচে। আসরে ঘুকে তাকে নাচতে শুরু করে এবং বন্দনা গীতি শুরু কতে-

‘শত নমস্কার আমার শত নমস্কার, অধীনে গান করি সবার মাঝার,
আমার শত নমস্কার।’ (পৃ- ১০)

প্রেমদাস এই গান শেষ হতেই বৃত্তের ভেতর একবার নেচে এল। এবার আনন্দমোহন গান ধরল-

‘এ সংসারে থাকা যাবে না।
আজ নহে কাল যেতে হবে চিন্তা করে দেখ না।
সংসারে করিলে গমন অবশ্য হইবে মরণ,
চিরজীবী নয়রে কখন কর না ভুল ধারণা।’ (পৃ- ১০)

আবার ভোর সকালে ভোলানাথ ঘুমন্ত অর্ধজাগ্রত মানুষদের কৃষ্ণের অষ্টতর শতনাম করে শোনান-

‘শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন,
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন।’ (পৃ- ২০)

‘নারীর রূপ নারিকেলের মালার মতো, কখনো আধখানা বই, পুরা দেখা যায় না।’ (পৃ- ৩৪)

এখানে নারীর রূপকে নারিকেলের মালার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে অপ্রমিত শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র লক্ষ করা যায় -

ক. বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানগত পরিচয়।

খ. বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের জীবন যাপনের একটি রূপরেখা।

গ. তাদের স্বস্ব সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা চিহ্ন।

ঘ. মানুষের জীবীকাগত অভিজ্ঞতার চিহ্ন তাদের ভাষা ও শব্দ প্রয়োগে ধরা পরে।

ঙ. সংলাপ দ্বারা চরিত্রের সামাজিক শ্রেণিগত ধারণাও ফুটে ওঠে।

চ. ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ ও উপন্যাসে চরিত্রগুলোর অবস্থান প্রসঙ্গে সম্মোক ধারণা পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসগুলিতে এই বিশেষ আলোকে বিশ্লেষণ করে অনেকগুলো নতুন দিক উন্মোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসগুলির বিশেষ অবস্থানকে চিহ্নিত করার প্রয়াস এই গবেষণার কর্ম।

গ্রন্থপঞ্জী

সহায়ক গ্রন্থ

- মজুমদার, অতীন, ''ভাষাতত্ত্ব'', কলকাতা, নয়াপ্রকাশ ২০৬ বিধান সরনি, প্রথমপ্রকাশ, ১৯৬১ (পৃ : ২৭১)

- বসু, আনন্দমোহন, ১৯৭৬, বাংলা ভাষার ইতিহাস, পারমিতা প্রকাশন, বোলপুর, বীরভূম।

- বসু, অরুণ কুমার, সম্পা, ১৩৮৮, বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, সমতট প্রকাশনি, কলকাতা।

- মুহম্মদ, আবদুল হাই, ''ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'', ঢাকা, মল্লিক ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ জৈষ্ঠ, ১৩৯২/জুন, ১৯৮৫ (৩৩৬)

- চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ''বাংলাপদগুচ্ছের সংগঠন'', কলকাতা, দেজপাবলিকেশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, প্রথমপ্রকাশ : ১৯৯২ (২২৩)

- চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, ''বাংলা বাক্যে বিনির্দেশক বিনির্দিষ্ট উপাদান ব্যবহার'', বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

- গোস্বামী, কৃষ্ণপদ, ১৯৭৩ : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস।

- চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ; ১৩৬৭; ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

- ঘোষ, জগদীশচন্দ্র ও ঘোষ, অনিলচন্দ্র, ১৩৮৩, আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি কলকাতা।

- চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার; ১৯৪৮ ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা। বুক করপোরেশন লিমিটেড; কলকাতা।

- বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯৭৫; বাংলা ভাষায় আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস, (প্রথম বাংলা), পুঁথিপত্র, কলিকাতা।

- ড. দাস, নির্মল, ''বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও ক্রমবিকাশ'', কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪, দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন, প্রথম সংস্কার, আষাঢ় ১৩৯৪, দ্বিতীয়সংস্কার, ২৫ বৈশাখ ১৪০৭, (৩৯৬)

- সরকার, পবিত্র, ১৯৮৫, ভাষা দেশ কাল; জি.ও.ই.পাব, কলকাতা। ১৯৮৫, গদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

- দাসগুপ্ত, প্রবাল, ১৩৮২, ''ভাষাবিদ্যায় সাহিত্যচিন্তা : ঐতিহ্যের একদিক'' গাঙ্গেয়পত্র, আশ্বিন, ১৩৮২, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, পৃ ৮-১৪.

- সরকার, পবিত্র, ''বাংলা বানান সংস্কার : সমস্য ও সম্ভবনা'', কলকাতা, চিবায়ত প্রকাশিত, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৭, শ্রাবণ ১৩৯৪ (১৬০)

- সরকার, পবিত্র, ''বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ'', কলকাতা, দেজ পাবলিকেশিং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী, ২০০৬, (২০৩৯)

- সরকার, পবিত্র, ''ভাষা মনন বাঙালী মনীষা'', কলকাতা, মনীষা, পুনশ্চ, ৯এ, নবীন কুন্ডু লেন, প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থমেলা, ১৯৯২ (২১৩)

- বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, ১৩৭৭, বাংলা ভাষার ব্যকরণ, মুখোপাধ্যায়, তারাপদ সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা।

- চক্রবর্তী, বামনদেব, ''উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, বর্ণপরিচয়'', অস্থায়ী কলেজ ষ্ট্রীট পুরবাজার কে ৩/৬ মার্কস, স্কোয়ার উদ্যান, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৬৩।

- বসু, মণীন্দ্রমোহন, ১৯৪৬, বাংলা সাহিত্য (প্রথম খন্ড), কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা।

- ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার, ১৯৮৫, বাংলা বানান। আশা প্রকাশনি, কলিকাতা।

- বসু, রাজশেখর, ১৯৩০ (১৩৮৫) চলন্তিকা।

- ঘোষ, রত্না, ''বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর ১৭৮৪-১৯৮৪'' কলকাতা, সাহিত্যলোক, সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৮ (২০২)
- রায়, রামমোহন, ১৯৭৩, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনি, কলকাতা।

- শ্ব, রমেশ্বর, ‘‘সাধারণ ভাষা- বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,’’ কলকাতা, পুস্তক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ, প্রথমখন্ড, ফাল্গুন ১৩৯০,

- দাশ, শিশিরকুমার, ‘‘ভাষাজিজ্ঞাসা’’, কলকাতা, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯২ (১০৪)

- সেন, সুকুমার, ‘‘ভাষার ইতিবৃত্ত’’, কলকাতা, আনন্দপাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৯, (৩১৭)

- বিশ্বাস, ড. সুখেন, ‘‘প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা’’, কলকাতা, প্রত্যয় প্রকাশনী, ৬১ মহাত্মাগান্ধি রোড, প্রথম প্রকাশ,

- মজুমদার, সমরেশ ‘‘ উপন্যাসে আঞ্চলিকা : বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস’’ সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, (সম্পা), ‘প্রবন্ধ সঞ্চায়ন’কলকাতা, রত্নাবতী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০০৬, (১০৬৩)

- আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

- ঘোষ, হরনাথ এবং সেন, সুকুমার; ১৩৭৬; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো, কলকাতা- ৬.

ইংরাজী গ্রন্থ

- Aarleff Hans – 1982, From Locke to Saussure; Athlone 1982.

- Bycova, E.M.- 1981 The Bengali Language, Nauka Publishing House Central Department of Oriental Literature Moscow.

- Chatterji, Sumit Kumar – 1.1963 language and literature of modern, India Prakash Bhavan; 15, Bankim Chatterjee Street, Calcuta.

- Pride, J.B and Holmes, Janet edited – 1979. Sociolinguistics, Penguin Book, Great Briain.

আকর গ্রন্থ

- মল্লবর্মন, অদ্বৈত, ‘‘তিতাস একটি নদীর নাম’’, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিণ, ১৩৬৩, পুঁথিঘর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৬৫ (২৫৬)

- রায়, দেবেশ, ‘‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’’, কলকাতা, সুন্দর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ (৮৯৮)

- বন্দোপাধ্যায়, মাণিক, ‘‘পদ্মানদীর মাঝি’’, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৪৬, (১৬ জুলাই, ১৯৩৬) (১২০)

- জলদাস, হরিশঙ্কর, ‘‘জলপুত্র’’, ঢাকা, আহমেদ মাহমুদ হক, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ (১১৯)